ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক
রেজিঃ নং - ডিএ ২০/৭৬
ISSN : 2958-5341
৬১ বর্ষ, ১ম থেকে ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০২২
জমাদিউল আউয়াল- জমাদিউস সানি ১৪৪৩-১৪৪৪
পৌষ- পৌষ ১৪২৮-১৪২৯

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	ড. মহাঃ বশিরুল আলম মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ইসলামিক ফাউন্ডেশন
সম্পাদকমণ্ডলী	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল কাদির আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নূর মুহাম্মদ আলম পরিচালক (অব.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ পরিচালক, যাকাত ফান্ড বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ড. ওয়ালীয়ুর রহমান খান মুহাদ্দিস, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী মুফাসসির গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
সম্পাদনা সহযোগী	মুহাম্মদ মজিব উল্লাহ ফরহাদ উপ-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন মোঃ সাইফুল ইসলাম খান গবেষণা সহকারী, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
অনলাইন সহায়তা	মোঃ আরিফ হাসান রাফি উদ্দিন আহমেদ আইসিটি বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

গবেষণা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

THE ISLAMIC FOUNDATION JOURNAL

[A Quarterly Research Journal of Islamic Foundation]

Regd. No. DA 20/76
ISSN : 2958-5341
Year 61, Issue-1-4
January -December 2022

Editorial Board

Editor in Chief	Dr. Md. Bashirul Alam Director General (Additional Secretary) Islamic Foundation
Editors	Prof. Dr. Muhammad Abdur Rashid Islamic Studies Department. Dhaka University Prof. Dr. Abdul Kadir Arabic Department, Dhaka University Md. Abdullah Al Masud Director, Research Department, IFa Nur Muhammad Alam Director (Retd). IFa Dr. Md. Habibullah Associate Professor English Department, Dhaka University Dr. Mohammad Harunur Rashid Jakat Fund Department. IFa Dr. Waliur Rahman Khan Muhaddis, Research Department. IFa Dr. Abu Saleh Patwary Mufassir, Research Department. IFa
Editorial Associates	Muhammad Mojib Ullah Farhad Deputy Director, Research Department. IFa Md. Saiful Islam Khan Research Assistant, Research Department. IFa
Online Support	Md. Arif Hasan Rafi Uddin Ahmed ICT Department, IFa

Published by Department of Research.
Printed by Islamic Foundation Press.
Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh.
E-mail : ifapatrika@gmail.com
Website : www.Islamicfoundation.gov.bd

Price : Tk. 50.00
U. S. Dollar : 1

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
জসিম উদ্দিন
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

যোগাযোগ
পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০১৫৫০৬৮৭০১৮

মূল্য : ৫০.০০ টাকা

সূচিপত্র

- মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের একশ চৌদ্দ সুরা: একটি পর্যালোচনা/৭
  প্রফেসর ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন
  নূর মোহাম্মদ আলম
- ইসলামী ঐতিহ্য প্রচার-প্রসারে বঙ্গবন্ধুর অবদান/৫০
  আবুল কালাম মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ
- কৃষি উন্নয়নে মুসলিম অবদানের সংক্ষিপ্ত রূপ/৭৫
  মোঃ খোন্দকার সামিউল আলীম
  তানবীর হোসাইন
- গুজব প্রতিরোধে ইসলাম: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ/৯১
  ড. মোঃ নজরুল ইসলাম
  মোঃ জাফর আলী
- তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ/১১২
  সাহিদা আকতার
- বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ ও প্রতিকার: একটি অনুসন্ধান/১৩৭
  আব্দুল্লাহ আল মামুন
- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সমস্যা ও বঞ্চনা প্রতিরোধে ইসলামের শাশ্বত বিধান: একটি পর্যালোচনা/১৫৭
  জহিরুল ইসলাম
- অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক: জীবন-দর্শন ও ইসলামী জ্ঞানসাধনা/১৭৯
  ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
- الإ مام البوصيرى ودوره فى شعر المديح النبوى/১৯৮
  الأستاذ. محمد يونس8
- عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم: حياته ومساهمته فى الحديث/২০৯
  الدكتور أ. م. قاضى محمد هارون الرشيد
- The Islamic law and its Application in Bangladesh: An Analysis/২২৮
  Dr. Mohammad Kamruzzaman

ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা জার্নাল
গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের নিয়মাবলী

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং ডিএ ২০/৭৬) 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা জার্নাল' (Islamic Foundation Research Journal) একটি ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল। জার্নালটি প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হয় এবং দেশের অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে গবেষণা জার্নাল হিসেবে স্বীকৃত। গবেষণা জার্নালটির ISSN নং-২৯৫৮-৫৩৪১।

১.০. জার্নালে প্রকাশিতব্য গবেষণার বিষয়সমূহ :
এ জার্নালে ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা কুরআন, হাদীস, ফিকহ, সীরাত, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিকহী পর্যালোচনামূলক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

২.০. গবেষণা প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি :

২.১. গবেষণা প্রবন্ধটি বাংলা, ইংরেজি অথবা আরবী ভাষায় লেখা হতে হবে। প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে।

৩.০. গবেষণা প্রবন্ধ রচনায় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ :

৩.১. অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Orginal Research) হতে হবে। গবেষণাকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনে অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে।

৩.২. গবেষণাকর্মে অবশ্যই মৌলিকত্ব থাকতে হবে। গবেষণার ক্ষেত্রে পুরনো বিষয়াবলির চর্বিত চর্বন গ্রহণযোগ্য নয়। গবেষণার সুস্পষ্ট ফলাফল থাকতে হবে।

৩.৪. যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণ কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কার অবদান কতটুকু তার বিবরণ এবং এ সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

৩.৫. গবেষণা প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) এবং সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) এর মধ্যে হতে হবে। লেখা বাংলার ক্ষেত্রে কী-কোর্ড এর Sutonny MJ ইংরেজির ক্ষেত্রে Times New Roman এর ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

৪.০. গবেষণা প্রবন্ধের কাঠামো

৪.১. শিরোনাম:

৪.২. লেখকের নাম:

৪.৩. সারসংক্ষেপ : প্রবন্ধের শুরুতে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে। সারংস বাংলা ও ইংরেজি অথবা ইংরেজি ও আরবী ভাষায় (আরবী ভাষার প্রবন্ধের ক্ষেত্রে) হতে হবে। এতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, প্রবন্ধে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী থাকবে।

৪.৪. মূলশব্দ : সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Kezwords) উল্লেখ করতে হবে।

৪.৫. ভূমিকা : প্রবন্ধের ভূমিকায় বিষয়ের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রবন্ধ রচনার যৌক্তিকতা সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হবে। **এ বিষয়ে ইতোপূর্বে কারা কী কাজ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।**

৪.৬. গবেষণা পদ্ধতি : গবেষণা পদ্ধতি বর্ণনা, বিশ্লেষণ বা জরিপ/পরিসংখ্যান।

৪.৭. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশ্লেষণ : গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশ্লেষণের পাশাপাশি গবেষণা প্রবন্ধের এই অংশে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সাথে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক লেখকের নিজস্ব চিন্তার প্রতিফলন থাকতে হবে। তবে বিষয়ের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিক বিষয়ের বাইরে কোন মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪.৮. উপসংহার : গবেষণাটি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সম্ভাব্য ভূমিকা ও গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তুলে ধরতে হবে।

৪.৯. তথ্যপঞ্জী।

৫.০. উদ্ধৃতি উপস্থাপন :
গবেষণায় উদ্ধৃতি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ আবশ্যিক :

৫.১. হুবহু/প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের কম হলে চলমান লাইনে উভয় পাশে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে এবং ৩০ শব্দের বেশি হলে মূল লেখা থেকে এক স্পেস নিচে ভিন্ন প্যারায় দুই পাশে অতিরিক্ত মার্জিন রেখে উল্লেখ করতে হবে। কোন সূত্র থেকে একই স্থানে অর্ধ পৃষ্ঠার অধিক হুবহু উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। উদ্ধৃতি উপস্থাপনের

ক্ষেত্রে বাক্যের মধ্যকার এক বা একাধিক শব্দ বা কিছু অংশ উহ্য রাখার প্রয়োজন হলে পরপর অনধিক তিনটি বিন্দু (...) উল্লেখ করতে হবে।

৫.২. ইনটেক্সট উদ্ধৃতি : ইনটেক্সট বা টেক্সটের মধ্যে উদ্ধৃতি প্রদানের স্থানে বন্ধনীর মধ্যে গ্রন্থকার/ প্রবন্ধকারের নামের শেষাংশ ও সূত্রের প্রকাশকাল এবং পৃষ্ঠা নং ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ/গ্রন্থসূত্রের পূর্ণ বিবরণ টেক্সট বা পাদটিকায় উল্লেখ করা হবে না, বরং প্রবন্ধের শেষে তথ্যসূত্র/গ্রন্থপঞ্জি অংশে উল্লেখ করতে হবে।

৫.৩. তথ্যসূত্র/গ্রন্থপঞ্জি : প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে যেসব গ্রন্থ বা সূত্র থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে প্রবন্ধের শেষে তার একটি তালিকা প্রদান করতে হবে। সর্বজন বিদিত (Well known) বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র উল্লেখ করে অযথা কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন।

৫.৪. উদাহরণ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নালে বিভিন্ন উৎস থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপনের উদাহরণ নিম্নরূপ:

১. **আল-কুরআন থেকে:** আল-কুরআন, সূরার ক্রমিক নং: আয়াত নং; যেমন: (আল কুরআন: ২:১-৫)

২. **হাদীস থেকে:** ইন টেক্সট উদ্ধৃতি (ইমামের নামের শেষাংশ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থ প্রকাশের সাল, হাদীস নং) যেমন: (আল-বুখারী, আস সহীহ ২০০৪, ১১০)

গ্রন্থপঞ্জি: ইমামের নামের শেষাংশ, নামের বাকি অংশ, প্রকাশকাল, বাঁকা অক্ষরে গ্রন্থের শিরোনাম, প্রকাশের স্থান: প্রকাশনা সংস্থা, যেমনা: *Al-Bukhari, Abu Abdullah Ibn Ismail. 2004. al-jami al-sahih. Beirut : Dar al kutub al-iiimaizzah.*

৩. **মৌলিক গ্রন্থ থেকে:** ইনটেক্সট উদ্ধৃতি: (গ্রন্থকারের নামে শেষাংশ গ্রন্থ প্রকাশের সাল, পৃষ্ঠা নং) যেমন: (Mansur 2004, 110)

গ্রন্থপঞ্জি: গ্রন্থকারের নামের শেষাংশ, নামের বাকি অংশ, বাঁকা অক্ষরে গ্রন্থের শিরোনাম, প্রকাশের স্থান: প্রকাশনা সংস্থা, যেমন: *Mansur, Mohammad Ali. 2010, Bichar Bivager Sadhinatar Itihas. Dhaka : Bangladesh Islamic Law Research Centre.*

৪. **অনূদিত গ্রন্থ থেকে:** ইনটেক্সট উদ্ধৃতি: (গ্রন্থকারের নামের শেষাংশ গ্রন্থ প্রকাশের সাল, পৃষ্ঠা নং) যেমন: *Palanpuri, Sazed Ahmad. 2009, Shariah Bishoze Siddanta daner Nitimala. Translated bz Mufti Md. Abdullah. Dhaka : Islamic Foundation.*

৫. **জার্নাল থেকে:** ইনটেক্সট উদ্ধৃতি: (প্রবন্ধকারের নামের শেষাংশ জার্নাল প্রকাশের সাল, পৃষ্ঠা নং) যেমন: (Jahangir, 2006, 55)

গ্রন্থপঞ্জি: প্রবন্ধকারের নামের শেষাংশ, নামের বাকি অংশ, প্রকাশকাল, "উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে প্রবন্ধের নাম" বাঁকা অক্ষরে জার্নালের শিরোনাম ভলিউম/বর্ষ: ইস্যু/সংখ্যা, পৃষ্ঠা থেকে-পৃষ্ঠা পর্যন্ত, যেমন: *Jahangir, Khondakar Abdullah. 2006. "Islamer Itihase Ugroponthi Dol Abong Tader Somporke Sahabade Kiramer Dristivongi' Islami Ain o Bichar 02 : 08, 09 : 36.*

৬. **দৈনিক পত্রিকা থেকে:**

৭. **ইনক্লেট উদ্ধৃতি:**

ক. নিবন্ধের ক্ষেত্রে : (নিবন্ধকারের নামের শেষাংশ পত্রিকা প্রকাশের সাল, পৃষ্ঠা নং) যেমন: (Qazzum 2015, 16)

খ. রিপোর্ট ও তথ্যের ক্ষেত্রে: (বাঁকা অক্ষরে পত্রিকার নাম, তারিখ) যেমন: New Nation, Oct. 12 2016

৮. **গ্রন্থপঞ্জি:**

ক. নিবন্ধকারের নামের শেষাংশ, নামের বাকি অংশ, প্রকাশকাল, "উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে প্রবন্ধের নাম" বাঁকা অক্ষরে পত্রিকার নাম, তারিখ যেমন: *Qazzum, Hassan Abdul. 2015. "Furfura Sharifer Pir Mujaddide Zaman Abu Bakr Siddique" Ittefaq, March 27.*

খ. বাঁকা অক্ষরে পত্রিকার নাম, তারিখসমূহ যেমন: *New Nation, Oct. 12 2016; ঘড়া. ১১, ২০১৫; Jan. 05, 2013.*

গ. অনলাইন থেকে তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত তথ্যের সাথে তথ্য সংগ্রহের মাস তারিখ, বছর, ওয়েব ঠিকানা, যেমন: *Qazzum, Hassan Abdul. 2015. "Furfura Sharifer Pir Mujaddide Zaman Abu Bakr Siddique" Ittefaq, March 27. Accessed Feb. 18 2016. http://epaper. ittefaq. com.bd/ ?archiev=zes&arch_date=27-03-2015#*

৯. অসম্পূর্ণ তথ্য :

গ্রন্থকারের নামবিহীন : ইনটেক্সট ও গ্রন্থপঞ্জিতে গ্রন্থকারের নামের স্থানে N.A লিখতে হবে। যেমন: (ঘ.অ.২০১০,১১১)

প্রকাশের সালবিহীন : ইনটেক্সট ও গ্রন্থপঞ্জিতে সালের স্থানে N.D. লিখতে হবে। যেমন: (Parnkil N.D.22)

পৃষ্ঠা নং না থাকলে : ইনটেক্সটে পৃষ্ঠা নং এর স্থানে ঘ.চ লিখতে হবে। যেমন: (Rassel. 2001.N.P)

প্রকাশের স্থানবিহীন : গ্রন্থপঞ্জিতে প্রকাশের শহরের স্থানে N.P লিখতে হবে। যেমন :...(N.P : Bookstore.)

প্রকাশক বিহীন : গ্রন্থপঞ্জিতে প্রকাশকের স্থানে লিখতে হবে। যেমন: ...(Damascus : N.R.)

৬.০. অনুবাদ নীতিমালা : কুরআন ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলিত রীতিতে রূপান্তর করতে হবে। ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল TEXT সহ বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

৭.০. প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া : প্রবন্ধ কম্পিউটার কম্পোজ করে ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নালের নিজস্ব ই-মেইল: ifapatrika@gmail.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে।

ই-মেইলে প্রবন্ধ প্রেরণের ক্ষেত্রে লেখক/লেখকদেরকে এ মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে:

ক. জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/তারা;

খ. প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় মুদ্রিত/প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেয়া হয়নি;

গ. এ জার্নালে প্রবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর সম্পাদকের মতামত ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হবে না;

ঘ. প্রবন্ধে প্রকাশিত/বিবৃত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষকগণ বহন করবেন। প্রতিষ্ঠান এবং জার্নালের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ এর কোনো প্রকার দায় দায়িত্ব বহন করবেন না।

৮.০. প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:

৮.১. জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দুজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা রিভিউ (Review) করানো হয়।

৮.২. রিভিউয়ের জন্য প্রেরণের সময় প্রবন্ধকারের নাম পরিচয় ও রিভিউয়ারগণের পরিচিতি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয় (Double Blind Review)

৮.৩. রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

৯.০. অন্যান্য জ্ঞাতব্য:

৯.১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংস্থা। কাজেই গবেষণা প্রবন্ধে ইসলামের উদারনীতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন থাকতে হবে।

৯.২. গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/লেখকগণ জার্নালের ২ (দুই) কপি সৌজন্য পাবেন।

৯.৩. প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে গৃহিত হওয়ার পর সম্পাদক ও রিভিউয়ার যদি তাতে কোনরূপ সংশোধন বা পরিমার্জনের পরামর্শ দেন তাহলে সেই নির্দেশনা অনুযায়ী লেখককে প্রবন্ধটি প্রকাশযোগ্যভাবে সংশোধন করে দিতে হবে। নতুবা সেই প্রবন্ধ প্রকাশ করা হবে না।

৯.৪. জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের কপিরাইট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। প্রবন্ধের লেখক তা প্রকাশিত প্রবন্ধ অন্য কোথাও প্রকাশ করতে চাইলে সম্পাদক-এর নিকট থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।

৯.৫. সম্পাদনা পরিষদ প্রবন্ধে যে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার অধিকার রাখেন।

৯.৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশ বা বাতিলের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করেন।

৯.৭. এ সম্পর্কে কোন তথ্য জানার প্রয়োজন হলে www.Islamicfoundation.gov.bd সাইটে/মেইলে ifapatrika@gmail.com কিংবা ০২-২২২২১৮২৬৩/ ০১৫৫০-৬৮৭০১৮ হটলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬১ বর্ষ ১ম- ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের একশ চৌদ্দ সূরা : একটি পর্যালোচনা

প্রফেসর ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন*

নূর মোহাম্মদ আলম**

Abstract: Al-Qur'an is the last heavenly book revealed by Almighty Allah. After the creation of the universe, Almighty Allah has created specific rules or regulations for its proper management and control. Every creation follows certain rules or regulations. Therefore, just as there is no disorder in the entire creation, there is no exception or deviation in the rules of Allah. Similarly, even after the creation of man, He has given a law for the human race to live a fair, beautiful, orderly and peaceful life, this law is called Islam. The Qur'an is the eternal constitution of the divine order of life. Therefore, the greatest book of all time is Al-Quran. Al-Qur'anul Kareem is the word of Allah Ta'ala. He sent it down with words and meaning upon His Messenger Muhammad (peace and blessings be upon him) as a mercy to the worlds, a bearer of glad tidings, a warner, a caller to him by the command of Allah, and a shining light.]

[**সারসংক্ষেপ:** আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব। মহান আল্লাহ বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পর তা পরিচালনা প্রতিপালন ও সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি বা বিধান তৈরী করে দিয়েছেন। প্রত্যেক সৃষ্টিই সে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি বা বিধান অনুসরণ করে চলছে। তাই সমগ্র সৃষ্টিজগতে যেমন কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, তেমনি আল্লাহর নিয়মনীতির মধ্যেও কোনো ব্যতিক্রম বা ব্যত্যয় নেই। অনুরূপভাবে, মানুষ সৃষ্টির পরও তিনি মানবজাতির সুষ্ঠু, সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য একটি বিধান দিয়েছেন, এ বিধানের নাম ইসলাম। কুরআন খোদায়ী জীবন-ব্যবস্থার চিরস্থায়ী সংবিধান। অতএব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো আল কুরআন। আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলার বাণী। শব্দ ও অর্থসহ তা তিনি নাযিল করেছেন তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (স.)-এর উপর সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত, সুসংবাদদাতা, ভীতিপ্রদর্শনকারী, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উদ্দীপ্ত আলোকবর্তিকাস্বরূপ।]

ভূমিকা

আল-কুরআনুল কারীমের পরিচিতি

আল-কুরআনুল কারীম হচ্ছে মহান আল্লাহর এমন বাণী, যা মুহাম্মদ (স.)-এর উপর নাযিলকৃত, তার নিকটে এর শব্দ ও অর্থ উভয়টি ওহী আকারে প্রেরিত, যা

* অধ্যক্ষ (অবসর প্রাপ্ত) সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা; বি.সি.এস. (সাধারণ) শিক্ষা ক্যাডার; বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট, ইতিহাসবিদ ও গ্রন্থাকার।

** পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

মুসহাফে (গ্রন্থাকারে) লিপিবদ্ধ, মুতাওয়াতির সূত্রে (সন্দেহাতীত বহু মানুষ কর্তৃক) বর্ণিত এবং যা তিলাওয়াত করা ইবাদত হিসেবে পরিগণিত।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট যা ওহী আকারে প্রেরণ করেছেন, তিনি নিজেই তার নাম দিয়েছেন 'আল-কুরআন' (অধিক পঠিত)।

কারণ এর বিশেষত্বই এই যে, পাঠ ও তিলাওয়াত করতে হবে এবং কখনো পরিত্যাগ করা যাবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা এর আরেক নাম দিয়েছেন, 'আল-কিতাব' (লিখিত গ্রন্থ)। কেননা, এর মর্যাদা এমন যে, তা লিখতে হবে এবং একে অবহেলা করা যাবে না।

এছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনুল কারীমের কিছু গুণ বর্ণনা করেছেন। যেমন– ফুর্ক্বান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী), যিক্র (স্মরণ), হুদা (হিদায়াত বা পথনির্দেশ), নূর (আলো), শিফা (আরোগ্য), হাকীম (প্রজ্ঞাপূর্ণ) মাউ'ইযাতুন (উপদেশ) ইত্যাদি গুণসমূহ। এগুলো আল-কুরআনুল কারীমের মাহাত্ম ও এর বার্তার পরিপূর্ণতার প্রমাণ।

আর 'মুসহাফ' শব্দটি 'সুহুফ' (পৃষ্ঠাসমূহ) শব্দ থেকে গৃহীত, যার উপর আল-কুরআনুল কারীম লেখা হয়েছিল। এ নামটি দ্বারা সাহাবীগণ ঐ গ্রন্থকে বুঝতেন, যার পৃষ্ঠাসমূহে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বস্তুত আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী, যা জিবরাইল (আ) নবী মুহাম্মদ (স.)-এর অন্তরে নাযিল করেছেন।

আর এ ব্যাপারে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলগণের মধ্যে নতুন নন। তার রাসূল ভ্রাতৃবৃন্দ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম) এর সবার উপরই জিবরাইল (আ) আল্লাহর নিকট থেকে ওহী নাযিল করতেন। আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াত'আলা এ মহান আমানতের জন্য যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।

তিনি ভালো করেই জানেন কে এর জন্য অধিক উপযুক্ত, আর কে এর উপযুক্ত নয়। কারণ সকল সৃষ্টি তাঁরই তো সৃষ্ট।[১]

আল কুরআন শুধু ব্যক্তি মানুষকে সঠিক পথনির্দেশনা দেয় না, সমষ্টি তথা সমাজ, রাষ্ট্র তথা সমগ্র বিশ্বকে সঠিক পথ নির্দেশনা দেয়। মানুষ ও জগতের সাথে যা কিছু সম্পর্কিত, সে সবকিছু সম্পর্কে মহান আল্লাহ আল কুরআনে সঠিক নির্দেশনা দিয়েছেন। ব্যক্তি, সমষ্টি, সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ আল কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কায়কারবার, মানুষের আচার-আচরণ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, আনন্দ-বিনোদন ইত্যাদি সব বিষয়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নাযিলকৃত পবিত্র গ্রন্থে সুস্পষ্ট নীতিমালা দেয়া হয়েছে।

---

১ কুরআনুল কারীম বাদশাহ্ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স মদীনা মোনাওয়ারা, সৌদি আরব, ১৪৩৬ হিজরী, পৃ. i, ii.

বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস যেন এক মহাদানবের নাম যাকে পরাস্ত করার ক্ষমতা কারো নেই। সকল আইন, সকল শক্তিই আজ সন্ত্রাসের হাতে জিম্মি। যদিও বিশ্বপরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় বিভিন্ন নয়া মাত্রার সম্মিলন ঘটেছে, তবুও সন্ত্রাসের সাধারণ পরিচিতি ও প্রকৃতি অনেকটা একই রকম রয়ে গেছে। কুরআনে হাকীমে 'ফাসাদ' ও 'ফিত্নাহ' শব্দদ্বয় সন্ত্রাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর ইংরেজীতে এটাকে Terrorism বলে।

সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য কুরআনী আইনের বাস্তবায়ন সময়ের দাবী। কারণ এই আইনে কালক্ষেপণের তেমন সুযোগ নেই। আবার এটি উকিলদের ব্যাখ্যা নির্ভরও নয়। তদুপরি কুরআনী আইন কার্যকর হবে প্রকাশ্যে, যাতে সাধারণ মানুষ আর সন্ত্রাসী হবার সাহস না পায়। তাছাড়া জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাদীর উপর চড়াও হবার সুযোগও নেই। কারণ এমন আশংকা হলে বিচারক সন্ত্রাসীকে সরাসরি হত্যার আদেশ দিতে পারেন এবং এই আইনে কোন ফাঁক-ফোকরও নেই।

কুরআন শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ

কুরআন (القران) আরবি শব্দ, কুরআন কারাআ, ইয়াকরাউ কারউন ও কারনুন কারাইনুন ও কিরাআতুন শব্দ থেকে নির্গত বা উৎপত্তি হয়েছে। যার শাব্দিক অর্থ হলো পাঠ করা, মিলিত, তিলাওয়াত করা, পড়া, সর্বাধিক পঠিতব্যসহ ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় মহাগ্রন্থ আল কুরআন সবচেয়ে বেশি পাঠ বা তিলাওয়াত করা হয় বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে আল কুরআন।

যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতকে সত্য বলে সমর্থন করে এবং এক আয়াত অপর আয়াতের অনুরূপ, তাই একে কুরআন বলা হয়।[২]

যেহেতু পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সারবস্তু জমা করা হয়েছে তাই একে কুরআন বলা হয়।[৩]

মূলত সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানই কুরআনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।[৪] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-" আপনার নিকট প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ আমি কিতাব (আল-কুরআন) নাযিল করেছি।"[৫]

অন্যত্র তিনি বলেন, "কিতাবে (আল-কুরআনে) কোনো কিছুই আমি বাদ দেইনি"[৬]

আল-লিহ্য়ানী বলেন, কুরআন (قران) শব্দটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)[৭] হামযাযুক্ত আল-গুফরান (الغفران) - এর ওযনে গঠিত এবং قرأ শব্দমূল থেকে উৎপন্ন, এর অর্থ পাঠ করা।[৮] এ

২ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন, ১ম খণ্ড, মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, মিসর, ১৩৭০ হি./১৯৫১ খ্রি., পৃ. ৫১।

৩ ড. সুবহী সালিহ, মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃ. ১৯; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, 'উলূমুল কুরআন, ১ম খণ্ড, আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া, রাজশাহী, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি., পৃ. ৯।

৪ 'উলূমুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯।

৫ আল কুরআন, ১৬ : ৮৯।

৬ আল কুরআন, ৬ : ৩৮।

মাসদারকে مفعول অর্থে গ্রহণ করে কুরআনকে مقروء (পঠিত) অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।[৯] বাজ্জাজের মতে, কুরআন শব্দটি (فعلان) সমওযনে গঠিত একটি শব্দ। যেমন কুরআন (قران) শব্দটি غفران এর সমওযনের, যার অর্থ তিলাওয়াত করা।[১০]

উল্লিখিত মতগুলোর মধ্যে আল্-লিহ্য়ানী-এর মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। অতএব আভিধানিক অর্থে القران শব্দটি قرأة-এর সমার্থবোধক।[১১] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করার দায়িত্ব আমারই। অতএব যখন আমি তা পাঠ করি তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন"।[১২]

জাহিলী যুগে আরবগণ قرأ শব্দটি 'তিলাওয়াত' অর্থে ব্যবহার না করে অন্য অর্থে ব্যবহার করত। যেমন তারা বলত هذه الناقة لم تقرأ سلى قط 'উষ্ট্রীটি কখনও গর্ভবতী হয়নি বা বাচ্চা প্রসব করেনি।'[১৩]

অনুরূপভাবে 'আমর ইব্ন কুলছুমের কবিতায় দেখা যায় هجان اللون لم تقرأ جنينا 'নিম্নমানের ঘোটকী বাচ্চা প্রসব করেনি।'[১৪] পরবর্তীতে আরবগণ قرأ শব্দটিকে تلاوة (পাঠ) অর্থে গ্রহণ করে এবং তা সাধারণভাবে প্রচলিত হয়।[১৫]

আল-কুরআন-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

আল-কুরআন মহান আল্লাহর কিতাব, যা আরবী ভাষায় মুহাম্মদ (স.)-এর উপর রূহুল আমীন জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে এবং তা মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ আছে।[১৬] এটি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির (মুতাওয়াতির-এর শাব্দিক অর্থ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা। পরিভাষায় মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা সর্বযুগেই এত অধিক সংখ্যক যে, কোনো মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া

---

৭ আবদুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ, উলূমুল উসূলিল ফিকহ, দারুল হাদীস, কায়রো, ২০০৩ খ্রি, পৃ. ২৩; ইবন মানযুর, লিসানুল 'আরাব, ১১শ খণ্ড দারু সাদির, বৈরূত, তা.বি), পৃ. ৭৮: T.P. H. Hughes বলেন, 'The word Quran is Derved From the Arabic Qara." cf. Dictionary of Islam, P. 481; Ahmad Galwash, The Religion of islam, Eario: Imprimeric Misr, 1963 A.D. P. 149.

৮ লিসানুল 'আরাব,' ১১শ খণ্ড, পৃ. ৭৮।

৯ ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, 'উলূমুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯।

১০ লিসানুল-'আরাব, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৭৮; লুইস মা'লূফ, আল-মুনজিদ ফিল-লুগাহ ওয়াল আ'লাম, ১ম খণ্ড, দারুল মাশলিক, বৈরূত, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ড. ইব্রাহিম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত, হুসাইনিয়া কুতুবখানা, দেওবন্দ, ১৪১৭হি. পৃ.৭২২।

১১ ড. সুবহী সালিহ, মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃ. ১৯।

১২ আল কুরআন, ৭৫ : ১৭-১৮।

১৩ ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, 'উলূমুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।

১৪ লিসানুল-'আরাব, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১২৬।

১৫ ড. সুবহী সালিহ, মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃ. ১৯।

১৬ মুহাম্মদ 'আলী আস-সাবূনী, আত-তিবয়ান ফী 'উলূমিল কুরআন, 'আলামূল-কুতুব, বৈরূত, ৪০৫হি./১৯৮৫খ্রি., পৃ. ৮।

সাধারণত তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। এরকম হাদীস দ্বারা অকাট্য জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ হয়, যা সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে[১৭]। সূত্রে অকাট্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ কিতাব তিলাওয়াত করাও ইবাদত।[১৮] আলিমগণ বিভিন্নভাবে কুরআন মাজীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন যা নিম্নরূপ :

আহমাদ মুল্লাজিউন[১৯] (তাঁর নাম আহমাদ, পিতার নাম আবূ সা'ঈদ, তবে মুল্লাজিউন নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ১০৪৮ সালে দিল্লীর উপকণ্ঠে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ এবং উসূলুল ফিকহ বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শিতা অর্জন করেন । তিনি বাদশাহ আলমগীর ও তাঁর পুত্রের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাফসীরে আহমাদী ও নূরুল আনওয়ার অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি ১১৩০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন)। বলেন, আল-কুরআন হলো যা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর উপর নাযিল করা হয়েছে এবং মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত হয়েছে।[২০]

ইবন খালদূন (মৃ. ৮০৮ হি.)[২১] বলেন, আল-কুরআন আল্লাহর কালাম যা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ওপর নাযিল করা হয়েছে। এটি মাসহাফের শুরু ও শেষ মলাটের মধ্যবর্তী অংশে লিপিবদ্ধ এবং তা উম্মতের নিকট মুতাওয়াতির (নিরবিচ্ছিন্ন) সূত্রে পৌঁছেছে।[২২]

আল-কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন : "নিশ্চয়ই আল-কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে নাযিলকৃত। রূহুল আমীন (জিবরাঈল) একে নিয়ে অবতরণ করেছেন আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হন। আর এটা নাযিল করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়"[২৩] উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল-কুরআন-এর নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে :

---

১৭ ড. মাহমূদ তাহ্হান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস, কাদিমী কুতুবখানা, করাচী, তা.বি., পৃ. ১৮-১৯।

১৮ ড. সুবহী সালিহ, মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃ. ২০; মান্না আল কাত্তান, মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন, মুওয়াসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত, ১৪০৬ হি./১৯৮৩ খ্রি.।

১৯ দ্র. মুহাম্মাদ হানীফ গাংগুহী, যাফরুল মুহাস্সিলীন, মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, করাচী, তা.বি. পৃ. ২১৭-২১৯।

২০ নূরুল আনওয়ার, মাতবা'আতুস্ সা'দী, করাচী, তা. বি., পৃ ৩০।

২১ ইবন খালদূন : 'আব্দুর রহমান ওয়ালীউদ্দীন ইবন মুহাম্মাদ ইবন খালদূন। তিনি ইব্ন খালদুন নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ৭৩২ হিজরী/২৭ মে, ১৩৩২ খ্রি. তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন জ্ঞানী, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, চিকিৎসক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তাঁকে সমাজবিজ্ঞানের পিতা বলা হয়। তিনি ৮০৮ হিজরী মোতাবেক রমযান মাসের চারদিন বাকী থাকতে ১৪০৬ খ্রি. কায়রোতে ইন্তিকাল করেন ইবন দ্র. ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৭ম খণ্ড, দারু ইহয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, বৈরূত, তা.বি., পৃ. ৭৬-৭৭; ইসমাঈল পাশা, হাদিয়্যাতুল 'আরিফীন, ১ম খণ্ড, বৈরূত, দারুল ফিকর, ১৯৮২ খ্রি. পৃ. ২৫৯; 'উমার রিদা কাহহালাহ, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ২য় খণ্ড, মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরূত, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি. পৃ. ১১৯-২২১।

২২ ইবন খালদূন, আল-মুকাদ্দিমাহ, মিসর, তিজারাতুল কুতুব, তা.বি., পৃ. ৪৩৭।

২৩ আল কুরআন, ২৬ : ১৯২-১৯৫।

ক. কুরআন আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর উপর নাযিলকৃত।
খ. বাণীবাহক রূহুল আমীন (জিবরাঈল) তা বয়ে আনেন।
গ. কুরআন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর এজন্য নাযিল হয়, যাতে তিনি কুরআন দ্বারা মানবজাতিকে সতর্ক করেন। অতএব কুরআন হলো জগৎবাসীর জন্য সতর্কবাণী। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন : "রাসূলগণ আসার পর যাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে।"[২৪]
ঘ. আল-কুরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। আল-কুরআন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "এটি আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সংবাদ রয়েছে, তোমাদের পরবর্তীদের অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ আছে, তোমাদের পার্থিব জীবনের হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ের নির্দেশ আছে। এটা হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্যকারী, এতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু নেই। অহংকারবশত যে ব্যক্তি এটিকে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন। যে ব্যক্তি এটা ছাড়া অন্য কিছুতে হেদায়াত অন্বেষণ করবে আল্লাহ তাকে পাথভ্রষ্ট করে দিবেন। এটি আল্লাহ প্রদত্ত মজবুত রজ্জু। এটি বিজ্ঞপূর্ণ স্মরণিকা এবং একটি সহজ সরল পথ। প্রবৃত্তির অনুসারীরা এটিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না। অন্য কিছু এর সাথে সংমিশ্রণ হবে না। এর অধ্যয়ন ও জ্ঞানান্বেষণে আলিমগণ বিরক্ত হবে না। পুনপুন তিলাওয়াতে এর স্বাদ হ্রাস পাবে না। এর অভিনবত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। জিনেরা যখন এ কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা থেমে থাকেনি, বরং তারা বলে উঠে, "আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করছি, যা সৎপথ প্রদর্শন করে। আমরা তাতে ঈমান এনেছি।" যে ব্যক্তি এ কুরআন অনুসারে কথা বলবে সে সত্য কথা বলবে। আর যে তদনুসারে আমল করবে সে পুরস্কৃত হবে। যে ব্যক্তি তদনুযায়ী বিচার ফয়সালা করবে সে ন্যায়বিচার করবে। আর যে এর প্রতি আহ্বান জানাবে সে সঠিক পথের দিশা প্রাপ্ত হবে"।[২৫] মনীষীগণ বিভিন্নভাবে কুরআনের পরিচয় দিয়েছেন। الوقاية গ্রন্থকার মোল্লা আলী কারী বলেন- কুরআন মাজীদ হলো আল্লাহর কিতাব, যা রাসূল (স.) এর ওপর নাযিল করা হয়েছে, যা সহীফাসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা রাসূল (স.) থেকে ধারাবাহিকতার সাথে সন্দেহাতীত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।
المعجم الوسيط প্রণেতা বলেন, কুরআন হলো মহান আল্লাহর বাণী যা তিনি স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ (স.) এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন, যা সহীফাসমূহে লিপিবদ্ধ আছে।'

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের রচয়িতা স্বয়ং মহান আল্লাহ তা'আলা। নাযিল হয়েছে হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর ওপর হযরত জিবরাঈল (আ) ফেরেস্তার মাধ্যমে। আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ কালাম, এর শব্দ ও ভাষা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নিজের। এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা।

---

২৪ আল কুরআন, ৪ : ১৬৫।
২৫ জামি'উত-তিরমিযী, আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন, (১৪) বাবু মা জাআ ফী ফাদলিল কুরআন, হাদীস নং-২৯০৬।

কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট

আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বের বিশ্ব পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অবস্থাকে ঐতিহাসিকগণ আইয়ামে জাহেলিয়াত বা বর্বরতার যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। Might is right- "জোর যার মুল্লুক তার" এ নীতিই যেন সর্বত্রই কায়েম ছিল। হত্যা-খুন, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, মদ-জুয়া, ব্যভিচার-অনাচার সন্ত্রাস ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত ও নবী-রাসূল (স.) প্রদর্শিত জীবনবিধান ভুলে মনগড়া আইন ও জীবন পদ্ধতির অনুসরণ করতে লাগল। হযরত ঈসা (আ) এর অবর্তমানে প্রায় ৬০০ বছর অতিবাহিত হলে অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, আসমানি কিতাব ও রাসূল আগমন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ল। এমনি এক অবস্থায় মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশা দেবার জন্য ৬১০ সালে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দা মুহাম্মদ (স.) কে হেরা গুহায় রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

কুরআন মানুষকে অবাস্তব ও কাল্পনিক কোন দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করে না। মানুষের দৈহিক, আত্মিক, আভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক ক্ষেত্রসমূহের পূর্ণতা বিধান করে। এ কারণেই অসংখ্য লোক কুরআনের জীবন্ত পয়গামকে প্রবল আগ্রহে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে যাচ্ছেন। এ গ্রন্থের দুর্বার শক্তি অজেয় প্রভাব, অন্তর্নিহিত ও প্রচ্ছন্ন প্রেরণা এখনও মুসলমান আবাল বৃদ্ধ বনিতার জীবনে দেদীপ্যমান। এ বিশ্বে অসংখ্য সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু কুরআন জীবনের গভীরে যে সভ্যতার বীজ বপন করেছে, তার বুনিয়াদ নির্লোভ ঈমান ও আমলের মজবুত মাটিতে প্রোথিত। মুসলমানদের বিজয়ের শক্তি তাদের সামাজিক ঐক্য। অস্ত্রের শক্তিতে তো নয়, বরং আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়েই মুসলমানেরা অসাধ্য সাধন করেছে। এর মূল উৎস ও প্রেরণা হচ্ছে আল কুরআন।

বসওয়ার্থ স্মিথ যথার্থই বলেছেন : The Quran is a book which is a poem, a code of laws a book of common prayers and a bible in one and in reverenced by a large section of the human race as miracle of purity of style of wisdom and of truth . It is miracle clamed by Muhammad... his standing miracle he called it; and a miracle indeed it is.

অর্থাৎ পবিত্র কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যা একাধারে একটি কাব্য, একটি আইন পুস্তক। এটি মানবজাতির ইতিহাসে মহা সম্মানিত। মহা পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে, ন্যায় ও সত্যের প্রতীক হিসেবে, শুদ্ধতা ও পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে এই পৃথিবীর এক বৃহদাংশ মানুষ মেনে চলেছেন।

কুরআনের কারণেই আরবের গরিব, গুরুত্বহীন, নগ্নপদের মরুচারী লোকগুলো নতুন এক আত্মিক শক্তিতে জেগে উঠল, নতুন ছাঁচে ও নতুন রূপে গড়ে উঠল। তাদের জীবনের দৃষ্টি ও কামনা-বাসনাই বদলে গেল এবং তাদের জীবনবোধ এক উন্নত ও মহান লক্ষপাণে পৌছতে সক্ষম হলো। তাদের মনমানসিকতা ও হৃদয় এত উন্নত হলো যে, তা যেন আল্লাহর আরশকে স্পর্শ করল। মোটকথা, কুরআনের স্পর্শে আরবের বর্বর লোকগুলো সোনার মানুষে পরিণত হলো এবং এর ফলে আল্লাহর অঙ্গীকারও সত্যে পরিণত হওয়া সম্ভব হলো। কুরআন মাজীদে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না,

যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।'[২৬] এই বিরাট নৈতিক বিপ্লবের কারণেই কয়েক বছরের মধ্যেই আরবের ওই মরুভূমি থেকে এক নতুন শক্তির উত্থান ঘটল, যারা ওই সময়ের শক্তিশালী সাম্রাজ্যগুলোর অহঙ্কার ধূলায় মিশিয়ে দিতে সক্ষম হলো এবং তাদের কাছ থেকে পৃথিবীর নেতৃত্ব নিয়ে নিল।

এই নাটকীয় পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব হলো? সম্ভব হলো এ কারণেই যে আল কুরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর মাধ্যমে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হতে পেরেছিল এবং নবীর নেতৃত্বে তাঁর সাথীরা কুরআনের আহ্বানে যথাযথভাবে সাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এত বিরাট পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল, কারণ আরবের লোকেরা কুরআনকে জানতে পেরেছিলেন, উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এ কারণে তারা কুরআনকে যথার্থভাবে মর্যাদা দিতে পেরেছিলেন, সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন। আর রাসূলকে তারা পেয়েছিলেন কুরআনেরই বাস্তব মডেল বা নমুনা হিসেবে। আল্লাহর রাসূল তাঁর জীবনে কুরআনকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন, কুরআনের চেতনাতেই তিনি উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তিনি তাই অনুমোদন করেছেন, যার অনুমোদন কুরআন তাঁকে দিয়েছে এবং কুরআন যা নিষেধ করেছে তিনি তাই নিষেধ করেছেন। কাজেই মা আয়েশা যখন নবী করীম (স.) প্রসঙ্গে বলেন, তিনি ছিলেন পৃথিবীর বুকে জীবন্ত কুরআন, তখন তাতে অতিশয়োক্তি বা বিস্ময়কর বলে কিছু থাকে না।

আল কুরআন নাযিলের দুটি পর্যায়

প্রথম পর্যায় : কুরআন অনাদি কাল থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত ছিল। যেখান থেকে পূর্ণ কুরআন এক বরকতময় রজনীতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশের বায়তুল ইয্যাতে বা বায়তুল মামুরে নাযিল হয়। এই অবতরণের ভাবকে কুরআনে কারীমে ইনযাল শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'নিশ্চয় আমি কুরআনকে এক মোবারক রজনীতে অবতীর্ণ করেছি, আমি তো সতর্ককারী।'[২৭] সূরা কাদ্‌রে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন: 'নিশ্চয় আমি একে এক মহিমান্বিত রাতে নাযিল করেছি।'[২৮] বর্ণিত লাইলাতুল মোবারকাহ ও লাইলাতুল কদর রমযান মাসের একটি রাত। হাদীস মোতাবেক মাহে রমযানের শেষ দশকের কোন বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর বা লাইলাতুল মোবারাকাহ নিহিত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এই সামস্টিক অবতরণের কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সম্পূর্ণ কুরআনকে একসঙ্গে কদরের রাতে দুনিয়ার আকাশে নাযিল করা হয়েছে।[২৯]

দ্বিতীয় পর্যায় : কুরআন নাযিলের দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে, প্রথম আকাশের বায়তুল ইয্যাত থেকে অল্প অল্প করে পর্যায়ক্রমে নবী করীম (স.) এর অন্তরে তেইশ বছরকালব্যাপী নাযিল হওয়া।

---

২৬ আল কুরআন, ১৩ : ১১।
২৭ আল কুরআন, ৪৪ : ৩।
২৮ আল কুরআন, ৯৭ : ১।
২৯ আল ইতকান, ১ : ৪০।

প্রিয় নবী (স.) এর বয়স যখন চল্লিশ বছর ছয় মাস বার দিন (দশ আগস্ট ৬১০ খ্রি. মোতাবেক ২১ অথবা ২৭ রমযান সোমবার রাত) তখন জাবালে নূরের হেরা গুহায় জিবরাঈলের মাধ্যমে প্রেরিত সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত দ্বারা এই অবতরণের সূচনা হয় এবং দীর্ঘ তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবন শেষে মদীনার বাড়িতে মৃত্যুর নয় দিন পূর্বে অবতীর্ণ সূরা বাকারার ২৮১ নম্বর আয়াত অবতরণের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন নাযিলের পরিসমাপ্তি ঘটে।[৩০]

কুরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার কারণ

অন্যান্য আসমানী কিতাব সংশ্লিষ্ট নবীগণের উপর একসঙ্গে নাযিল হয়েছে বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু তাৎপর্যবহ কারণে আল কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা এক দফায় নাযিল না করে কিস্তি কিস্তি করে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য আসমানি কিতাব সংশ্লিষ্ট নবীগণের উপর এক সঙ্গে নাযিল হয়েছে বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। তিনি এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, 'কাফিররা বলল- তাঁর উপর সমগ্র কুরআন একবারে নাযিল হলো না কেন? আমি কুরআনকে এভাবেই পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করেছি। যাতে আপনার হৃদয়কে মজবুত করি। একে আমি ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি। তারা যখনই আপনার নিকট কোন সমস্যা, প্রশ্ন উপস্থিত করছে আমি সেটার সুষ্ঠু সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।'[৩১] ইমাম রাযী (র.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কুরআনের পর্যায়ক্রমিক অবতরণের তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো।

(এক) রাসূলে কারীম (স.) উম্মী নিরক্ষর ছিলেন। এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ কুরআন একসঙ্গে নাযিল হলে তা মুখস্থ করা কঠিন বিষয় হতো। (দুই) একসঙ্গে নাযিল হলে কুরআনের সকল বিধানও এই সঙ্গে তৎক্ষণাৎ পালনীয় হতো। যা তৎকালীন প্রেক্ষাপটে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। (তিন) কুরআনের বৃহৎ এক অংশ মানুষের প্রশ্নের জবাবে বা বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। এমতাবস্থায় সেই সব প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার পর বা ঘটনার সময়ে সংশ্লিষ্ট আয়াত নাযিল হওয়াই যুক্তিযুক্ত। (চার) নিজ কওমের অবাধ্য লোকদের পক্ষ থেকে নবী করীম (সা) কে বিভিন্নভাবে উৎপীড়ন করা হতো, যা তিনি বরদাশত করতেন। তখন বারবার ওহী আগমন তার মনে সান্ত্বনা ও দৃঢ়তা দান করত।

মাক্কী ও মাদানী আয়াত পরিচিতি

রাসূল (স.) এর পবিত্র জীবন দুভাগে বিভক্ত। নবুওয়াত-উত্তর তের বছরের মাক্কী জীবন এবং দশ বছরের মাদানী জীবন। তার হিজরতের আগে ও পরের দুই জীবনের ধারা বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য ভিন্নরূপ করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। কুরআনের আয়াত ও আহকামের মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত। তাই যে সকল আয়াত হুযুরের মদীনা হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে সেগুলো মাক্কী আয়াত এবং যে সকল আয়াত মদীনায় হিযরতরে পরে নাযিল হয়েছে সেগুলো

৩০ দিরাসাত ফী উলূমিল কুরআন ও আর-রাহীকুল মাখতুম।

৩১ আল কুরআন, ২৫ : ৩২-৩৩।

মাদানী আয়াত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। মাক্কী সূরা সংখ্যা ৯২টি, মাদানী সূরা সংখ্যা ২২টি। মহাগ্রন্থ আল কুরআন ৩০ পারায় বিভক্ত। এর মধ্যে ১৪টি সিজদা, ৫৫৪টি রুকু ও সাতটি মঞ্জিল আছে। কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা বাকারা। আর ছোট সূরা কাওছার।

হিজরতের পূর্বে মক্কায় বাইরে অন্য কোন স্থানে হলেও তাকে মাক্কী আয়াত বলে গণ্য করা হয় যেমন তায়েফ ও উর্ধ্বজগত ভ্রমণকালে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ। আবার হিজরতের পর মদীনার বাইরে যথা- আরাফাহ, মিনা এমনকি মক্কা বিজয়ের সময় খোদ মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের নামও মাদানী আয়াত হয়েছে। দুই ধরনের আয়াতের ভাষা, মর্ম, আহকাম ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে সাহাবায়ে কেরাম এই নামকরণ করেছেন।[৩২]

কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের তারতীব

কুরআনুল কারীমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াত ও সূরাসমূহ যে তারতীবের সাথে জগদ্বাসীর নিকট বিদ্যমান, তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত একমাত্র তারতীব। রাসূলে কারীম (স.)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করে তিনি আল-কুরআনের এই ধারাক্রম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূল (স.) ওহী লেখক এবং অন্যান্য সাহাবীগণকেও এই তারতীবে আয়াতগুলোকে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ বা শিক্ষা করতে বলেছেন। সুতরাং ওহীর মাধ্যমে নির্ধারিত এই তারতীবের মধ্যে কোনরূপ রদবদল করার কোন অবকাশ নেই।[৩৩]

'বিসমিল্লাহ', নুকতা ও হরকত সংযোজন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম কুরআনের একটি আয়াত। সূরা তাওবাহ ব্যতীত অন্য সব সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং দুই সূরার মাঝে ব্যবধান বুঝানোর উদ্দেশ্যে পাঠ করার জন্য নবী (স.) নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তিলাওয়াত শুরুকালে 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ করার কথা কুরআনেই এসেছে।

কুরআন নাযিলের সময় নুকতা ও হরকত ছিল না। প্রাথমিকযুগে হাফিযগণের তিলাওয়াত থেকেই সাধারণ লোকেরা কুরআন শিক্ষা করতে সক্ষম হতেন। পরবর্তী সময়ে মুসলিম সাম্রাজের বিস্তার ঘটে এবং কুরআনে নুকতা ও হরকত সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দেয়। হযরত আলী (র.)-এর নির্দেশে তাবেয়ী আবুল আসওয়াদ দুয়িলী (র.) নুকতা সংযোজন এবং হরকত উদ্ভাবনের কাজ সম্পাদন করেন। তবে বর্তমানে যে যের, যবর, পেশ আমরা দেখতে পাই, তা সংযোজন করেছেন শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এর শাসনামলে হাসান বসরী, ইয়াহিয়া বিন ইয়ামার, নছর বিন আছেম প্রমুখ।

সূরার নামকরণ

কুরআনুল কারীমের ১১৪ সূরারই ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। সূরাগুলোর নামকরণের ব্যাপারে **দুটি** বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কোনটি সূরার আলোচ্য বিষয়-বস্তুর দৃষ্টিতে আবার

---

৩২ বুরহান, পৃ. ১৩২।
৩৩ বুরহান, পৃ. ১৭২।

কোনটি সূরায় উল্লিখিত অসংখ্য বিষয়ের মধ্য থেকে একটি বিষয় আবার কোন কোন সূরার নামকরণ করা হয়েছে তার আভ্যন্তরীণ ভাবধারা ও বিষয়বস্তুকে সম্মুখে রেখে। কয়েকটি সূরার নাম রাখা হয়েছে কোন একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি খেয়াল রেখে।[৩৪] অথবা সূরার যে কোন একটি শব্দকেই ঐ সূরার নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) যার উপরে কুরআন নাযিল হয়েছে, তিনি রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেকটি সূরার নামকরণ করেছেন। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কোন কোন সূরার একাধিক নামও রয়েছে।

সূরা

আরবী ভাষায় সূরা শব্দের অর্থ নগর বা প্রাচীর। নগরের প্রাচীর যেমন অন্য এলাকা থেকে নগরকে পৃথক করে রাখে, ঠিক তেমনিভাবে কুরআনের সূরাগুলোও কুরআনের একাংশ থেকে অন্য অংশকে পৃথক করে রাখে। মহাগ্রন্থ আল কুরআন ৩০ পারায় বা ভাগে বিভক্ত। এর সূরা সংখ্যা ১১৪টি, আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ মতান্তরে, ৬৬৬৬, ৬২৫০, ৬২১৬, ৬২০৮। অক্ষর সংখ্যা ৬ লক্ষ ২৩ হাজার ৭৬০টি। শব্দ সংখ্যা ৭৭ হাজার ৪৩৯ বা ৭৬ হাজার ৪৩০ বা ৭৬ হাজার ৩২০ বা ৭০ হাজার ২৫০ বা ৭৭ হাজার ৯৬৪টি। আল কুরআনুল কারীমের আসল নাম হলো পাঁচটি, ১. আল কুরআন, ২. আল ফুরকান ৩. আল যিকর, ৪ আল কিতাব, ৫. আত-তানযীল, আর বাকি যতগুলো নাম আছে সবগুলোই কুরআনের সিফাতী বা গুণবাচক নাম।

সূরা ভিত্তিক আলোচনা

১. ফাতিহা (প্রারম্ভিকা)

নামকরণ: এই সূরার নাম "ফাতিহা," অর্থ- প্রারম্ভিকা, ভূমিকা, সূচনা। الفتح মূলশব্দ। অর্থ, খোলা। এর রূপান্তরিত শব্দ হচ্ছে- مفتاح অর্থ, চাবি। فاتح কর্তৃকারক বিশেষ্য। অর্থ, যে খোলে বা আরম্ভ করে। এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কুরআন মাজীদ শুরু হয়েছে বিধায় এর নাম 'সূরাতুল ফাতিহা' রাখা যথার্থ হয়েছে।

ফাতিহা শব্দটি এ সূরার মধ্যে উল্লেখ নেই। তবে সাত আয়াত এবং মহাগ্রন্থ আল কুরআন রসূল (স.)-কে প্রদান করা হয়েছে বলে সূরা হিজর এর ৮৭ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে :

"আমিতো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন"।[৩৫] সূরা ফাতিহার অনেক নাম রয়েছে। কারো মতে আশিটি, কারো মতে সত্তরটি। আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী তাঁর আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন কিতাবে পঁচিশটি নাম উল্লেখ করেছেন:

৩৪ কুরআনুল করীম, সাউদী আরব, ১ম-খণ্ড, পৃ. ১।

৩৫ আল কুরআন, ১৫ : ৮৭।

১. فاتحة الكتاب - কুরআনের প্রারম্ভিকা : এ সূরা কুরআনের শুরুতে বা 'যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে না তার সালাত হবে না।'[৩৬] নামাযের প্রথমে পড়া হয় বিধায় একে فاتحة الكتاب বলা হয়। [৩৭]

২. فاتحة القران - কুরআনের সূচনা : এ সূরা পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণে একে فاتحة القران বলে।[৩৮]

৩. ام الكتاب - কিতাবের মূল : পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ মৌলিক বিষয় এ সূরায় রয়েছে তাই এ সূরাকে উম্মুল কিতাব বলা হয়েছে।

৪. ام القران - কুরআনের মূল : সূরা ফাতিহা কুরআনে সর্বপ্রথম লিখা হয় এবং সকল নামাযে পড়া হয়, তাই একে ام القران বলা হয়।

৫. القران العظيم - মহান কুরআন : যেহেতু কুরআনে যেসব তাৎপর্য রয়েছে, সেগুলো সূরায় ফাতিহায় সংক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান সেহেতু একে القران العظيم বলা হয়।

৬. السبع المثانى - বারবার পঠিতব্য সাতটি আয়াত : সূরা ফাতিহায় সাতটি আয়াত রয়েছে এবং তা বারবার পাঠ করা হয় বলে একে السبع المثانى বলা হয়।[৩৯] পবিত্র কুরআনেও একে এ নামে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪০]

৭. الوافية - পরিপূর্ণ : যেহেতু সূরা ফাতিহা কুরআনের সমস্ত তাৎপর্য দ্বারা পরিপূর্ণ, তাই এর নাম الوافية।

৮. الكنز - খনি : সূরায়ে ফাতিহা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের খনি বিশেষ।

৯. الكافية - যথেষ্ট : সূরায়ে ফাতিহা নামাযের ব্যাপারে অন্যান্য সূরার প্রয়োজন মিটাতে পারে, তাই একে الكافية বলা হয়।

১০. الاساس - ভিত্তি : এ সূরা কুরআনের ভিত্তি।

১১. النور - জ্যোতি : সূরায়ে ফাতিহা সংক্ষিপ্তভাবে পূর্ণ কুরআন সম্বলিত, আর কুরআনকে নূর বলা হয়, তাই সূরা ফাতিহাকেও নূর বলা হয়।

১২. الحمد - প্রশংসা সম্ভলিত সূরা : এ সূরায় আল্লাহর প্রশংসা রয়েছে, তাই একে প্রশংসা সম্বলিত সূরা বলা হয়।

১৩. الشكر - কৃতজ্ঞতার সূরা : এ সূরায় আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা তথা شكر এর বয়ান বলা হয়েছে।

---

৩৬ বুখারী, ৭৫৬; মুসলিম, ৩৯৪।
৩৭ মা'আরেফুল কুরআন, পৃ. ১, আল বুরহান, পৃ. ২৫।
৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।
৩৯ বুখারী, ৪৭০৩।
৪০ আল-কুরআন, ৮৭।

১৪. প্রথম প্রশংসার সূরা : এ সূরা আল্লাহর প্রশংসা সম্বলিত প্রথম সূরা।

১৫. সংক্ষিপ্ত প্রশংসার সূরা : এতে সংক্ষিপ্তাকারে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে।

১৬. ঝাড়-ফুঁকের সূরা : এ সূরা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করলে উপশম হয় এবং আল্লাহ তা'আলা ক্বারী বা পাঠককে সার্বিক উন্নতি দান করেন।

১৭. রোগ মুক্তির সূরা : রাসূল (স.) বলেছেন সূরা ফাতিহা সর্বপ্রকার রোগের প্রতিশেধক।

১৮. আরোগ্য দানকারী।

১৯. নামাযের সূরা : ইমাম শাফেয়ী (র.) এর নিকট এ সূরার ওপর নামায নির্ভরশীল। তাই একে سورة الصلواة (সূরাতুস্-সালাত) বলা হয়। অথবা, এ সূরা দ্বারা নামায আরম্ভ করা হয়, তাই একে নামাযের সূরা বলা হয়।

২০. প্রার্থনামূলক সূরা : এ সূরায় আল্লাহর নিকট কাঙ্ক্ষিত সত্যপথ প্রার্থনা করা হয়েছে।

২১. দরখাস্তের সূরা : এ সূরায় আল্লাহর নিকট পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও সত্যপথ প্রার্থনা করা হয়েছে।

২২. দরখাস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত সূরা : এ সূরা আল্লাহর নিকট পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও সত্য পথের সন্ধান চাওয়া হয়েছে।

২৩. প্রার্থনার সূরা : এ সূরায় প্রভুর সাথে চুপে চুপে কথা তথা প্রার্থনার কথা রয়েছে।

২৪. আবশ্যকীয় সূরা : কেননা, তা অধিক প্রয়োজনীয় সূরা।

২৫. আত্মনিবেদন করার সূরা : কেননা, বান্দা اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ বলে আপন প্রভুর নিকট সমুদয় সমস্যা সোপর্দ করে নিজেকে।

সূরা ফাতিহার নামসমূহের ক্ষেত্রে অনেক গুণবাচক নাম বর্ণনা করা হয়েছে। এ সব নামের মাধ্যমে সূরা ফাতিহার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

নাযিলের সময়কাল : মুহাম্মদ (স.) এর নবুওয়াতী জিন্দেগীর প্রথম দিকেই এ সূরাটি নাযিল হয়। তবে এর আগে সূরা আলাক, মুয্যাম্মিল, মুদ্দাসসির এর অংশবিশেষ নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু : এ সূরা মূলত বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর দরবারে সিরাতুল মুস্তাকিমের আবেদন-প্রার্থনা মাত্র। আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর বান্দাকে এভাবে দোয়া করার ভাষা ও পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

আলোচনা : এ সূরা মূলত "সিরাতুল মুস্তাকিম" নির্ভুল-সঠিক ও সরলপথ প্রদর্শনের জন্য বিশ্বজগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে বান্দার আকুল প্রার্থনা। কেননা মানুষ তার সীমিত ও সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে নিজের চলার পথ রচনার যোগ্যতা রাখে না। যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই কেবল সক্ষম তাঁর সৃষ্টির জন্য জীবনযাপন পদ্ধতিকে সহজ-সরল ও নির্ভুলভাবে পেশ করার এবং এটি তাঁরই হক বা অধিকার। কেননা, একজনের সৃষ্টির উপর অন্য কারো বিধান বা আইন চাপিয়ে দেয়ার অধিকার নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাই

ঘোষণা করেন "জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তারই" [৪১] আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন "আমার কাজতো কেবল পথনির্দেশ করা।"[৪২]

মানুষ নিজের জীবন পরিচালনার বিধান তৈরী করতে সক্ষম। কেননা আইন প্রণেতার জ্ঞানের পরিধি-বিস্তৃতি থাকতে হবে সীমাহীন। অথচ মানুষের জ্ঞান হচ্ছে অতি সামান্য। আইন প্রণয়নকারী সত্তা বা সংস্থাকে সে বিষয়সমূহের পরিপূর্ণ এবং নিখুঁত প্রকৃতিক জ্ঞান থাকতে হবে। যেমন-

১. অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের জ্ঞান, অর্থাৎ সর্বকালের জ্ঞান থাকতে হবে।

২. মানুষের Anatomical- শব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, Physiological পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক শারীরিক; স্বাভাবিক প্রাকৃতিক, Psychological মানসিক, Behavioral স্বভাবগত Emotional আবেগ-অনুভূতিগত সকল বিষয় জানতে হবে।

৩. পৃথিবী ও মাহকাশে যত কিছু আছে অর্থাৎ যা কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের কাজে লাগে বা মানুষকে প্রভাবিত করে তার সকল কিছু বা সকল বিষয় জানা থাকতে হবে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ ও নিখুঁত জ্ঞান ব্যতীত কোন সত্তা বা সংস্থা কখনই মানব জীবনের জন্য সার্বিকভাবে কল্যাণকর কোন আইন তৈরী করতে সক্ষম হবেন না।

শিক্ষা : সূরা ফাতিহার সাত আয়াতের সাতটি শিক্ষণীয় বিষয় নিচে দেয়া হলো :

১. যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত হবে- যিনি মহাবিশ্বের রব-প্রতিপালক।

২. চূড়ান্ত বিচার-ফয়সালার মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। শেষ বিচারের দিন তিনিই বান্দাদের মাঝে ইনসাফপূর্ণ বিচার করবেন। যার রায়ের সালার বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবে না।

৩. আনুগত্য, গোলামী-দাসত্ব, পূঁজা-উপাসনা তথা ইবাদত হতে হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য।

৪. সাহায্য কামনা করতে হবে একমাত্র তাঁরই কাছে অন্য কারো কাছে নয়।

৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কুরআনুল কারীম এর পথই হচ্ছে 'সিরাতুল মুস্তাকিম'। অতএব জীবনবিধান হিসেবে এ কিতাবকেই গ্রহণ করতে হবে।

৬. মানুষের মধ্যে তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে যারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতপ্রাপ্ত তথা : নবীগণ, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালিহীন।

৭. অনুসরণ করা যাবে না পথভ্রষ্ট ও আল্লাহ তা'আলার লানত-অভিশাপপ্রাপ্ত ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের।

---

৪১ আল কুরআন, ৭ : ৫৪।

৪২ আল কুরআন, ৯২ : ১২; আল-বুরহান, ১৯২।

২. বাকারাহ (গাভী)

নামকরণ : এই সূরার নাম বাকারাহ অর্থ গাভী। শব্দটি অত্র সূরায় মোট চারবার উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মূসা (অ.) এর সময়ে এক নরহত্যার রহস্য উদঘাটনের জন্য গাভী যবেহ করার ঘটনা ঘটে। এজন্যে এই শব্দটিকেই এক সূরার নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। (১) সূরাটি সবচেয়ে বড় সূরা। (২) সূরাটি সবচেয়ে বেশী আহ্কাম বা বিধি-বিধান সমৃদ্ধ।[৪৩] ৬৭নং আয়াতে হযরত মূসা (আ.) এর অনুসারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এই মর্মে আদেশ প্রদান করা হয়েছিল যে, স্মরণ কর, যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গরু যবেহ করার আদেশ দিয়েছেন, তারা বলেছিল 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ?' মূসা বলল, 'আল্লাহর স্মরণ নিচ্ছি যাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যাবেহ করার আদেশ দিয়েছেন।'[৪৪]

যোগসূত্র : সূরা ফাতিহার সাথে সূরা বাকারার যোগসূত্র হচ্ছে এই যে, সূরা ফাতিহায় 'সিরাতুল মুস্তাকিম' সঠিক পথে পরিচালিত হবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। আর অত্র সূরায় বান্দার পক্ষ থেকে পেশ করা আবেদন আল্লাহ পাকের দরবারে গৃহীত হওয়ার সংবাদ প্রদান করে বলা হচ্ছে যে, "এ কুরআন হচ্ছে মানুষের জন্য হিদায়াত।"[৪৫] 'আলিফ-লাম-মীম, এটি সেই কিতাব এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটি পথনির্দেশ'।[৪৬]

আলোচনা :

১ম রুকুর ১-৫ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে :

কুরআন এমন একখানা কিতাব, যা অকাট্য সত্য। এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

কুরআন থেকে হিদায়াত পেতে হলে মুত্তাকী হতে হবে। আর মুত্তাকীর গুণাবলী হচ্ছে : ক. গায়েব-অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা। খ. সালাত-নামায কায়েম করা। গ. আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় করা। ঘ. কুরআন ও এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ বিশ্বাস করা। ঙ. আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। এবং মুত্তাকী যারা সফল হবে তারা।

৬ ও ৭ নং আয়াতে কাফির-অবিশ্বাসীদের অবস্থা ও তাদের পরিণতির কথা বলা হয়েছে।

- ❖ ২য় রুকুর ৮-২০ নং আয়াতে মুনাফিকদের গুণাবলী ও পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে।
- ❖ ৩য় রুকুতে (২১-২৯ নং আয়াতে) বলা হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব করাই 'সিরাতুল মুস্তাকিম' বা সরল সহজ পথ।

---

৪৩ ইবনে কাসীর, কুরআনুল করীম, সাউদী আরব, পৃ. ১৮।
৪৪ আল কুরআন, ২ : ৬৭।
৪৫ আল কুরআন, ২ : ১৮৫।
৪৬ আল কুরআন, ২ : ১-২।

- ❖ ৪র্থ রুকুতে (৩০-৩৯ নং আয়াতে) আলোচনা করা হয়েছে, আদম (আ.) এর সৃষ্টি ও তাঁকে সিজদাহ্ দানে ইবলিসের অস্বীকৃতি, আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রীর জান্নাতে বসবাস ও শয়তানের ধোঁকায় জান্নাত থেকে বহিষ্কার, এই প্রেক্ষিতে আদম ও শয়তান একে অপরের শত্রু ঘোষণা এবং আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত অনুসরণ করলে কোন চিন্তা ও ভয় থাকবে না। আর যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করবে ও মিথ্যা জ্ঞান করবে তাদের জন্য রয়েছে চিরকালীন শাস্তি।
- ❖ ৫ম থেকে ১৪ নং রুকু (৪০-১২১ নং আয়াত) পর্যন্ত বনী ইসলাঈলের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস থেকে বড় বড় কতক ঘটনা তুলে ধরে মুসলিমদের সাবধান করা হয়েছে।
- ❖ ১৫ ও ১৬ নং রুকুতে (১২২-১৪১ নং আয়াতে) বলা হয়েছে, মানবজাতির সঠিক পথ নির্দেশনার দায়িত্ব ইবরাহিম (আ.) এর বংশের উপর দেয়া হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)-কে বড় ও কঠিন কয়েকটি পরীক্ষা করার পর তাকে মানব জাতির নেতা বলে ঘোষণা করা হয়, তারপর যত নবী-রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন, সবাই ইবরাহীম (আ.) এর বংশধর।
- ❖ ১৭ ও ১৮ নং রুকুতে (১৪২-১৫২ নং আয়াত) কিবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।
- ❖ ১৯ নং রুকুতে (১৫৩-১৬৩ নং আয়াতে)

  ধৈর্য ও সালাত এর মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করার নির্দেশ।

  যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তারা প্রকৃতপক্ষে মৃত নয়, বরং জীবিত।

  মুমিনদের জান-মালের পরীক্ষার ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আল্লাহ আছেন।

  সাফা ও মারওয়া পাহাড় আল্লাহর নিদর্শনসূহের অন্যতম।

  আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য নাযিলকৃত সুস্পষ্ট নিদর্শনসমুহ ও পথনির্দেশ গোপনকারীদের উপর আল্লারহ লানত।
- ❖ ২০ নং রুকুতে (১৬৪-১৬৭ নং আয়াতে) আসমান-জমিন, রাত-দিন আবর্তনের ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে তাওহীদের চেতনা সৃষ্টি করে আল্লাহর সাথে অন্য কোন সত্তা ও শক্তিকে শরীক করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে।
- ❖ ২১ থেকে ৩৯ নং রুকুতে (১৬৮-২৮৩ নং আয়াতে) অনেক মৌলিক বিষয়ের বিধান প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ ৩৬ থেকে ৩৯ রুকু, (২৬১-২৮৩) ২৩টি আয়াতে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সর্ম্পকে নিয়ম-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে।
- ❖ ৪০ নং রুকু (২৮৪-২৮৬ নং আয়াতে) কুরআনুল কারীমের সর্ববৃহৎ এই সূরার শেষ রুকু। এই আয়াত তিনটিকে সূরার উপসংহার বলা যায়।

৩. আলে ইমরান (ইমরানের বংশধর)

নামকরণ : আলে ইমরান অর্থ, ইমরান-এর বংশধর। হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর পিতার নাম ছিল ইমরান। হযরত মারইয়ামের পিতার নামও ইমরান। এ সূরায় "ইমরান" বলে মারইয়ামের পিতাকেই বুঝানো হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এই সূরার ৩৩-৩৫ নং আয়াতে ইমরান নামটি উল্লেখ হয়েছে এবং এ শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সূরার আরেকটি নাম আয্-যাহ্রাহ্ বা আলোকচ্ছটা।[৪৭] ঘোষণা হচ্ছে "অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আদম, নূহ এবং ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকে বিশ্ববাসীর উপর (নেতৃত্ব করার জন্য) মনোনীত করেছেন।"[৪৮]

আলোচনা

- আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তা। তিনিই ইঞ্জীল, তাওরাত ও ফুরকান নাযিলকারী। (২-৪)
- কুরআনের আয়াত দুরকমের। এক: 'মুহকামাত' (সুস্পষ্ট), যা কিতাবের আসল বুনিয়াদ। দুই: "মুতাশাবিহাত।" (অস্পষ্ট) বাঁকা মনের লোকেরা ফিৎনার তালাশে মুতাশাবিহাতের (অস্পষ্ট আয়াতের) পেছনে লেগে থাকে। বুদ্ধিমান যারা তারাই ঈমান আনে ও উপদেশ গ্রহণ করে। এবং আল্লাহর দরবারে সঠিক পথে চলার জন্য দোয়া করে। (৭-৯)

৪. নিসা (নারীগণ)

নামকরণ : এই সূরার নাম نساء অর্থাৎ নারীগণ। এ শব্দটি امراة শব্দের বহুবচন। এ সূরায় ২০ বার 'নিসা' শব্দটি উল্লেখ হয়েছে। এ সূরায় নারী অধিকারের ব্যাপারে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং এটিই সূরার নাম হিসেবে গৃহীত হয়েছে।[৪৯] আন-নিসা হচ্ছে সৌন্দর্যপূর্ণ।[৫০]

আলোচনা

- সূরাটি সূচনা করা হয়েছে মানুষের ঐক্যবদ্ধ মনোভাব জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে। সকল মানুষ সমান। নারী অধিকার, ইয়াতীমের অধিকার পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মৃত্যুর পরে সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা-মিরাস আলোচনা করা হয়েছে। (১-১৪)
- বিবাহের ক্ষেত্রে কোন কোন নারীকে বিয়ে করা হারাম তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (২২-২৪)

৪৭ মুসলিম, ৮০৪।
৪৮ আল কুরআন, ৩ : ৩৩।
৪৯ আল কুরআন, ৪:১।
৫০ সুনানু দারিমী, ৩৩৯৫।

- পারিবারিক জীবনে শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ চালু করা, নারীর বিবাহে সম্মানীয় মোহর, ন্যায়সংগত ভরণ-পোষণ প্রদান পুরুষের উপর আবশ্যকীয়-ফরয করা হয়েছে। পুরুষ নারীর ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বশীল। নারীর সম্পদের অধিকার ও উত্তারাধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং এ মূলনীতি সর্বত্র প্রযোজ্য হবে। (১৫-৪২)
- মুসলিম সমাজের জন্য নির্দেশনা হচ্ছে, আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল মুহাম্মাদ (স.) প্রদর্শিত বিধানের মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা অবশ্যই কর্তব্য। এটাই কল্যাণকর, অন্যথায় বিপদ।
- ঈমানদার লোকেরা কিভাবে শত্রুর মোকাবিলায় আত্মরক্ষা করবে, গোপন ষড়যন্ত্র ও ভণ্ড মিথ্যাবাদীদের প্রতারণা থেকে সতর্কতা অবলম্বন; পলাতক সৈনিকদের সাথে আচরণ কেমন হবে। (৭১-৯১)
- মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান, দীন-ই ইসলামের জন্য শত্রু অধ্যুষিত বাসস্থান থেকে হিজরত করা এবং এর ফযীলত। (৯২-১০০)
- যুদ্ধ ও ভয়-ভীতিকালীন সময়ে নামাযের বিধান। (১০১-১০৪)
- মিথ্যা, খিয়ানত বিশ্বাসঘাতকতা ও ধোঁকাবাজী করা অবশ্যই পাপের কাজ এবং এর পরিণতি জাহান্নাম। আর ঈমান ও সৎকর্মের পরিণতি জান্নাত, সে নারী হোক বা পুরুষ হোক। (১০৫-১২৬)
- অবশ্যই নারী ও ইয়াতীমদের সাথে আচরণ হতে হবে ন্যায়সংগত, যথার্থ এবং ভদ্রোচিত। ইনসাফের ধারক ও পতাকাবাহী হওয়ার নির্দেশ। মুমিনদের বাদ দিয়ে অবিশ্বাসীদের বন্ধু না বানানোর নির্দেশ।
- আল্লাহ, কিতাব ও ঈসা (আ.) সম্পর্কে আহলে কিতাবদের অযৌক্তিক দাবী ও এর জবাব প্রদান করা হয়েছে। (১৫৩-১৭৫)
- কালালাহ (যে মৃত ব্যক্তির বাপ-দাদা নেই এবং কোন সন্তান নেই) এর বোনকে মৃতের সম্পত্তির অর্ধেকের হকদার বলা হয়েছে। (১৭৬)

৫. মায়িদা (খাদ্যভর্তি খাঞ্চা/দস্তরখানা)

নামকরণ : এই সূরার নাম مائدة - অর্থাৎ খাদ্যভরা পাত্র। এ সূরায় শব্দটি ২ বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক আকাশ থেকে খাঞ্চা প্রার্থনার কথা প্রসঙ্গে বিষয়টি এসেছে। ১১২ ও ১১৪ নং আয়াতে مائدة - শব্দটির উল্লেখ আছে।

আলোচনা

- সূচনা করা হয়েছে ওয়াদা-অঙ্গীকার বা চুক্তি পূর্ণ করার নির্দেশের মাধ্যমে। চুক্তি বা ওয়াদা মানুষের সাথে হোক বা আল্লাহর সাথে হোক। খাদ্য হালাল-হারামের নিশ্চিত বিধান পেশ করা হয়েছে। কোন রকমের পক্ষপাতমূলক এবং কুসংস্কারের উর্ধ্বে মানুষের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। (১-৫)
- শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও নিয়ামতের স্মরণ এবং যে কোন অবস্থায় ন্যায়বিচার-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ। (৬-১১)
- মূসা (আ.) এর সাথে বনী ইসলাঈলদের আচরণ উল্লেখ করে সতর্ক করা হচ্ছে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে। তারা নাফরমানী ও ভীরুতা প্রদর্শনের সাথে যে শাস্তি ভোগ করেছিল তার থেকে বেশি শাস্তি তোমরা পাবে যদি তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (স.) কে না মানো। (১২-২৬)
- আদম (আ.) এর এক পুত্র হিংসার দরুন নিজ ভাইকে হত্যা করেছিল। এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, ইহুদীরা নবী মুহাম্মাদ (স.) ও তাঁর সাহাবীদেরকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র করছিল। সে জন্য তাদেরকে মন্দ বলা। খুন-হত্যা জঘন্য অপরাধ। এর শাস্তি ও পরিণতি মারাত্মক ভয়াবহ। চুরির শাস্তি প্রসঙ্গসহ ইহুদীদের অপকর্মের বিবরণ রয়েছে। (২৭-৪৩)
- আল্লাহ প্রদত্ত বিধান দিয়েই বিচার-ফয়সালা করতে হবে অন্যথায় অবিশ্বাসী, যালিম ও ফাসিক ঘোষণা করা হয়েছে। মুসলিম অবশ্যই পক্ষপাতহীন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। তারা অবশ্যই নিজেদের ঈমান ও ভ্রাতৃত্ববোধ রক্ষা করবে। তারা খ্রিষ্টানদের ধার্মিকতা নম্রতাসহ অন্যান্য সব গুণকে মূল্যায়ন করবে। (৪৪-৮৬)
- হালাল ও উত্তম বস্তুসমূহ ঈমানদারগণ কৃতজ্ঞতার সাথে ভোগ করতে পারবে। তবে হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়ের ব্যাপারে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে। যেমন– অযথা কসম করা, মদ, জুয়াবাজিসহ শয়তানী কাজসমূহ। পবিত্র স্থানকে কুসংস্কারমুক্ত রাখতে হবে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীর দণ্ডবিধান ঘোষণা করা হয়েছে। (৮৭-১০৮)

৬. আনআম (গবাদিপশু)

নামরকণ : এই সূরার নাম الأنعام - গৃহপালিত পশু। এ সূরার ১৬ ও ১৭ নং রুকুতে গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে কোন কোনটির হারাম হওয়ার সম্পর্কে জাহেলী যুগের কুসংস্কারের প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ দৃষ্টিতেই এর নাম "আনআম" রাখা হয়েছে। অত্র সূরায় শব্দটি ১৩৬, ১৩৯, ১৪২ নং আয়াতে এসেছে।

বিষয়বস্তু : তাওহীদের দাওয়াত ও শিরক বাতিলকরণ, আখিরাত-পরকালের যৌক্তিকতা, জাহেলী যুগের লোকদের মনে বদ্ধমূল অমূলক ধারণা-কল্পনার প্রতিবাদ, ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহ, বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নের জবাব, মুমিনদের সান্ত্বনা দান ও অবিশ্বাসীদের সতর্ক ও ভীত-সন্ত্রস্ত করা।[৫১]

৭. আরাফ (জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান)

নামকরণর: الاعراف - জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান। জান্নাতবাসী ও দোযখবাসীদের মাঝখানে الاعراف নামক স্থানের অধিবাসীদের اصحاب الاعراف বলা হয়েছে। এই শব্দটিকেই নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অত্র সূরায় শব্দটি ৪৬ নং আয়াতে ২ বার এসেছে। এটা এমন একটি সূরা যাতে আ'রাফবাসীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৫২]

বিষয়বস্তু : নবুওয়াত ও রিসালাত কবুল করার জন্য মাক্কাবাসীদের প্রতি বিশেষ আহ্বান।

৮. আনফাল (যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী)

الانفال শব্দটি نفل -এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত। পরিভাষায় যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গনীমতের মালকে 'আনফাল' বলা হয়। প্রথম আয়াতেই দুবার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটিই নাম হিসেবে গণ্য হয়েছে। এ সূরায় গনীমত বা আনফাল বণ্টনের নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে।[৫৩]কেউ কেউ এটাকে সূরা 'বদর'ও নাম দিয়েছেন।[৫৪]

বিষয়বস্তু : যুদ্ধে বিজয়ীরা পরাজিতদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করবে, যুদ্ধ বন্দীদের সাথে আচরণ কেমন হবে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৯. তাওবা (অনুশোচনা)

নামকরণ : তাফসীরে এ সূরার ১৩টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে বিখ্যাত হলো: সূরা আত-তাওবাহ্, সূরা আল-বারাআহ্ বা বারাআত। বরাআত বলা হয় এজন্য যে, এতে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্তির উল্লেখ রয়েছে। আর 'তাওবাহ্' বলা হয় এজন্য যে, এতে মুসলিমদের তাওবাহ্ কবুল হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়াও এ সূরার আরও কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হয়, যেমন- সূরা আল-ফাদিহা বা গোপন বিষয় প্রকাশ করে লজ্জা দিয়ে মাথা হেটকারী।[৫৫] এ সূরার আরেক নাম: সূরা আল-আযাব। এ ছাড়াও এ সূরার অন্যান্য নামের মধ্যে রয়েছে, 'আল মুকাশকিশাহ' 'আল বুহুস,' 'আল-মুনাক্কিরাহ,' 'আল-হাফিরাহ,' 'আল-মুসীরাহ,' 'আল মুবা'সিরাহ,' আল মুদামদিমাহ,' 'আল মুখযিয়াহ,' 'আল মুনাক্কিলাহ,' 'আল মুশাররিদাহ'। পরবর্তী নামগুলোর অধিকাংশই মুনাফিকদের অবস্থা

৫১ কুরআনুল করীম-১১৪, পৃ. ৮২।
৫২ কুরআনুল করীম, সউদী আরব, পৃ. ৭২৬।
৫৩ আল কুরআন, ৮:১।
৫৪ বুখারী, ৮৫৫২।
৫৫ বুখারী, ৪৮৮২; মুসলিম, ৩০৩১; মুস্তাদরাকে হাকেম, ৩২৭৪।

বর্ণনাকারী।[৫৬] বিসমিল্লাহ ছাড়াই এই সূরা নাযিল হয় বিধায় এর শুরুতে বিসমিল্লাহ নেই। কুরআন যে মহান আল্লাহর বাণী এবং এটি যে সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে তার প্রমাণ এই সূরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ না থাকা।

১০. ইউনুস (ইউনুস)

নামকরণ : ইউনুস (আ.) একজন নবীর নাম। কারণ সূরার ৯৮ নং আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে।

বিষয়বস্তু : শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সুসংবাদ ও পরস্পর সংযোজিত ধারাবাহিক এ ভাষণটির বিষয়বস্তু হচ্ছে দাওয়াত, সতর্কীকরণ, অনুভূতি দান ও ভর্ৎসনাকরণ।

১১. হূদ (হূদ)

নামকরণ : এ সূরার নাম সূরা হূদ। একজন প্রখ্যাত রাসূলের নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। তার বাহ্যিক কারণ হচ্ছে, এ সূরার ৫৩ নং আয়াতে এর উল্লেখ আছে। যেখানে হূদ আলাইহিস সালাম ও তার কাওমের মধ্যকার কথোপকথন আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু : দাওয়াত, উপদেশ ও সতর্কবাণী।

১২. ইউসুফ (ইউসুফ)

নামকরণ : এ সূরার নাম সূরা ইউসুফ। কারণ পুরো সূরা জুড়ে আছে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা।

পটভূমি : ইহুদীদের কুপরামর্শে রাসূল (স.)-কে বেকায়দায় ফেলার নিয়তে কিছু লোক প্রশ্ন করেছিল যে, বনী ইসরাঈল কী কারণে মিসর গিয়েছিল? তাদের ধারণা ছিল যে, রাসূল (স.) এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না। ফলে তার নবী হওয়ার দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ সূরাটি নাযিল করে ঐ প্রশ্নের চমৎকার জবাব তাঁর মুখেই শুনিয়ে দিলেন। এ জবাবের মাধ্যমে রাসূল (স.) এর সাথে কুরাইশদের অন্যায় ব্যবহারকে ইউসুফ (আ.) এর ভাইদের আচরণের মতোই অন্যায় বলে জানিয়ে দেয়া হলো।

১৩. রা'দ (বজ্রধ্বনি-মেঘের গর্জন)

নামকরণ : এই সূরার নাম আর-রা'দ-অর্থ মেঘের গজর্ন বা বজ্রধ্বনি। এ শব্দটিকেই এর নাম রাখা হয়েছে। শব্দটি এ সূরায় মাত্র একবার উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩ নং আয়াতে রা'দ উল্লেখ আছে।

আলোচ্য বিষয় : তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সত্যতা প্রমানে যুক্তিসহকারে আলোচনা করা হয়েছে এবং মুমিনদের জন্য রয়েছে মহা সান্ত্বনা।

১৪. ইবরাহীম (ইবরাহীম)

নামকরণ : মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর নামে এই সূরার নামকরণ হয়েছে

৫৬ আসমাউ সুওয়ারিল কুরআন।

আলোচ্য বিষয় : রসূল (স.) ও তাঁর প্রতি নাযিলকৃত কিতাব অস্বীকারকারীদের উপদেশ এবং নিকৃষ্ট ও জঘন্য ষড়যন্ত্রকারীদের ভীতি প্রদর্শন।

১৫. হিজর (প্রস্তরময় ভূমি, সামূদ জাতির বাসস্থান)

নামকরণ : এই সূরার নাম حجر অর্থ প্রারম্ভময় ভূমি। ৮০ নং আয়াতে উল্লিখিত এ শব্দটিকে নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: বিরোধীদেরকে কঠোরভাবে সাবধান করা ও রাসূল (স.) কে সান্ত্বনা প্রদান করা।

১৬. নাহল (মৌমাছি)

নামকরণ : এ সূরার নাম النحل - অর্থ মৌমাছি, মধু-মক্ষিকা, শব্দটি এ সূরায় একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় : শিরক-এর অসারতা ও তাওহীদের সত্যতা প্রতিষ্ঠা নবীর দাওয়াত গ্রহণের উপদেশ এবং দাওয়াত দানের পদ্ধতি, হকের বিরোধিতা ও সত্যের পথে মানুষকে বাধা প্রদানের ব্যাপারে কঠোর ভয় দেখানো।

১৭. বানী ইসরাঈল/ইসরা (ইসরাঈলের (ইয়াকূব (আ)-এর বংশধর/রাতের ভ্রমণ)

নামকরণ: এ সূরার নাম সূরা আল-ইস্‌রা। কারণ সূরার প্রথমেই রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইসরা সংক্রান্ত বর্ণনা স্থান পেয়েছে। তাছাড়া সূরাটি সূরা বনী ইসলাঈল নামেও প্রসিদ্ধ। এ নামটি হাদীসেও এসেছে। কারণ এতে বনী ইসরাঈলদের উত্থান-পতনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[৫৭]

বৈশিষ্ট্য: আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ বলেন, বনী ইসরাইল, আল-কাহফ, মারইয়াম, ত্বা-হা এবং আম্বিয়া এগুলো আমার সবচেয়ে প্রাচীন সম্পদ বা সর্বপ্রথম পুঁজি।[৫৮] এর অর্থ, প্রাচীন সূরাসমূহের মধ্যে এগুলো অন্যতম। এগুলোর বিশেষ বিশেষত্ব রয়েছে। কারণ এগুলো অনেক কাহিনী এবং নবী-রাসূলগণের কিস্‌সা সমৃদ্ধ। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিরাত্রে সূরা বনী ইসরাঈল ও আয-যুমার পড়তেন[৫৯]

আলোচ্য বিষয়: সাবধান ও সতর্কীকরণ, বুঝা-সমঝ দান ও শিক্ষাদান। তাওহীদ, আখিরাত, রিসালাত ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের চৌদ্দ মূলনীতি।

১৮. কাহফ (গুহা)

নামকরণ: এ সূরার নাম সূরা আল-কাহফ। কারণ সূরার মধ্যে কাহাফ বা গুহাবাসীদের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

---

৫৭ তিরমিযী, ২৯২০।
৫৮ বুখারী, ৪৭৩৯।
৫৯ মুসনাদে আহমাদ, ৬/১৮৯; তিরমিযী, ২৯২০।

বৈশিষ্ট্য: রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: 'যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জারের ফেৎনা থেকে নিরাপদ থাকবে'।[৬০] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: 'যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের শেষ দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে মুক্ত থাকবে।[৬১] অন্য এক হাদীসে বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেন, এক লোক সূরা আল-কাহাফ পড়ছিল তার ঘরে ছিল একটি বাহন। বাহনটি বার বার পালাচ্ছিল। সে তাকিয়ে দেখল যে, মেঘের মতো কিছু যেন তাকে ঢেকে আছে। সে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে সেটা বর্ণনা করার পর রাসূল (স.) বললেন: হে অমুক! তুমি পড়। এটাতো কেবল 'সাকীনাহ' বা প্রশান্তি যা কুরআন পাঠের সময় নাযিল হয়।[৬২] অন্য হাদীসে এসেছে, 'যে কেউ শুক্রবারে সূরা আল-কাহাফ পড়বে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত সে নূর দ্বারা আলোকিত থাকবে।'[৬৩] অপর হাদীসে এসেছে, 'যেভাবে সূরা আল-কাহাফ নাযিল হয়েছে সেভাবে কেউ তা পড়লে সেটা তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর বা আলোকবর্তিকা হবে।'[৬৪]

১৯. মারইয়াম (মারইয়াম (ঈসা (আ) এর মা)

নামকরণ: সূরার নাম মারইয়াম, যিনি হযরত ইসা (আ.) এর মা-জননী। প্রতীকী নাম হিসেবে এই সূরারও নাম রাখা হয়েছে। শব্দটি অত্র সূরায় তিনবার এসেছে।

আলোচনা

- যাকারিয়া (আ.) তাঁর উত্তরাধিকারী এর ব্যাপারে পেরেশানি ও ইয়াহইয়াকে আল্লাহ তা'আলা পুত্র হিসেবে দান করলেন। (১-১৫)
- ঈসা (আ.) এর মাতা মারইয়াম (আ.) তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক সাংঘাতিক নিন্দা ও অপবাদের শিকার হন। কিন্তু 'ঈসা' (আ.) তাঁর জন্য সান্ত্বনাদানকারী ও প্রশান্তিদানকারী হয়। (১৬-৪০)
- ইবরাহীম (আ.) নিজ বিশ্বাসের জন্য তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছেন, এমনকি তার অবিশ্বাসী পিতা কর্তৃক, কিন্তু তিনি তাদের পরিত্যাগ করেছেন এবং ভাগ্যবান হয়েছেন; মূসা (আ) তাঁর ভাই হারুন কর্তৃক সহযোগিতাপ্রাপ্ত হয়েছেন; ইসমাইল (আ.) তাঁর পরিবারকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং ইদরীস ছিলেন সত্যপন্থী ও উন্নত মর্যাদার; তাঁরা মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু মানুষ তাদের উত্তম জীবন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেনি। (৪১-৬৫)

---

৬০ আবু দাউদ, ৪৩২৩; আহমাদ, ৬/৪৪৯।
৬১ মুসলিম, ৮০৯।
৬২ বুখারী, ৩৬১৪; মুসলিম, ৭৯৫।
৬৩ মুস্তাদরাকে হাকিম, ২/৩৬৮; সুনানু দারিমী, ২/৪৫৪।
৬৪ মুস্তাদরাকে হাকিম, ১/৫৬৪।

- আখিরাতে অবিশ্বাসী হওয়া মানুষের উচিত নয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে কলঙ্কিত হওয়া ঠিক নয়। (৬৬-৯৮)

২০. ত্ব-হা (ত্ব-হা)

নামকরণ: সূরার প্রথম দুটো অক্ষর طه কেই সূরার নাম রাখা হয়েছে। একে الحروف المقطعات বলা হয়। এর অর্থ জানা কোন জরুরী বিষয় নয়। এর সঠিক অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন।

আলোচনা

- কুরআন মাজীদ কোন বিপদ বা কষ্টের উপলক্ষ নয়, বরং ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে উপঢৌকন-উপদেশ। (১-৮)
- মূসা (আ.) রিসালাত ও নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং তাঁর ভাই হারুনকে সাথে নিয়ে ফিরাউনের দরবারে তার মিশন পরিচালনা করেছিলেন। (৯-৩৬)
- মূসা (আ.) এর মা তাঁর কচি শিশুকে কীভাবে নদীতে নিক্ষেপ করলেন, আল্লাহ তা'আলার নিজ তত্ত্বাবধানে কীভাবে ফিরাউনের বাড়িতে লালিত-পালিত হলেন এবং ফিরাউনের দরবারে কীভাবে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা পেশ করলেন। (৩৭-৭৬)
- মূসা (আ.) কীভাবে তাঁর সম্প্রদায়কে পরিচালনা করেছেন এবং তাদের বিদ্রোহ দমন করেছেন এবং সামিরী কর্তৃক তাদের উদ্দীপ্ত হওয়ার বিষয় কি ছিল। (৭৭-১০৪)
- বিচার দিবসে সবাইকে জবাবদিহিতায় বাধ্য করা হবে। (১০৫-১৩৫)

২১. আম্বিয়া (নবীগণ)

নামকরণ : সূরার নাম انبياء অর্থ, বার্তাবাহকগণ। শব্দটি نبى এর বহুবচন। الانبياء শব্দটি এই সূরায় উল্লেখ নেই। তবে তেরজন নবীর নাম ও তাদের সংগ্রামী ভূমিকা উল্লেখ আছে। শুধু পরিচয়ের জন্য প্রতীক হিসেবে এই নামকরণ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিয়ষ: রাসূল (স.) ও কুরাইশ সর্দারদের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল এ সূরায় তা আলোচিত হয়েছে হয়েছে। রাসূল (স.) এর সত্যতা এবং তাওহীদ ও আখিরাতের বিরুদ্ধে তারা যেসব আপত্তি, সন্দেহ ও প্রশ্ন তুলত এ সূরায় সেসবের জবাব দেয়া হয়েছে।

২২. হাজ্জ (হজ্জ)

নামকরণ: দীনের অন্যতম ভিত্তি হজ্জের নামে এই সূরার নাম الحج নির্ধারণ কর হয়েছে। এটিও পরিচয়ের জন্য সূরার নাম প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: উপদেশ-নসীহত, শিরক-এর অসারতা তাওহীদ ও পরকালের অকাট্য দলীল-প্রমাণ হজ্জ এর ইতিহাস ও এর শিক্ষা।

২৩. মু'মিনূন (বিশ্বাসীগণ)

নামকরণ: এই সূরার নাম المؤمنون অর্থ বিশ্বাসীগণ। পয়লা আয়াতের তৃতীয় শব্দটিকেই সূরার নাম রাখা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: রিসালাত। মুহাম্মাদ (স.)-কে রাসূল হিসেবে মান্য করা। যুগে যুগে নবীগণকে যারা অমান্য করেছে তারাই অজ্ঞ-মূর্খ এবং জাহেল। সুতরাং তোমরা তাদের মতো হয়ো না। প্রত্যেক যুগের নবী-রাসূল একই শিক্ষা দিয়েছেন। সকল নবীর দীন একই দীন কেননা এটা এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ দীন ছাড়া দুনিয়ার যত ধর্ম আছে সেসব মানুষের তৈরী। যেসব জাতি নবীর কথা শুনেনি রবং বিরোধিতা ও জিদ ধরেছে তারা সব ধ্বংস হয়েছে।

২৪. নূর (আলো, জ্যোতি)

নামকরণ: এই সূরার নাম نور - অর্থ আলো-জ্যোতি। শব্দটি অত্র সূরায় ৪ বার এসেছে।

আলোচ্য বিষয়: মু'মিনদের উন্নত নৈতিক শিক্ষা প্রদান। ইসলামের যৌননীতি এবং এ বিধান লংঘনের শাস্তি এবং পারিবারিক ও সামাজিক বিধান।

২৫. ফুরকান (পার্থক্যকারী)

নামকরণ: এই সূরার নাম الفرقان অর্থ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। প্রথম আয়াতে উল্লিখিত এ শব্দটিকেই নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: কুরআন মাজীদ, মুহাম্মাদ (স.) এর নবুওয়াত ও অবিশ্বাসীদের সন্দেহ ও আপত্তির জবাব।

২৬. শুআ'রা (কবিগণ)

নামকরণ: এই সূরার নাম الشعراء অর্থ: কবিগণ, শব্দটি شاعر (কবি) এর বহুবচন। ২২৪ নং আয়াতের এ শব্দটিকেই সূরার না দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: হঠকারী এ জাতিকে বুঝাবার জন্য ইতিহাসের সাতটি কওমের অবস্থা এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে।

২৭. নামল (পিঁপড়া/পিপীলিকা)

নামকরণ: এই সূরার নাম النمل অর্থ পিঁপড়া-পিপিলিকা। সূরার পরিচয়ের জন্য এ নামই রাখা হয়েছে। শব্দটি অত্র সূরায় ১৮ নং আয়াতে তিনবার এসেছে।

আলোচ্য বিষয় : কুরআনুল কারীমের সত্যতা, আখিরাত ও তাওহীদ।

২৮. কাসাস (কাহিনী/কিসসা)

নামকরণ: এই সূরার নাম القصص- অর্থ, ধারাবাহিকভাবে কাহিনী বা ঘটনা বর্ণনা করা। হযরত মূসা (আ.) প্রসঙ্গে কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা এসেছে এ সূরায় ২৫নং আয়াতে উল্লিখিত এ শব্দটিকেই নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় : মক্কাবাসীদের সতর্ক-সচেতন করার জন্য বলা হচ্ছে- আল্লাহর ইচ্ছার সাথে কে লড়াই করতে পারে এবং তাঁর বিরুদ্ধে কার কৌশল সফল হতে পারে? তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের মানসিক রোগের চিকিৎসা করা হয়েছে।

২৯. আনকাবূত (মাকড়সা)

নামকরণ: এই সূরার নাম العنكبوت - অর্থ, মাকড়সা। ৪১ নং আয়াতে উল্লিখিত এ শব্দটিকেই এর নাম নির্ধরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যাতে আনকাবূত শব্দটি রয়েছে।

আলোচ্য বিষয় : ঈমানের সাথে পরীক্ষা এক চিরন্তন বিধান। কঠিন বিপদেও দৃঢ়চেতা মন নিয়ে ঈমান ও ইসলামের উপর দাঁড়িয়ে থাকা। সাহস ও হিম্মতের প্রেরণা দান। দুর্বল ঈমানদারদের লজ্জাদান। প্রয়োজনে হিজরত করার পরমর্শ। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমেই মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

৩০. রূম (রোম সাম্রাজ্য)

নামকরণ : এই সূরার নাম الروم - অর্থাৎ প্রাচীন অন্যতম প্রধান পরাশক্তি-রোম সাম্রাজ্যকে বুঝানো হয়েছে। সূরার ২নং আয়াতে উল্লিখিত এ রোম সাম্রাজ্যের নামেই সূরার নামকরণ হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় : কুরআনের ভবিষ্যৎ বাণী যে অকাট্য সত্য এবং এটা আল্লাহরই পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এর প্রমাণ এই সূরা। তাওহীদ ও আখিরাত।

৩১. লুকমান (লুকমান)

নামকরণ : লুকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে যে নসীহত ও উপদেশাবলী প্রদান করেছেন ১২ ও ১৩ নং আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য এ সূরার নামও لقمان রাখা হয়েছে।[৬৫]

আলোচ্য বিষয়ঃ তাওহীদের সত্যতা স্বীকার ও শিরকের অসারতা।

৩২. সাজদাহ (সাজদা)

নামকরণ: ১৫ নং আয়াতের সাজদাহ্ শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে চয়ন করা হয়েছে। সাজদাহ অর্থ-মাথা অবনত করা, সাজদাহ করা।

আলোচ্য বিষয়: তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ দূর করা। এসব মহাসত্যের উপর ঈমান আনার দাওয়াতই সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয়।

৩৩. আহযাব (দলসমূহ)

---

৬৫ আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর।

নামকরণঃ আরবী حزب মানে দল, গোত্র, সম্প্রদায়। সূরার নাম- الاحزاب অর্থ : দলসমূহ। শব্দটি ২০ ও ২২ নং আয়াতে মোট তিনবার এসেছে এবং এ শব্দটিকেই সূরার নাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ঃ আহযাব ও বনু কুরাইয়ার যুদ্ধ, রাসূল (স.) এর বিবাহ ও পারিবারিক জীবন এবং বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ। হিজাবের নির্দেশনা প্রদান।

৩৪. সাবা (সাবা নগরী)

নামকরণঃ এই সূরার নাম سبا - এটি একটি দেশ-শহর বা জাতির নাম। যারা ইয়েমেনের একটি অঞ্চলে বসবাস করত তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা এসেছে এ সূরায়। সূরার পরিচয়ের জন্য প্রতীকী নাম হিসেবে এ নাম রাখা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় : তাওহীদ, আখিরাত ও রাসূল (স.) এর নবুওয়াত সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের সন্দেহ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অপবাদের জবাব এবং তাদেরকে এই অপকর্মের ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের উদাহরণ দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

৩৫. ফাতির (সৃষ্টিকর্তা)

নামকরণঃ এই সূরার প্রথম আয়াত থেকেই এর নামকরণ হয়েছে। এর দুটি নাম فاطر - অর্থ সৃষ্টিকারী। ملائكة -অর্থ ফেরেশতা।

আলোচ্য বিষয়ঃ অবিশ্বাসীদের বিরোধিতার জবাব ও তাদের প্রতি উপদেশ।

৩৬. ইয়াসীন (ইয়া-সীন)

নামকরণ : এই সূরার নাম يس - এটা দুটি অক্ষর। এই দুঅক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে এ সূরা। আর এটাকেই নাম রাখা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়ঃ সৃষ্টিজগতের নিদর্শনসমূহ ও বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাওহীদ ও আখিরাতের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। মুহাম্মাদ (স.) এর নবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

৩৭. সাফফাত (কাতার, সারিবদ্ধ, শ্রেণিবদ্ধ)

নামকরণঃ এই সূরার الصفات শব্দকেই নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ, সারিবদ্ধ-কাতারবদ্ধ।

আলোচ্য বিষয়ঃ তাওহীদ, আখিরাত রিসালাত ও কাফেরদের নিকৃষ্ট আচরণের প্রতিবাদ ও কঠোর ভাষায় ধমক।

৩৮. সোয়াদ (সাদ)

নামকরণ : 'ص' -সূরার প্রথম অক্ষরটিকেই সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: তাওহীদ, আখিরাত, রিসালাত ও অবিশ্বাসীদের জন্য সতর্কবাণী।

৩৯. যুমার (সম্প্রদায়/দল)

নামকরণ: সূরার ৭১ ও ৭৩ নং আয়াতের زمر শব্দটি দিয়েই এর নামকরণ করা হয়েছে। অর্থ, সম্প্রদায় দল।

আলোচ্য বিষয়: তাওহীদের সত্যতা ও এর সুফল, শিরকের অসারতা, ঈমানের উপর দৃঢ়তা ও অবিশ্বাসীদের মন্দ পরিণতি।

৪০. মু'মিন/গাফির (বিশ্বাসী/ক্ষমাকারী)

নামকরণ: সূরার ২৮নং আয়াতে ফিরাউনের বংশের এক 'মু'মিন' ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ مؤمن শব্দটিকেই এ সূরার নাম দেয়া হয়েছে। ফিরাউনের দরবারে ঐ 'মু'মিন' ব্যক্তির প্রদত্ত ভাষণে মুমিনের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী বলা হয়েছে ৪০ নং আয়াত।

আলোচ্য বিষয়: তৎকালীন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা। রসূল (স.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে বলে ইঙ্গিত করে এ সূরায় মূসা (আ.)-কে ফিরাউন যে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে সে কাহিনীটি শুনিয়ে দেয়া হয়েছে।

৪১. হা-মীম আস সাজদাহ/ফুসসিলাত (হামীম সাজদা/বিশদভাবে বিবৃত)

নামকরণ: حم ও سجدة দুটো শব্দ দিয়ে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি ঐ সূরা, যা হা-মীম দিয়ে শুরু হয়েছে এবং যার মধ্যে ৩৭ নং আয়াতে তিলাওয়াতে সাজদার আয়াতও রয়েছে। এ সূরার আরো একটি নাম রয়েছে فصلت যা ৩নং আয়াতে এসেছে।

আলোচ্য বিষয় : কুরআনুল কারীম-এর সত্যতা ও এর উপর অটল থাকার গুরুত্ব। আল্লাহর সৃষ্টি নিদর্শন।

৪২. আশ-শূরা (পরামর্শ)

নামকরণ: ৩৮ নং আয়াতের شورى শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ- পরমর্শ।

আলোচ্য বিষয়: তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত।

৪৩. আয-যুখরুফ (স্বর্ণ/সোনালী প্রলেপ)

নামকরণ: এ সূরার ৩৫ নং আয়াতের زخرفا - শব্দটিকেই এ সূরার নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থ- স্বর্ণ বা সোনালী প্রলেপ। ৩৫ নং আয়াতে শব্দটি এসেছে।

আলোচ্য বিষয় : তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে মুত্তাকী ও অবিশ্বাসীদের পরিণাম।

৪৪. দুখান (ধোঁয়া/বাষ্প)

নামকরণ: সূরার ১০ নং আয়াতের دخان - শব্দটিকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অর্থ, ধোঁয়া-বাষ্প।

আলোচ্য বিষয়: কুরআন আল্লাহর কালাম। যারা কুফরী করে তাদের শাস্তি বড়ই মারাত্মক।

৪৫. জাছিয়াহ (নতজানু অবস্থা, হাঁটু পেতে বসা)

নামকরণ: ২৮ নং আয়াতের جاثية - শব্দটিকেই এ সূরার শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ- হাঁটু পেতে বসা, নতজানু অবনমিত।

আলোচ্য বিষয়: তাওহীদ ও আখিরাত সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তির জবাব ও সতর্কবাণী।

৪৬. আহকাফ (বালুকাস্তূপ (আদ জাতির বাসস্থান)

নামকরণ: সূরার ২১ নং আয়াতের الاحقاف। শব্দটি দ্বারা নাম রাখা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ বালুকাস্তূপ। কওমে-আদ এর বাসস্থান।

আলোচ্য বিষয়: তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত।

৪৭. মুহাম্মদ (মুহাম্মদ (স.) / কিতাল কেননা এতে "কিতাল" তথা জিহাদের বিধি বিধান বর্ণিত হয়েছে।[৬৬]

নামকরণ: সূরার ২ নং আয়াতে মুহাম্মদ (স.) এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকেই এর নামকারণ হয়েছে محمد। 'মুহাম্মাদ' শব্দের অর্থ প্রশংসিত।

আলোচ্য বিষয়: যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা প্রসংগে হিদায়াত প্রদান।

৪৮. ফাত্হ (বিজয়)

নামকরণ: সূরার নাম الفتح অর্থ বিজয়। ১, ১৮ ও ২৭ নং আয়াতে শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ শব্দটি দিয়েই সূরার নাম রাখা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির ফলাফল ও পর্যালোচনা।

৪৯. হুজুরাত (কক্ষ, হুজরাখানা)

নামকরণ: সূরার নাম الحجرات - অর্থ ঘরের চার দেয়াল, কক্ষ বা হুজরাখানা। ৪ নং আয়াতে উল্লিখিত এ শব্দটিকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: মুসলিম সমাজের আদব-কায়দা, নিয়ম-নীতি ও ইসলামী সংস্কৃতি।

৫০. ক্বাফ (কা-ফ)

নামকরণ: এই সূরার প্রথম হরফ ق - কেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: শুরুতে রিসালাতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, অবশ্য মূল আলোচ্য বিষয় আখিরাত।

৫১. যারিয়াত (বিক্ষিপ্তকারী/ধূলাবালি মিশ্রিত দমকা বাতাস)

---

৬৬ আল-কুরআন, সউদী আরব, পৃ. ২৪২১।

নামকরণ : সূরার নাম الذريت অর্থ বিক্ষিপ্ত, ধূলাবালি মিশ্রিত, দমকা বাতাস। সূরার প্রথম শব্দটি থেকেই এর নাম রাখা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: আখিরাত ও তাওহীদ।

৫২. তূর (তূর পাহাড়)

নামকরণ : সূরার প্রথম শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় : আখিরাত ও রসূল (স.)-এর বিরোধীদের অপপ্রচারের জবাব।

৫৩. নাজম (তারকা-নক্ষত্র)

নামকরণ : প্রথম আয়াত থেকে النجم - শব্দটিকেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় : কুরআন ও মুহাম্মাদ (স.)-সত্য। বিরোধীদের প্রতি সাবধান বাণী। অর্থাৎ মূল বিষয়বস্তু- রিসালাত।

৫৪. কামার (চাঁদ)

নামকরণ : সূরা القمر অর্থ, তারকা। প্রথম আয়াতের কামার শব্দটি নিয়ে এর নামকরণ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় : কিয়ামত ও আখিরাত।

৫৫. রহমান (পরম দয়াময় আল্লাহ)

নামকরণ: সূরা الرحمن অর্থ, দয়াময়-আল্লাহ তা'য়ালা। প্রথম শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।[৬৭]

আলোচ্য বিষয়: আল্লাহ তা'আলার কুদরতের পরিপূর্ণতা ও সীমাহীন দয়ার কথা এবং জিন ও মানুষের জবাবদিহিতা ও ভালো-মন্দ কাজের পরিণতির বর্ণনা।

৫৬. ওয়াকিয়াহ (অবশ্যম্ভাবী ঘটনা)

নামকরণ: সূরা الواقعة - ঘটনা। সূরার প্রথম আয়াতের এ শব্দটি দ্বারাই এর নামকরণ করা হয়েছে।[৬৮]

আলোচ্য বিষয় : পরকাল, তাওহীদ ও কুরআন মাজীদ সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের মনে যেসব সন্দেহ ও সংশয় ছিল, তার প্রতিবাদ করাই হলো এ সূরার বিষয়বস্তু।

৫৭. হাদীদ (লোহা)

নামকরণ: সূরা الحديد - অর্থ, লৌহ-অস্ত্র, লোহা। ২৫ নং আয়াতে উল্লিখিত এ শব্দটিকে সূরার নাম নির্ধরণ করা হয়েছে।[৬৯]

---

৬৭ তাবারী, ৩২৯২৮; বাযযার, ২২৬৯।

৬৮ তিরমিযী, ৩২৯৭।

৬৯ কুরতুবী, ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর।

আলোচ্য বিষয়: আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের প্রেরণা ও উপদেশ দান।

আলোচনা : আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও ক্ষমতাবান। তাঁর আলোকিত পথ অন্বেষণ করো কোন সন্দেহ সংশয় ও ভীরুতা ব্যতীত। বিনয় ও নম্রতার সাথে তাঁর অনুগত হও আর পৃথিবীতে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হইও না। (১-২৯)

৫৮. মুজাদালাহ্ (বিতর্ককারী নারী) তর্ক-বিতর্ক, বাদানুবাদ

নামকরণ: সূরার প্রথম আয়াতের تجادل - শব্দ থেকে এ নামটি চয়ন করা হয়েছে। مجادلة অর্থ বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ।

আলোচ্য বিষয় : "যিহার" নামক কু-প্রথার বিলোপ সাধন, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ, সভা-সমিতির ও মাহফিলের আদব-কায়দা এবং আল্লাহর দল ও শয়তানের দলের বৈশিষ্ট্য।

৫৯. হাশর (সমাবেশ-সমবেত)

নামকরণ: সূরার ২নং আয়াতের حشر - শব্দ থেকেই এর নাম চয়নকৃত। অর্থ লোকদেরকে একত্র করা বা একত্র করে ঘেরাও করা। বুখারী ও মুসলিম শরীফে সায়ীদ ইবনে জুবাইরের ভাষায় বলা হচ্ছে- আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট সূরা "হাশর" সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা বনূ নাযীর যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যেমন বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে সূরা "আনফাল"। অপর একটি বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সূরা হাশর না বলে বল- সূরা নাযীর। মুজাহিদ, কাতাদাহ, যুহরী, ইবনে যায়েদ, ইয়াযীদ, ইবনে রুমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ মনীষীগণও এরূপই বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য বিষয়: বনূ নাযীর-ইহুদী গোষ্ঠীর পতনের কারণ ও নসীহত। এককথায়, বনী নাযীর যুদ্ধের পর্যালোচনা।

৬০. মুমতাহিনা (তদন্তযোগ্য মহিলা)

নামকরণ : ممتحنة - অর্থ, যেসব মহিলাকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। মূলশব্দ امتحان - পরীক্ষা। ১০ নং আয়াতে উল্লিখিত এ শব্দটিকেই সূরার নাম রাখা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় : হাতিব ইবনে আবু বালতায়া (রা.) এর মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে চিঠি প্রেরণ। হিজরত পরবর্তী মাক্কায় অবস্থানরত ও মদীনায় হিজরতকারী স্বামী-স্ত্রীদের বিবাহ বন্ধন ও মাহর এবং মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণ প্রসঙ্গ।

৬১. ছফ (সারিবদ্ধ/কাতার)

নামকরণ : সূরা الصف - অর্থ, সারিবদ্ধ- কাতার। ৪ নং আয়াতের صفا হতে এর নাম গৃহীত।

আলোচ্য বিষয় : ঈমান ও ইখলাসের সাথে আল্লাহর পথে জান-মাল ব্যয় করে সংগ্রাম করার প্রেরণা দান।

৬২. জুমুআহ (সম্মিলিত হওয়া)

নামকরণ : الجمعة অর্থ- সম্মিলিত হওয়া, একত্রিত হওয়া। বিশেষত জুমুআহ-র দিবসে মাসজিদে সমবেত হয়ে খুতবা শ্রবণ ও দু'রাকাআত সালাত আদায় করা ফরয করা হয়েছে। ৯ নং আয়াতের الجمعة শব্দ থেকেই এই নামটি চয়নকৃত।

আলোচ্য বিষয় : ইহুদী চক্রান্ত ও মুমিনদেরকে জুমুআবারের আচরণ বা করণীয়।

৬৩. মুনাফিকূন (কপটরা)

নামকরণ: সূরা المنفقون - অর্থ, কপট বিশ্বাসী, মুনাফিকগণ। এই শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ৪ বার উল্লিখিত হয়েছে শব্দটি এই সূরায়।

আলোচ্য বিষয় : প্রথম রুকুতে মদীনার মুনাফিকদের আচরণ ও কর্মনীতির সমালোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে আর দ্বিতীয় রুকুতে ঈমানদার লোকদেরকে মাল-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬৪. তাগাবুন (জয়-পরাজয়)

নামকরণ: সূরার ৯ নং আয়েতর التغابن - শব্দটিকেই এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় : ঈমান ও আনুগত্য গ্রহণের আহবান ও উন্নত নৈতিক চরিত্র শিক্ষাদান।

৬৫. তালাক (তালাক)

এই সূরার নাম ও বিষয়বস্তু الطلاق - অর্থ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। প্রথম আয়াতে দুবার শব্দটি এসেছে।

আলোচ্য বিষয়: তালাক এর বিধি-বিধান।

৬৬. তাহরীম (নিষিদ্ধকরণ)

নামকরণ : এ সূরার নাম প্রথম আয়াতের تحرم শব্দ হতে চয়নকৃত। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যাতে تحريم বা নিষিদ্ধকরণ-অবৈধকরণ সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ আছে।

আলোচ্য বিষয় : রাসূল (স.) এর বিবিদেরসহ উম্মতে মুহাম্মাদীকে বিশেষ উপদেশ প্রদান।

৬৭. মুলক (আধিপত্য রাজত্ব)

নামকরণ : সূরার প্রথম আয়াতে الملك শব্দটিকেই সূরার নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থ- আধিপত্য, রাজত্ব।

আলোচ্য বিষয় : আল্লাহ তা'আলাই সর্বভৌমত্বের মালিক এবং সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। তাওহীদ, আখিরাত ও রিসালাতের ব্যাপারে বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ।

৬৮. কলম (কলম/নূন)

নামকরণ : এই সূরার দুটি নাম, নূন ও আলকলম। এ দুটি শব্দই সূরার শুরুতে রয়েছে। ن একটি হরফ বা বর্ণ এবং القلم অর্থ কলম, লেখনী।

আলোচ্য বিষয় : রিসালাত।

৬৯. হাক্কাহ (অনিবার্য সংঘটিতব্য, সুনিশ্চিত বিষয়)

নামকরণ : সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। الحاقة অর্থ যা সুনিশ্চিত সংঘটিত হবে বা অনিবার্য-সংঘটিতব্য। ৩ বার শব্দটি এসেছে।

আলোচ্য বিষয়: আখিরাত, কুরআন মাজীদ আল্লাহরই বাণী এবং মুহাম্মদ (স.) তাঁরই রসূল।

৭০. মাআ'রিজ (সিঁড়িওয়ালা, অসীম মর্যাদার অধিকারী সত্তা)

নামকরণ : المعارج - অর্থ, সিঁড়ি বা সোপান অথবা যে জিনিসের সাহায্যে উপরে আরোহণ করা যায়। তৃতীয় আয়াতে উল্লিখিত এ শব্দটিকেই নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় : আখিরাত ও কিয়ামতের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জের জবাব।

৭১. নূহ (নূহ (আ)

নামকরণ : এই সূরার নাম نوح অর্থ, হযরত নূহ (আ.) ৩ বার নামটি অত্র সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: রিসালাত। হযরত নূহ (আ.) এর কাহিনীই বিবৃত হয়েছে।

৭২. জিন (আল-জিন)

নামকরণ : ১, ৫, ৬ নং আয়াতে উল্লিখিত الجن - শব্দকেই এ সূরার নাম গ্রহণ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: জিনদের কুরআন শুনে ঈমান গ্রহণ ও নিজ জাতির সামনে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করার ঘটনা এই সূরায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৭৩. মুয্যাম্মিল (কম্বলাবৃত/কাপড় আবৃত ব্যক্তি)

নামকরণ: সূরার প্রথমে المزمل - শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অর্থ-কম্বলাবৃত, কাপড় আবৃত ব্যক্তি। এখানে রাসূল (স.)-কে সম্বোধন করেই এ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: রিসালাত।

৭৪. মুদ্দাসসির (লেপ মুড়ানো ব্যক্তি)

নামকরণ: المدثر - অর্থ, কম্বল জড়িয়ে শয়নকারী, লেপ মুড়ানো ব্যক্তি। প্রথম আয়াতের এ শব্দটিকেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: নবুওয়াতের প্রাথমিক দায়িত্ব-কর্তব্য এবং নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার পরিণাম।

৭৫. কিয়ামাহ (কিয়ামত, পুনঃউত্থান)

নামকরণঃ القيمة - অর্থ, পুনরুত্থান। সূরার প্রথম আয়াতের শব্দটিকেই নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। [৭০]

আলোচ্য বিয়ষ: এই সূরায় কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

---

৭০ ইবনে কাসীর।

৭৬. দাহর (মানুষ/সময়)

নামকরণঃ الانسان - অর্থ, যে জীব-প্রাণীর মধ্যে প্রেম ভালোবাসা আছে অর্থাৎ মানুষ। الدهر অর্থ সময়, কাল, এই দুটি নামেই সূরার প্রথম আয়াত হতে গৃহীত। [৭১]

আলোচ্য বিষয়ঃ আখিরাত ও রিসালাত।

৭৭. মুরসালাত (প্রেরিতগণ)

নামকরণঃ المرسلت অর্থ, প্রবাহিত-বাতাস। সূরার প্রথমে উদ্ধৃত শব্দকেই নাম হিসেবে চয়ন করা হয়েছে।[৭২]

আলোচ্য বিষয়ঃ কিয়ামত ও আখিরাতের প্রমাণ।

৭৮. নাবা (বড় সংবাদ)

নামকরণঃ النبإ অর্থ বড় সংবাদ। সূরার দ্বিতীয় আয়াত থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।[৭৩]

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবন-আখিরাত ও কিয়ামত বা মহাপ্রলয়-এর আলোচ্য বিষয়। মহাপ্রলয়-কিয়ামত দিবসকে যারা অস্বীকার করে তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যারা ঈমানদার ও মুত্তাকী হবে তাদের শুভ পরিণতির ঘোষণাও রয়েছে এ সূরায়।

৭৯. নাযিয়াত (যারা টানে/আকর্ষণকারী)

নামকরণঃ সূরার প্রথম শব্দ النازعات হতে নামকরণ করা হয়েছে।[৭৪] 'কসম (সেই ফেরেশতাদের) যারা নির্দয়ভাবে (পাপীদের) প্রাণ টেনে বের করে আনে এবং সহজভাবে (মুমিনদের রূহ) খুলে দেয়।'

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য : আখিরাত। মৃত্যু ও কিয়ামতের পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রমাণ এবং আল্লাহ ও রসূল (স)-কে অস্বীকার-অমান্য করার কুফল এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। সত্যের জয় এবং অসত্যের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত মূসা (আ.) এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। জাগতিক সকল শক্তি থাকা সত্ত্বেও ফিরাউনকে আল্লাহ তা'আলা পরাজিত করেছেন, পক্ষান্তরে মূসা (আ.) এর জাগতিক কোন শক্তি-সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাকে বিজয়ী করেছেন। [৭৫]

৮০. আবাসা (মুখ বেজার করল)

নামকরণঃ সূরার প্রথম শব্দ عبس কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ঘোষণা হচ্ছে :[৭৬]

---

৭১ বুখারী, ৮৮০; মুসলিম, ৮৭৯।
৭২ বুখারী, ৩৩১৭; মুসলিম, ২২৩৪।
৭৩ ইবনে কাসীর।
৭৪ কুরতুবী।
৭৫ তিরমিযী, ৩৩৮০, ৩৩৩১; মুয়াত্তা মালেক, ১/২০৩; জালালাইন।
৭৬ নাসায়ী; আস-সুনানুল কুবরা ১১৫৯০; ইবনে মাজাহ; ২২২৩।

আলোচ্য বিষয়: রিসালাত ও আখিরাত।

৮১. তাকভীর (গুটানো)

নামকরণ: প্রথম আয়াতে উল্লিখিত كورت শব্দটির উৎসমূলক تكوير কে সূরাটির নামরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। كورت অর্থ গুটিয়ে ফেলা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য : কিয়ামত (মহাপ্রলয়), রিসালাত এবং বিচার দিবসের ভয়াবহ দৃশ্যের বিবরণ।

৮২. ইনফিতার (চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া/ফেটে যাওয়া)

নামকরণ: প্রথম আয়াতের انفطر - শব্দ হতে এর নাম গৃহীত। অর্থ-দীর্ণ হওয়া, ফেটে যাওয়া, চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া। এ সূরাকে ইনফারাত বা মুনফারাতও বলা হয়।

আলোচ্য বিষয় : আখিরাতই এ সূরার মূল বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়।

৮৩. মুতাফফিফীন (হীন ঠকবাজী)

নামকরণ: প্রথম আয়াতের المطففين - শব্দটিকে নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।[৭৭]

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য : অসৎ ও দুর্নীতিবাজদের কথা আলোচনা করা হয়েছে এ সূরায়। অবশ্যই একদিন মানুষকে আল্লাহর বিচারালয়ে হাজির হতে হবে এমন এক বিচারালয় সেখান থেকে নির্ভুল বিচার ফয়সালা করা হয়। এবং এই রায়ের বিপক্ষে কোন আপিল করা যায় না। এই বিশ্বাস যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়-মনে দৃঢ়মূল না হবে, ততক্ষণ কোন লোকের সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তখনকার সময়ে সমাজের অসংখ্য দোষ-ত্রুটির মাঝে ওজন ও পরিমাপে কম দেয়া ছিল অত্যন্ত মন্দ একটি দোষ। আখিরাত সম্পর্কে উদাসীনতাই এর মূল করণ।

৮৪. ইনশিকাক (ফেটে যাওয়া, বিদীর্ণ হওয়া)

নামকরণ : প্রথম আয়াতের انشقت শব্দ হতে সূরাটির নাম গৃহীত। এর মূল অর্থ দীর্ণ হওয়া। ঘোষণা হচ্ছে ঃ (১-২)

আলোচ্য বিষয়ঃ কিয়ামত ও আখিরাতই এ সূরার আলোচ্য বিষয়।

৮৫. বুরূজ (সুদৃঢ়, দুর্গ)

নামকরণ ঃ প্রথম আয়াতের উল্লিখিত البروج - শব্দকে এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। বড় প্রাসাদ ও দুর্গ।[৭৮] ঘোষণা হচ্ছে (১-২)।

আলোচ্য বিষয়: তাওহীদ ও আল্লাহর দীনকে অস্বীকার ও ঈমানদারদের উপর অবিশ্বাসীদের যুলুম ও নির্যাতনের করুণ পরিণাম এবং মু'মিনদের সান্ত্বনা দান।

৮৬. তারিক (রাতে আত্মপ্রকাশকারী/নক্ষত্রকুঞ্জ)

---

৭৭ ইবনে কাসীর।

৭৮ কুরআনুল কারীম, সউদী আরব, পৃ. ২৮০০।

নামকরণঃ প্রথম আয়াতের الطارق শব্দকেই এ সূরার নাম গণ্য করা হয়েছে।[৭৯]

আলোচ্য বিষয়ঃ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত।

মূল বক্তব্যঃ মানুষ মৃত্যুর পর আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে অবশ্যই বাধ্য হবে। কুরআন এক চিরন্তন বাণী, অবিশ্বাসীদের কোন কৌশল, কোন ষড়যন্ত্রই এর বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়।

৮৭. আ'লা (উচ্চতম, মহান শ্রেষ্ঠ)

নামকরণঃ প্রথম আয়াতের الاعلى শব্দকে নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সূরার আরেকটি নাম সূরাতু সাব্বাহা।[৮০]

আলোচ্য বিষয় : তাওহীদ, আখিরাত ও রাসূল (স.) কে বিশেষ উপদেশ নির্দেশ।

৮৮. গাশিয়া (আচ্ছন্নকারী, কঠিন বিপদ)

নামকরণঃ প্রথম আয়াতে الغاشية শব্দকে এই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।[৮১]

আলোচ্য বিষয়ঃ আখিরাত ও তাওহীদ।

৮৯. ফাজর (প্রাতঃকাল, ফজরের সময়)

নামকরণঃ সূরার প্রথম শব্দটি والفجر কেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[৮২]

আলোচ্য বিষয়ঃ আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের সত্যতা প্রমাণ করা।

মূল বক্তব্যঃ পৃথিবীতে যে কেউ অন্যায়-অনাচার, যুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত হবে, যে কোন সময় তাদের প্রতি আযাব আসতে পারে, কেননা আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের পরিণতি শুভ।

৯০. বালাদ (শহর, নগর)

নামকরণ : সূরার প্রথম আয়াত البلد - শব্দটিকে এর নাম নির্ধারণ করা হয়েছে।[৮৩]

আলোচ্য বিষয়ঃ দুনিয়ায় মানুষের স্থান ও মর্যাদা এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক অবস্থান কী তা বুঝানোই এই সূরার বিষয়বস্তু।

৯১. শামস (সূর্য)

নামকরণঃ সূরার প্রথমে উল্লিখিত الشمس - শব্দটিকেই নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[৮৪]

---

৭৯ ইবন কাসীর।
৮০ বুখারী, ৪৯৪১।
৮১ ইবন কাসীর।
৮২ সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ১১৬৭৩।
৮৩ ইবন কাসীর।
৮৪ বুখারী, ৭০৫; মুসলিম, ৪৬৫।

আলোচ্য বিষয়: সৎ-অসৎ, পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য বুঝানো এবং যারা এ পার্থক্য বুঝে না, অসৎ পথে চলে তাদের পরিণাম।

৯২. লাইল (রাত/রজনী)

নামকরণ : সূরার প্রথম শব্দটি والليل - কেই এর নাম রাখা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: আখিরাত। ভালো ও মন্দ পথের পার্থক্য এবং এর পরিণামফলের পার্থক্য।

৯৩. দুহা (দ্বিপ্রহর, উজ্জ্বল দিন)

নামকরণ: الضحى - সূরার প্রথম শব্দকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[৮৫]

আলোচ্য বিষয়: রিসালাত। রাসূল (স.) কে সান্ত্বনা দান ও ওহী বন্ধ থাকার দরুন তিনি যে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন তা দূর করা।

৯৪. ইনশিরাহ (উন্মুক্তকরণ)

নামকরণ: সূরার প্রথমে উল্লিখিত الم نشرح শব্দটিকেই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[৮৬]

আলোচ্য বিষয় : নবী করীম (স.) কে সান্ত্বনা দান।

৯৫. তীন (ডুমুর, ফল বিশেষ)

নামকরণ: প্রথম শব্দ التين - কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[৮৭]

আলোচ্য বিষয় : আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তি অপরিহার্য এবং যুক্তিসঙ্গত।

৯৬. আলাক (ঝুলন্ত জমাট রক্তপিণ্ড)

নামকরণঃ দ্বিতীয় আয়াতের العلق- শব্দকেই এর নাম গণ্য করা হয়েছে।[৮৮]

মূল বক্তব্য : এ সূরায় পবিত্র কুরআন মাজীদ পাঠ করার পাঠ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মূর্খতার অন্ধকার দূরীভূত করে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে আলোচ্য সূরায়।

৯৭. কদর (মর্যাদাপূর্ণ, মহিমান্বিত, ভাগ্য)

নামকরণ: প্রথম আয়াতের القدر শব্দটিকেই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[৮৯]

আলোচ্য বিষয় : কুরআনের মর্যাদা, মূল্য ও গুরুত্বই এ সূরার আলোচ্য বিষয়।

৯৮. বাইয়্যেনাহ (উজ্জ্বল, অকাট্য দলিল, প্রকাশ্য প্রমাণ)

নামকরণ: প্রথম আয়াতের البينه শব্দটিকেই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[৯০]

---

৮৫ মুসলিম, ১৭৯৭।
৮৬ তিরমিযী, ৩৩৭৬।
৮৭ বুখারী, ৭৬৭।
৮৮ আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, ১/৯৩।
৮৯ ইমাম নববী, শারহু সহীহ মুসলিম, ৮/৫৭।
৯০ বুখারী, ৩৮০৮।

আলোচ্য বিষয় : মূল বিষয় রিসালাত। আল্লাহর কিতাবকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য রাসূলের প্রয়োজনীয়তা এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আলাক ও সূরা কদরের পর এ সূরার অবস্থান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সূরা আলাকের মাধ্যমে প্রথম ওহী নাযিল হয়। সূরা কদরে বলা হয়েছে যে, ওহী কোন্ সময় নাযিল হয়েছে। আর এ সূরায় বলা হয়েছে, ওহী নাযিলের জন্য রাসূল পাঠানো কেন জরুরী।

৯৯. যিলযাল (ভূকম্পন, কাঁপা)

নামকরণ : প্রথম আয়াতের শব্দ زلزالها হতে এ সূরার নাম গৃহীত।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য : মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়া এবং ভালো ও মন্দ ছোট-ছোট সব আমলই মানুষের সামনে হাজির করা হবে।

১০০. আদিয়াত (দ্রুতগামী, দ্রুত ধাবমান)

নামকরণ : সূরার প্রথমে উল্লিখিত العديات - শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: আখিরাত।

১০১. কারিয়াহ (ভয়াবহ দুর্ঘটনা/আঘাতকারী)

নামকরণ : সূরায় প্রথম শব্দ القارعة -দ্বারা এই সূরার নাম রাখা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: কিয়ামত-মহাপ্রলয় ও আখিরাত।

১০২. তাকাসুর (প্রবৃদ্ধির জন্য প্রতিযোগিতা, আকাঙ্ক্ষা)

নামকরণ : সূরার প্রথম আয়াতের التكاثر শব্দটিকেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[৯১]

আলোচ্য বিষয়: দুনিয়া পাওয়ার ধান্দার পরিণাম।

১০৩. আসর (সময়/কাল, যুগ-যুগান্তর)

নামকরণ: সূরার প্রথম শব্দ العصر - কেই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[৯২]

আলোচ্য বিষয়: মানব জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা।

১০৪. হুমাযাহ (ঘৃণা, অপমান ও গালমন্দকারী)

নামকরণ: সূরার প্রথম আয়াতে همزة - শব্দটিকেই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[৯৩]

আলোচ্য বিষয়: আখিরাত। সে সময়কার আরব সমাজের ধনী লোকদের বড় বড় কতক চারিত্রিক দোষ এবং আখিরাতে এর ভয়ানক পরিণাম।

১০৫. ফীল (হাতি)

নামকরণ: সূরার প্রথম আয়াতের الفيل শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।[৯৪]

---

৯১ ইবন কাসীর।

৯২ মুয়াস্সার, বাদায়িউত তাফসীর।

৯৩ মুসনাদে আহমাদ, ৪/২২৭।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য : একটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে এ সূরা নাযিল হয়। রাসূল (স.) এর শুভাগমনের পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন দিন পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। ৫৭০ মতান্তরে ৫৭১ সালে ইয়েমেনের বাদশা আবরাহা ৬০ হাজার সৈন্য ও ১৩টি হাতি (কোন কোন বর্ণনা মতে ৯টি হাতি) নিয়ে পবিত্র কা'বা শরীফ ভেঙ্গে ফেলার অসৎ উদ্দেশ্যে মাক্কার অদূরে অবস্থান নেয়। আল্লাহ তা'আলা আবরাহা ও তার বিশাল বাহিনীকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেন এবং কা'বা শরীফ হিফাযত করেন। আরবদের নিকট এটা ছিল অবিস্মরণীয় ঘটনা। আরবের কোন ব্যক্তিই এ সম্পর্কে অজানা ছিল না। তাদের ঐ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আবরাহার আক্রমণ হতে কা'বা ঘরের হিফাযতের এ কাজটি কোন দেব-দেবী করেনি। বরং এটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অবদান ও ক্ষমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারা এতবেশি প্রভাবিত হয়েছিল যে, এই সময় কয়েক বছর তারা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করেনি।

১০৬. কুরাইশ (কুরাইশ জাতি)

নামকরণ: সূরায় প্রথম আয়াতের قريش শব্দটিকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[৯৫]

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য : কুরাইশদের ভাগ্য উন্নয়ন হয়েছে কা'বা শরীফ বায়তুল্লাহর মাধ্যমে। শীত, গ্রীষ্ম নির্বিশেষে সারা বছর সর্বত্র ব্যাপক পরিচিতি ও বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে তারা ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে যে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে এর বাহাদুরি তাদের নয়। বরং এটি কা'বার বরকতে হয়েছে। অতএব, এ ঘরের যিনি মালিক- তাঁরই বন্দেগী তাদের করা উচিত। ক্ষুধাকালীন খাদ্য সরবরাহ, ভয়ে নিরাপত্তাদান এবং নেতৃত্বের মর্যাদা প্রদান করার ক্ষমতা যিনি সংরক্ষণ করেন তিনিই আবার সব কেড়ে নিতে পারেন। তাই নেতৃত্বের অহংকারবশত রাসূল (স.) এর দাওয়াত গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করো না।

১০৭. মাঊন (যাকাত, দান-খয়রাত, সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস)

নামকরণ: সূরার শেষ আয়াতের শেষ শব্দ الماعون কে এর নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। ঘোষণা হচ্ছে :[৯৬]

আলোচ্য বিষয়: বিচার দিবস বা আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে মানুষের চরিত্র কী ধরণের হয়, সে বিষয়ে এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।

১০৮. কাওসার (অশেষ কল্যাণ, অফুরন্ত নিয়ামত, জান্নাতের একটি নহর)

নামকরণ: সূরার প্রথম বাক্যের الكوثر - শব্দটিকে এর নাম রাখা হয়েছে।[৯৭]

---

৯৪ বাইহাকী, দালায়েলুন নাবুওয়াহ, ১/৫২; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর।

৯৫ কুরতুবী।

৯৬ আবু দাউদ, ১৬৫৭।

৯৭ ইবন কাসীর, মুসলিম, ৪০০; মুসনাদে আহমাদ, ৩/১০২।

আলোচ্য বিষয়: রাসূল (স.)-এর প্রতি আল্লাহর সীমাহীন নিয়ামত ও বিরোধীদের প্রতি অভিশাপের ঘোষণা।

১০৯. কাফিরূন (অবিশ্বাসীগণ)

নামকরণ: প্রথম আয়াতের الكفرون - শব্দটিকেই এর নাম নির্ধারণ করা হয়েছে।[৯৮]

আলোচ্য বিষয়: কুফরী ও শিরকের ব্যাপারে আপোষহীন ঘোষণা।

মূল বক্তব্য : ঈমান ও শিরক সম্পূর্ণ বিপরীত। এ দুয়ের মাঝে কোন সমঝোতা হতে পারে না। কুফরী ধর্ম-আদর্শ ও ইসলাম সম্পূর্ণভাবে পরস্পর বিপরীত। অবিশ্বাসীদের সমঝোতা প্রস্তাবের জবাবে সুস্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে তোমাদের রীতি-নীতি, আদর্শ-ধর্ম, জীবন ব্যবস্থা আর ইসলামের রীতি-নীতি আদর্শ-জীবন ব্যবস্থা কখনো এক হতে পারে না। অতএব, তোমাদের দীন তোমাদের জন্য আর আমার দীন আমার জন্য।

১১০. নাসর (সাহায্য)

নামকরণ: প্রথম আয়াতের نصر শব্দটিকে এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[৯৯]

আলোচ্য বিষয়: ইসলামের বিজয় উৎসবের পদ্ধতি।

১১১. লাহাব লেলিহান আগুন, অগ্নিশিখা)

নামকরণ: সূরার প্রথম আয়াতের لهب - শব্দটিকেই এ সূরার নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[১০০]

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য : আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর ঘৃণ্য আচরণ ও উভয়ের পরিণতি এ সূরার আলোচ্য বিষয়। আবু লাহাব নবী করীম (স.) ও দীন ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বদা অত্যন্ত নীচ ও হীন কাজে লিপ্ত থাকত। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের বিপক্ষে কঠোর থাকত। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের বিপক্ষে কঠোর অবস্থান, চরম শত্রুতা এমনকি পাথর নিক্ষেপের মতো আচরণ জাহেলী রীতি-নীতিরও বিরোধী। রাসূল (স)-কে কষ্ট দেয়ার পরিণতি যে ধ্বংস তা আবু লাহাবের নাম উল্লেখ করে এ সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে।

১১২. ইখলাস (বিশুদ্ধতা)

নামকরণ: الاخلاص - শব্দটি এ সূরার অন্তর্ভুক্ত নয়। বিষয়বস্তুর আলোকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।[১০১]

আলোচ্য বিষয়: তাওহীদ- আল্লাহর একত্ববাদ।

১১৩. ফালাক (ঊষা, সকাল, বিদীর্ণ হওয়া)

---

৯৮ মুসলিম, ১২১৮।
৯৯ মুস্তাদরাকে হাকিম, ২/২৫৭।
১০০ বুখারী, ৪৯৭১।
১০১ মুসনাদে আহমাদ, ৩/১৪১, ১৫০।

নামকরণ: সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত الفلق শব্দকেই সূরার নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। ঘোষণা হচ্ছে : (১-২)[১০২]

১১৪. নাস (মানুষ/মানব জাতি)

নামকরণ: সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত الناس শব্দটি অত্র সূরায় মোট ৫ বার এসেছে এবং এ শব্দটি সূরার নাম হিসেবে চয়নকৃত।[১০৩]

সূরা ফালাক ও নাস-এর পারস্পরিক সম্পর্ক বেশ গভীর। এর নাযিলের সময়কাল, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও মূল বক্তব্য এতই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে এদের একটি যুক্ত নাম রয়েছে। সে নাম হচ্ছে 'মুআওবিযাতাইন' আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার দুটি সূরা।

সূরা ফাতিহার সাথে এ দুই সূরার মিল : কুরআনুল কারীম-এর সূচনায় রয়েছে সূরা ফাতিহা আর শেষ হয়েছে সূরা ফালাক ও নাস দ্বারা। সূরা ফাতিহায় রাহমান রাহীম ও বিচার দিনের মালিকের হামদ-প্রশংসা করে তাঁরই নিকট সত্য-সঠিক পথের সন্ধান ও এ পথে চলার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। এ আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা পুরো কুরআন মাজীদ-বান্দাকে প্রদান করেছেন। আর সেই কুরআন মাজীদ শেষ করা হচ্ছে প্রার্থনার মাধ্যমে। বান্দা বলছে, হে আমাদের মালিক! আমরা তোমার সৃষ্টি প্রতিটি বস্তুর অনিষ্ট থেকে তোমারই কাছে আশ্রয় চাই। বিশেষ করে, জিন ও মানুষ শয়তানের ওয়াসওয়াসা-ধোঁকা-প্রতারণা হতে। কেননা এরাই 'সিরাতুল মুস্তাকিমের' পথে চলার বড় বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অতএব, এটা সুস্পষ্ট হলো যে, কুরআনের সূচনা ও উপসংহারের মাঝে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক।

কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু তত্ত্ব ও তথ্য

- কুরআনের মোট সূরা- ১১৪টি।
- মোট আয়াত ৬,২৩৬ [১১৪টি সূরার আয়াতসমূহের যোগফল]
- ৯ নং সূরা আত তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ নেই।
- ১১৩টি সূরার শুরুতে উল্লিখিত "তাসমিয়া বা বিসমিল্লাহ" আয়াত হিসেবে গণনা করলে যোগফল হয় ৬,৩৪৯)।
- মাক্কী সূরা ৮৬টি, মাদানী সূরা ২৮টি।
- সবচেয়ে ছোট সূরা কাওসার, সবচেয়ে বড় সূরা বাকারাহ।
- বড় আয়াত : বাকারাহ-২৮২, ছোট আয়াত : মুদ্দাসসির-২১।
- كن فيكون - কুরআনে মোট ৯ বার এসেছে।
- মোট পারা- ৩০, মানজিল- ৭টি।

---

১০২ মুসলিম, ৮১৪; মুস্তাদরাকে হাকিম,২/৫৪০।

১০৩ আবু দাউদ, ৫০৬৭; তিরমিযী ৩৩৯২; মুসনাদে আহমাদ, ১/৯।

- মক্কায় কুরআন নাযিলের সময়কাল ১২ বছর ৫ মাস ২১ দিন। মদীনায় ১০ বছর ৬ মাস ৯ দিন। মোট নাযিলের সময় পুরো ২৩ বছর।
- সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ নেই, সূরা নাহলে ২ বার বিসমিল্লাহ আছে।
- ৬ জন নবীর নামে ৬টি সূরা সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- ১. ইউনুস, ২. হূদ, ৩. ইউসুফ, ৪. ইবরাহীম, ৫. মুহাম্মাদ, ৬ নূহ।
- আল-কুরআনুল কারীমে ২,৭০১ বার আল্লাহ এবং ৮০ বার ইলাহ শব্দটি এসেছে।
- আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহুম্মা ৫ বার এসেছে : সূরা আলে ইমরান-২৬, মায়িদা-১১৪, আনফাল-৩২, ইউনুস-১০ ও যুমার- ৪৬।
- কুরআনে সর্বাধিক বর্ণিত নবী হচ্ছেন হযরত মূসা (আ.), ১৩৬ বার।
- প্রতিটি আয়াতে 'আল্লাহ' শব্দটি উল্লেখ রয়েছে সূরা মুজাদালায়।
- হাদীসের বর্ণনা মতে, যে ঘরে কুরআনের ২য় সূরা আল বাকারাহ পাঠ করা হয় সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না।
- কুরআনের চারটি স্থানে ক্বলম শব্দটি উল্লেখ আছে ১। ৬৮ : ১, ২। ৯৬ : ৪, ৩। ৩১ : ২৭, ৪। ৩ : ৪৪।
- সাহাবী হযরত যায়েদ (রা.) এর নাম উল্লেখ আছে ৩৩ তম সূরা আল আহযাবের ৩৭ নং আয়াতে।
- ১০৮ তম সূরা আল কাউসারে কোন মীম অক্ষর নাই, সূরা কাফিরুনে ৯টি মীম আছে।
- আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত মিশরের কথা বলা হয়েছে ৩ বার: (ক) ১২তম সূরা ইউসুফে ৯৯নং আয়াতে, (খ) ৪৩ তম সূরা আয যুখরুফের ৫১ নং আয়াতে, (গ) ১০ ম সূরা ইউনুসের ৮৭ নং আয়াতে।
- প্রখ্যাত সাহাবী উসাইন বিন হুদাইর (রা) এর কণ্ঠস্বর শুনতে ফেরেশতা তার নিকট আগমন করত।
- ৯৯তম সূরা যিলযালকে কুরআনের অর্ধেক, ১০৯তম সূরা কাফিরূনকে কুরআনের এক চতুর্থাংশ, ১১২তম সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। ৩৬ তম সূরা ইয়াসীনকে কুরআনের ক্বলব ও ৫৫তম সূরা আর রাহমানকে কুরআনের তাজ বলা হয়। ৯ম সূরা তাওবার ১০৮ নং আয়াতে যে মসজিদের ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো মসজিদে কুবা। যা হিজরতের পর সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।
- প্রখ্যাত সাহাবী সুহাইব ইবনে সিনান আর রুমী সম্পর্কে ২য় সূরা আল বাকারাহ ২০৭ নং আয়াত নাযিল হয়েছে।

- ৭০তম সূরা আল মাআরিজের ১ম আয়াতে বর্ণিত প্রশ্নকারী হলো আন নদর বিন আল হারিছ।
- ১৭তম সূরা বনী ইসরাঈলের ৬০ নং আয়াতে বর্ণিত অভিশপ্ত বৃক্ষটি হলো যাক্কুম বৃক্ষ।
- ১৬তম সূরা আন নাহলকে নিয়ামতের সূরা বলা হয়। যেহেতু সূরায় বেশি বেশি নিয়ামতের কথা উল্লেখ আছে।
- ২য় সূরা বাকারার ২৫৮ নং আয়াতে বর্ণিত হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সাথে বাকবিতণ্ডাকারী হলো 'নমরুদ বিন কিনআন।'
- ২য় সূরা বাকারার ২৫৯ নং আয়াতে জনমানবহীন যে গ্রামের কথা বলা হয়েছে তা হলো বর্তমান 'বায়তুল মুকাদ্দাস।' বখতে নছর তাতে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে সেখানকার অধিবাসীদেরকে হত্যা করার পরের অবস্থা বুঝাতে এভাবে বলা হয়েছে।
- ১৫তম সূরা আল হিজরের ৯৪ নং আয়াতে রসূলুল্লাহ (স.) কে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ বর্ণিত আছে।
- ২৮তম সূরা আল ক্বাসাসের ৫৬ নং আয়াতে রাসূলের (স.) চাচা আবু তালিব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।
- ৫৮তম সূরা আল মুজাদালায় বর্ণিত মহিলার নাম খাওলা বিনতে সালাবা ও তার স্বামী আউস বিন আছ-ছামিত।
- কুরআনে দুনিয়া ও আখিরাত শব্দ দুটি ১১৫ বার করে উল্লেখ আছে।
- ওয়ালীদ বিন মুগীরা কুরআনের প্রশংসা করেছে আবার অস্বীকারও করেছে।
- কুরআন সংকলনকারী মহিলা সাহাবী হলেন ওয়ারাকা বিনতে আব্দুল্লাহ বিন হারিছ। তিনি ওমর বিন খাত্তাবের (রা.) শাসনামলে নিজের দুজন কৃতদাস কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। তিনি ওয়াদা করেছিলেন যে কৃতদাসদ্বয়কে তাঁর মৃত্যুর পরে আযাদ করে দেয়া হবে, তাই তারা তাঁকে তারাতাড়ি করে হত্যা করে ফেলে।
- 'আল ফজর' শব্দটি দ্বারা ৮৯তম সূরা আল ফজর শুরু এবং ৯৭তম সূরা আল ক্বদর শেষ হয়েছে। ৯ম সূরা তাওবার ১২৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (স.)-এর গুণ বর্ণনা করতে আল্লাহর দুটো সিফাতী নাম 'রউফুন' ও 'রাহীমুন' শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন।
- ১৬তম সূরা আন নাহলের ৯০ নং আয়াতে ইসলামী শরীয়তের আদেশ-নিষেধ সংক্ষিপ্তকারে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।
- কুরআনের ৫৩তম সূরা আন-নাজমে প্রথম সিজদার আয়াত অবতীর্ণ হয়। কুরআনের আশাব্যঞ্জক আয়াত হলো, ৩৯তম সূরা আয যুমারের ৫৩ নম্বর আয়াত।

➲ ৩য় সূরা আলে ইমরানের ১৫৪ নং আয়াত ও ৪৮তম সূরা আল ফাতাহ এর ২৯ নং আয়াতের এই দুটো আয়াতের মধ্যে নুকতাযুক্ত আরবী সমস্ত অক্ষরগুলো এসেছে।

আল কুরআন ও বর্তমান বিশ্ব

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানব রচিত সকল সামাজিক গ্রন্থে মানুষের উৎকলিত, উৎকর্ষিত ও অতি সাফল্যময় কর্মকাণ্ড নিয়ে সাধারণত আলোচনা করা হয়। কিন্তু কুরআন মাজীদে মানব সৃষ্টির পরিকল্পনা থেকে শুরু করে আলমে আরজ মাতৃগর্ভে সন্তানের বিভিন্ন আকৃতি, পৃথিবীতে আগমন ও বেড়ে উঠা, বিভিন্ন মতাবলম্বী হওয়া, পার্থিব জীবনকে সাজিয়ে তোলা এ জীবনের সমাপ্তি, মৃত্যু, কবরের জীবন, শেষ বিচারের জন্য পুনরুত্থান, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ও এরপর আল্লাহ তা'আলার দিদার লাভ ইত্যাদি বিষয়গুলো সুবিন্যস্তভাবে কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে। এছাড়াও মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি যুগ পরিক্রমায় তার প্রয়োজন হলে কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, আবিষ্কৃত হবে. সকল কিছুর বর্ণনা কুরআনে বিদ্যমান। তাই আল কুরআন জীবন্ত মুজিযা।

মন চাই জিন্দেগীর কুহেলিকার পিছনে ছুটতে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে তারা আজ দিশেহারা। এসকল কিছু থেকে মুক্তির একমাত্র বিধান মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এ মহাসত্য কথাটি বিশ্ববাসী যত তাড়াতাড়ি অনুভব করবে ততই মঙ্গল। আর এটিই বর্তমান সময়ের দাবী।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬১ বর্ষ ১ম- ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.

ইসলামী ঐতিহ্য প্রচার-প্রসারে বঙ্গবন্ধুর অবদান

আবুল কালাম মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ*

[**Abstract**: Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is a living ideal of the Bengali nation. There was a great gathering of multifaceted talents, wisdom-dignity and sweetness of character in this highly respected leader. On the one hand, as he was a flag bearer of secularism, On the other hand, he had immense devotion, respect and sincerity towards his religion Islam. He is proof of that. He left every step. He was not a proponent of any particular doctrine. Rather, he was a great leader in charge of all the activities of human life. That is why he was able to become the father of the Nation, Bangabandhu. The best Bengali of a thousand years, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 17 March 1920 was born in a noble Muslim family of Tungipara village under Gopalganj district. The ancestor was the dorbesh Sheikh Awal. He was a dear companion of Hazrat Bayazid Bostami (R). He arrived from Baghdad in 1463 AD to preach Islam. Later his descendants settled in Tungipara of Gopalganj district. The father of the nation is the seventh descendant of Islamic preacher Sheikh Awal. Bangabandhu's father Sheikh Lutfar Rahman (d. 1974) was famous as a Sufi character. Father of the Nation Bangabandhu himself was a religious man. He followed the rules of Islam in his personal and family life. He tried to live according to the Ahkam. He belongs to all other religions including Islam. Care was taken to determine the correct location. He is indeed a Muslim. He was a true Bengali. Bangabandhu Sheikh Mujibur in the preservation of Islamic heritage of independent Bangladesh in this article tried to highlight Rahman's contribution.]

ভূমিকা

স্বাধীনতা অর্জনের পেছনের গৌরবোজ্জ্বল নায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এই দেশ ও জাতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই দেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে যুগে যুগে ওলী-আউলিয়া ও গাউস-কুতুবগণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

* এম.ফিল গবেষক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ঢাকা ও প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সুসং সরকারি মহাবিদ্যালয়, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

তাঁরা এ মাটিতেই শুয়ে আছেন। তাঁরা ছাড়াও বহু রাজনীতিবিদ তাদের রাজনীতি ও প্রশাসনিক দায়িত্বের মাধ্যমেও ইসলাম ধর্ম প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যতম। তিনি ইসলামী ঐতিহ্য প্রচার-প্রসারে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে তিনি এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি কখনও ইসলামকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেননি। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ ইসলামের শান্তির মর্মবাণী যেন উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। বাংলাদেশকে সকল ধর্মের মানুষের জন্য শান্তির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তিনি হলেন স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, একটি নতুন মানচিত্রের অমর রূপকার। বড় বিচিত্র, বর্ণাঢ্য আর কীর্তিতে ভরা তার সারাটি জীবন। তিনি নন্দিত হয়েছিলেন "বঙ্গবন্ধু" হিসেবে। স্বাধীনতার স্বর্ণফলক উপহার দেয়ার জন্য বাঙালি জাতি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তাঁরই সুযোগ্য নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি এ দেশকে স্বাধীন করেছিল। আমরা দেশপ্রেমিক এই মহান নেতার জন্য গর্ববোধ করি। ইসলামী ঐতিহ্য প্রচার-প্রসারে বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করাই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

নাম ও বংশ পরিচয়

বঙ্গবন্ধুর নামের প্রথম "শেখ" শব্দটি রয়েছে। আরবী ভাষায় বিশিষ্ট আলেমগণকে "শেখ" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[১] তাঁর পূর্বপুরুষ শেখ বোরহান উদ্দিন একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তাঁর থেকে এই শেখ বংশের সূচনা হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বলেন, "আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে। শেখ বোরহান উদ্দিন নামের এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে। শেখ বোরহান উদ্দিন কোথা থেকে এবং কীভাবে এই মধুমতির তীরে এসে বসবাস করেছিলেন কেউ-ই তা বলতে পারে না। আমাদের বাড়ির দালানগুলোর বয়স দুইশত বৎসরেরও বেশি হবে।"[২]

তাঁর জন্মের পর নানা শেখ আব্দুল মজিদ কুরআনুল কারীমের সূরা হূদ-এর একটি আয়াত থেকে তাঁর নাম বাছাই করেন। আয়াতটি হলো:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

১ আজো আরব বিশ্বে বিখ্যাত আলেমগণকে 'শেখ' বলা হয়। আর আমাদের দেশে বিখ্যাত আলেমগণকে মাওলানা, মুফতী বা আল্লামা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

২ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৩।

"তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। কাজেই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আর তাঁর দিকেই ফিরে আসো। নিশ্চয়ই আমার রব খুব কাছেই, ডাকে সাড়া প্রদানকারী।"[৩]

মুজিবুর রহমান অর্থ রহমানের (আল্লাহর) ডাকে সাড়াদানকারী। নাম রাখার সময় নানা বললেন: "মা সায়েরা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম, যে নাম জগৎজোড়া খ্যাত হবে।"[৪] এ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, বংশানুক্রমিক ধারায় ইসলামী ঐতিহ্য ধারণ করেই তিনি বেড়ে উঠেন।

জন্ম ও জন্মস্থান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ ঢাকা শহর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে তৎকালীন ফরিদপুর জেলার (বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার) টুঙ্গিপাড়া গ্রামের এক মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম সায়েরা খাতুন। তাঁর পিতা ছিলেন সিভিল কোর্টের একজন সেরেস্তাদার।[৬] তার পূর্বপুরুষ ছিলেন দরবেশ শেখ আউয়াল।[৭] তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য বঙ্গীয় এলাকায় আগমন করেন।[৮]

শিক্ষাজীবন

প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয় ১৯২৭ সালে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৪ বছর বয়সে সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ১৯৩৪ সালে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তিনি গ্লুকুমা রোগে আক্রান্ত হন। তিন বছর স্কুলে না গিয়ে ১৭ বছর বয়সে ১৯৩৭ সালে পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩৮ সালে ১৮ বছর বয়সে ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে চাচাত বোন শেখ ফজিলাতুন্নেছা রেনুর সাথে তাঁর বিবাহ হয়।[৯] ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুল

---

৩ সূরা হূদ, আয়াত ৬১।

৪ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১৫।

৫ মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ১৫ ।

৬ মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, পৃ. ১৩।

৭ শেখ মুজিবুর রহমান, পিতা শেখ লুৎফর রহমান, পিতা শেখ আব্দুল হামিদ, পিতা শেখ মুহাম্মদ জাকির, পিতা শেখ তাজ মাহমুদ তেকড়ি, পিতা শেখ জহিরউদ্দিন, পিতা দরবেশ শেখ আউয়াল। দ্র. অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, *ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৫।

৮ দরবেশ শেখ আব্দুল আউয়াল ওরফে শেখ বুরহানুদ্দীন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.)-এর সঙ্গে ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় এলাকায় আগমন করেন। দ্র. অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, *ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু*, পৃ. ১৭।

৯ "শেখ মুজিবের অধিকাংশ জীবনীকার তাঁর বিয়ের সময় সম্পর্কে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠ্যাবস্থায় তিনি বিয়ে করেন।" দ্র. মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, পৃ. ২৩।

থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে কলা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৪ সালে ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর সেক্রেটারি ছিলেন।[১০] ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফরিদপুর জেলায় মুসলিম লীগের নির্বাচনী কাজ পরিচালনার পুরো দায়িত্ব পালন করেন।[১১] এ বছরেই তিনি ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ সালে ইসলামিয়া কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলার খাদ্য-ঘাটতির ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে তিনিও প্রতিবাদ আন্দোলন "ভুখা মিছিল"-এর নেতৃত্ব দেন। সরকার ক্ষেপে গিয়ে উভয় নেতাকে কারারুদ্ধ করেন।[১২] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি তমদ্দুন মজলিশ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সূচিত ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন চলাকালে কারারুদ্ধ অবস্থায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে অনশন ধর্মঘট পালন করেন। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্ত হন। এর কিছুদিন পরেই প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। অতঃপর ১৯৫৪ সালের নিবার্চিনে তিনি প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৫৫ সালে তিনি গণপরিষদের সদস্য নিবার্চিত হন। অতঃপর ১৯৬৪ সালে ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে এক সভায় মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ সভাপতি এবং তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। অতঃপর ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে তিনি ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে রেসকোর্স ময়দানে গণসংবর্ধনা দেয়া হয় এবং সেখানে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এরপর ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙ্গালি জাতির মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য ভূমিকা পালন করে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে সেনাবাহিনীর একদল বিপদগামী অফিসারের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১৩]

---

১০ কলকাতায় ফরিদপুরবাসীদের একটি সংস্থা। প্রেসিডেন্ট ছিলেন কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নবাবজাদা লতিফুর রহমান।

১১ শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁকে এ দায়িত্ব দেন। দ্র. মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, পৃ. ৫৯।

১২ মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, পৃ. ১১৯।

১৩ ইসতিয়াক আলম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৬ খ্রি.),।

ইসলামী চিন্তা-চেতনা

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান শৈশব থেকেই ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের চেতনায় লালিত-পালিত হন। যৌবনে তিনি মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা ধারণ করে দেশ, জাতি ও মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেন। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে তিনি কখনও পিছপা হননি।[১৪] তিনি ইসলামের খেদমতে অসংখ্য অবদান রেখেছেন।

বঙ্গবন্ধু ইসলামী শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সঠিক ধর্মবিশ্বাসই তাঁকে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখিয়েছে। তিনি কোনো মুসলিম কর্তৃক অন্য ধর্মের অবজ্ঞা সহ্য করতেন না। নিজের অসাম্প্রদায়িক অবস্থান সম্পর্কে তিনি তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "অখণ্ড ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না, এটা আমি মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতারা খেপে গেছেন কেনো? ভারতবর্ষেও মুসলমান থাকবে এবং পাকিস্তানেও হিন্দুরা থাকবে। সকলেই সমান অধিকার পাবে। পাকিস্তানের হিন্দুরাও স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাস করবে।" তাই বন্ধবন্ধুর সুদীর্ঘ জীবনে কোনো সময়েই অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শন বা কটূক্তির কথা পাওয়া যায় না। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতার ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সে সময় তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে আবদুল গাফফার চৌধুরী লিখেছেন, "কলকাতার দাঙ্গায় তাঁর ভূমিকা ছিল এক অসম সাহসী যুবা-পুরুষের। একদিকে তিনি কলকাতায় হিন্দু এলাকায় অবস্থিত মুসলিম লীগ ছাত্রীনিবাস মন্নুজান হোস্টেলে যেতেন, যাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা হামলা চালাতে না পারে, সেজন্য তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে সারা রাত হোস্টেলটি পাহারা দেন। ছাত্রীদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার কাজে সাহায্য যোগান। আবার মুসলিম এলাকা পার্ক সার্কাসে অবস্থিত বিখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের বাড়িটিও পাহারা দিয়ে রক্ষা করেছেন।"

ইসলামী শিক্ষা লাভ

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবন শুরু হয় পিতা শেখ লুৎফুর রহমান ও মাতা সায়েরা বেগমের তত্ত্বাবধানে। তাঁর মা ছিলেন খুবই ধর্মভীরু। প্রথম সন্তান ছেলে হওয়ার কারণে মা তাঁকে খুব আদর করতেন। তিনি নিজেও মায়ের খুব ভক্ত ছিলেন। মা তাঁর ছেলে-মেয়েদের জীবনের শুরুতেই ইসলামী শিক্ষা দিয়েছিলেন।[১৫] তিনি আদরের পুত্র খোকার (বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক নাম) জন্য বাড়িতে তিনজন শিক্ষক রেখেছিলেন। ইসলাম শিক্ষার জন্য মৌলভী সাহেব, সাধারণ

১৪ শেখ হাসিনা, "শেখ মুজিব আমার পিতা", অগ্রপথিক, মহান স্বাধীনতা ও শোক দিবস সংখ্যা, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭, পৃ. ৮।

১৫ আব্দুল গাফফর চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা ২০০৯, পৃ. ১৬-১৯।

শিক্ষার জন্য পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাহ পাটোয়ারি ও কাজী আবদুল হামিদ। বঙ্গবন্ধু মৌলভী হুজুরের কাছে আমপারা, আর পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাহ্‌র কাছে বাংলা বর্ণমালা ও নামতা পড়তেন, কাজী আবদুল হামিদের কাছে পড়তেন কবিতা-গল্প ইত্যাদি।[১৬] অর্থাৎ বাল্যকালে পারিবারিকভাবেই তিনি ইসলামী শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন

ইসলামের ঐশী বাণী থেকেই মৌলিক ধর্ম সঠিকভাবে জানা যায়। বঙ্গবন্ধু সরাসরি ঐশী বাণী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অর্থসহ পাঠ করতেন এবং ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন, "আমি কুরআন তিলাওয়াত করতাম রোজ। কুরআর শরীফের বাংলা তরজমাও কয়েক খণ্ড ছিল আমার কাছে। ঢাকা জেলে শামসুল হক সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে মাওলানা মোহাম্মদ আলীর ইংরেজি তরজমাও পড়েছি।"[১৭] এর মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক জ্ঞানার্জন করে ধর্মীয় বিধিবিধান পালনে তিনি অনুপ্রাণিত হন। নামায ইসলামে বাধ্যতামূক উপাসনা বা ইবাদত। আর তাই তিনি নিয়মিত নামায আদায় করতেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি বলেন, "মাওলানা সাহেবের সাথে আমরা তিনজনই নামায পড়তাম। মাওলানা সাহেব মাগরিবের নামাযের পরে কুরআন মাজীদের অর্থ করে আমাদের বুঝাতেন। রোজই এটা আমাদের বাঁধা নিয়ম ছিল।"[১৮] আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের ওপর রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয করে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য রোযার বিধান দেয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার।"[১৯]

তিনি নিয়মিত আল্লাহ তা'আলার ফরয ইবাদত রোযা পালন করতেন। তিনি বলেন, "একদিন আমি আওয়ামী লীগ অফিসে ইফতার করছিলাম। ঢাকায় রোযার সময় আমি জেলের বাইরে থাকলে আওয়ামী লীগ অফিসেই কর্মীদের নিয়ে ইফতার করতাম।"[২০] ইসলামের মৌলিক পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে ঈমানের পরই নামায ও রোযার স্থান। আর তিনি একজন মহান আল্লাহর বান্দা

১৬ তদেব, পৃ. ১৬-১৯, অনুপম হায়াৎ, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর শিক্ষকগণ।

১৭ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১৮০।

১৮ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৬৯। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁকে এ দায়িত্ব দেন। দ্র. মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, পৃ. ৬০।

১৯ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৮৩।

২০ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৭৫।

হয়ে এ আবশ্যকীয় ইবাদত পালন করতেন। এর মাধ্যমে তাঁর ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রকৃতি ফুটে উঠে।

ইসলামী ঐতিহ্য প্রচার-প্রসারে বঙ্গবন্ধুর অবদান

ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে বঙ্গবন্ধু

উপমহাদেশে ইসলামের নিখুঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের কার্যক্রমে কওমী ধারার মাদ্রাসার অবদান অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু এ শিক্ষা কার্যক্রমকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কওমী আলেমগণের অবদান রাখার সুযোগ ছিল না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে তাঁদের কর্মসংস্থান ও কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য বঙ্গবন্ধু উপমহাদেশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান, যেমন- দারুল উলুম দেওবন্দ, দারুল উলুম সাহারানপুর, দারুল উলুম লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি মাদ্রাসার আলেমগণের উচ্চ ডিগ্রির সনদ দিয়ে সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কাজী পদে নিয়োগের অনুমতি প্রদান করেন। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে আল্লামা আজিজুল হক (রহ) হাদীস পড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ ময়মনসিংহ আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হন এবং মাওলানা উবায়দুল হক ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতীবের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলেন। এছাড়াও বহু বিদগ্ধ উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করেন।

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী কওমী মাদ্রাসা জামিয়া মাদানিয়া আল-ইসলামিয়া যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা বঙ্গবন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয়। তৎকালীন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা সৈয়দ আসাদ মাদানী (রহ)-এর বাংলাদেশে আগমন উপলক্ষে তার সম্মানার্থে বঙ্গবন্ধু আলেমগণের পরামর্শে এ দ্বীনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। মাওলানা আসাদ মাদানীর (রহ) হাতেই মাদ্রাসাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু-কন্যা বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কওমী আলেমগণের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য কওমী শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আলেমগণের শত বছরের দাবি অনুযায়ী নতুন আইন জাতীয় সংসদে পাস ও বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন করেন।[২১]

আলেম-উলামার সাথে সম্পর্ক

২১ আবুল মনসুর আহম্মদ, *আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর*, পৃ. ৫৫৬।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগত জীবনে বহু আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তরুণ বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির হাতেখড়ি আলেমগণের হাত ধরেই; যারা তৎকালীন বাংলার যুগশ্রেষ্ঠ ও খাতনামা আলেম ছিলেন। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরু। মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬) এর সাথে বঙ্গবন্ধুর আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল। ১৯৫৬-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত একটানা ১০ বছর মাওলানা তর্কবাগীশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিল। বঙ্গবন্ধু তখন যুগ্ম সম্পাদক, পরে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তর্কবাগীশের সঙ্গে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ, যা বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত করে। মাওলানা তর্কবাগীশ বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের সময় তাঁর পাশেই ছিলেন এবং ঐ অনুষ্ঠানে মুনাজাত পরিচালনা করেন।

আবুল মনসুর আহমদ বলেন, "৭ মার্চের ভাষণ শেষ করার পর তাজউদ্দিন সাহেব ঘোষণা দিলেন, এবার মাওলানা তর্কবাগীশ মুনাজাত পরিচালনা করবেন, সভার কাজ শেষ। মাওলানা সাহেব তখনই মাইকের সামনে দুই হাত তুলে মুনাজাত করেন। সমবেত বিশ-পঁচিশ লক্ষ লোকের চল্লিশ/পঞ্চাশ লাখ হাত উপরে উঠে পড়ল। মুনাজাতের সময় এবং তাকবীরের সময় কথা বলতে নেই। তাই কেউ কথা বললেন না, নড়াচড়া করলেন না। যখন মুনাজাত শেষ হলো, তখন শেখ মুজিব চলে গেলেন।"[২২] তর্কবাগীশ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর মানস গঠনে তর্কবাগীশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল। বঙ্গবন্ধু ও এ দুজন মাওলানা জীবনের নানা স্মৃতির কথা ইতিহাসের পাতায় কিংবদন্তির মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধু তৎকালীন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও পণ্ডিত আবুল হাশিমের (১৯০৫-১৯৭৪) সাহচর্য লাভ করেন। আবুল হাশিম ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারি নির্বাচিত হওয়ার পর ঢাকাসহ বাংলার বিভিন্ন এলাকা সফর করে কর্মীদের সংগঠিত করেন। এছাড়া কর্মীদেরকে তিনি রাজনীতি ও ইসলামী জ্ঞান বিশেষ করে হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবনীর বিভিন্ন দিক শিক্ষা দান করতেন।[২৩] আবুল হাশিম লীগের যুব নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সঙ্গে ইসলামের মৌলিক তত্ত্বসমূহ, রাজনীতি, সংগঠন, দর্শন এবং সমাজবিজ্ঞান

২২ Abul Hasim, *in retrospect* (Dhaka. Bangladesh Co operative book society Ltd. 1974), p. 92-93.

২৩ হযরত ফরিদপুরীর সান্নিধ্য কিছুক্ষণ, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) স্মারক গ্রন্থ, ১৯৯৯ খ্রি.।

বিষয়ে বিভিন্ন ক্লাস গ্রহণ করতেন। এসব ক্লাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত থাকতেন।[২৪]

বঙ্গবন্ধু তৎকালীন বাংলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৬-১৯৬৯)-এর স্নেহধন্য ছিলেন। আত্মীয়সূত্রে তিনি বঙ্গবন্ধুর দাদা ছিলেন। তিনি যখন লালবাগ মাদ্রাসার মুহতামিম, তখন শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতিতে তরুণ নেতা। সপ্তাহে কয়েকবার দাদাকে দেখতে লালবাগ মাদ্রাসায় যেতেন। ফলে মাওলানা ফরিদপুরীর সমসাময়িক অনেক আলেমকে বঙ্গবন্ধু দাদাজি বলে সম্বোধন করতেন। বঙ্গবন্ধু যাবতীয় কাজকর্মে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। মাওলানার সাথে তাঁর অনেক স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে। মাওলানা ফরিদপুরী সবসময়ই পাঞ্জাবির উপরে কালো কোট পারতেন। একদিন লালবাগে হুজুরের কামরায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বসা ছিলেন। শেখ মুজিব বললেন, "দাদা! আপনার কোটটা আমার খুব ভালো লাগে।" সাথে সাথে হুজুর নিজের পরনে থাকা কালো কোটটি খুলে নাতি মুজিবকে পড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, নাতি! গায়ে দাও তো দেখি, তোমাকে কেমন লাগে। এরপর ফরিদপুরী বললেন, "দারুন তো লাগছে নেতাকে। এখন তোমাকে সত্যিকারের জাতীয় নেতা মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা তোমাকে দিয়ে দিলাম। তুমি এটা পড়ে মিটিং মিছিলে যাবে।"[২৫]

আলেমগণের প্রতি বঙ্গবন্ধুর শ্রদ্ধার বিষয় বলতে গিয়ে কারী ইউসুফ বলেন, "শেখ সাহেব আলেমদের খুব শ্রদ্ধা করতেন। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর সামনা-সামনি দাঁড়াতেন না। তিনি বসে ফরিদপুরীকে জড়িয়ে ধরে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।[২৬] ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু মাওলানা অলিউর রহমানকে দায়িত্ব দিয়ে আওয়ামী ওলামা লীগ গঠন করেছিলেন। মাওলানা অলিউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রস্তাবকারী। তিনি "স্বতন্ত্র ধর্ম দপ্তর একটি জাতীয় প্রয়োজন" এ নামে একটি গ্রন্থও লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ সহযোদ্ধা।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মাওলানা শেখ উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদীর কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ শুরু হয়েছিল। সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর দেয়া সেই ঐতিহাসিক ভাষণকে "বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য" হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেসকো) এবং তা ইউনেসকোর "মেমোরি অফ দা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার" হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

---

২৪ দৈনিক যুগান্তর, ১৪ মার্চ ২০১৪।

২৫ আবুল মনসুর আহম্মদ, *আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর* (ঢাকা: খোসরোজ কিতাম মহল, সপ্তম সং, ১৯৯৯ খ্রি.) পৃ. ৫৫৬।

২৬ দৈনিক যুগান্তর, ১৪ মার্চ ২০১৪।

বঙ্গবন্ধু যখন ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণা করেন তখন পাকিস্তানের বহু আলেম-উলামা ৬ দফাকে সমর্থন দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে আলেমগণের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে কারী ইউসুফ বলেন, "আলেমগণের মাঝে মুহাদ্দিস মুফতী অলিউর রহমানকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার অপরাধে আজিমপুর ছাপড়া মসজিদের পাশে গলাকেটে হত্যা করা হয়েছে। মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ, যশোরের মাওলানা খাইরুল ইসলাম, কুমিল্লার মাওলানা হাবিবুর রহমান, মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, মুহাদ্দিস আবদুস সোবহান, মাওলানা ইমদাদুল হক আড়াইহাজারী, মাওলানা ফরীদ উদ্দিন মাসউদসহ বহু আলেম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন।"[২৭]

উপমহাদেশে তৎকালীন রাজনীতিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও সংগ্রামে সবসময় জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র আলেম-উলামাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাদের সংগ্রাম কোনো পদ-পদবীর বশবর্তী হয়ে নয়, বরং তা ছিল তাদের ঈমানী চেতনার শিক্ষা থেকেই। বঙ্গবন্ধু এই চেতনা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই মাওলানা তর্কবাগীশকে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। মোটকথা, বঙ্গবন্ধুর বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হয়েছিল এরূপ বিরাজমান আবহে। মাওলানা ভাসানী, মাওলানা তর্কবাগীশ, ইসলামী চিন্তাবিদ আবুল হাশিম ও মাওলানা ফরিদপুরীসহ বিশিষ্ট আলেমের সান্নিধ্যে থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু উদার ধর্মীয় ও জাতীয় ঐক্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। শুধু জীবিত ইসলামী ব্যক্তির সঙ্গেই নয়, জাগতিক জীবন ছেড়ে চলে যাওয়া অনেক ইসলামী ব্যক্তিকেও তিনি ভক্তি ও ভালোবাসার নজরে দেখতেন তারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যেমন- বিশ্ববিখ্যাত কবি আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু নিজেই লিখেছেন, "খাজা আবদুর রহিম পূর্বে আইসিএস ছিলেন (তখন ওকালতি করেন), খুব ভদ্রলোক। আমাকে তাঁর কাছে রাখলেন, জাভেদ মঞ্জিলে। তিনি জাভেদ মঞ্জিলে থাকতেন। "জাভেদ মঞ্জিল" কবি আল্লামা ইকবালের বাড়ি। কবি এখানে বসেই পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আল্লামা শুধু কবি ছিলেন না, একজন দার্শনিকও ছিলেন। আমি প্রথমে তাঁর মাজার যিয়ারত করতে গেলাম এবং নিজেকে ধন্য মনে করলাম। আল্লামা যেখানে বসে সাধনা করেছেন সেখানে থাকার সুযোগ পেয়েছি।"[২৮]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম বলে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিজগতে মানবজাতি একটি জাতি। মহান আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

২৭ আবুল মনসুর আহম্মদ, *আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর*, পৃ. ৫৫৬।

২৮ দৈনিক যুগান্তর, ১৪ মার্চ ২০১৪।

হিসেবে মানুষকেই ভালোবাসেন। নবী করীম (স.) ছিলেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানবতাবোধ ও মানবপ্রেমের এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন,

الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ

"সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারভুক্ত। সুতরাং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর পরিবারের সদস্যদের (সৃষ্টির) সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে।"[২৯]

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

"দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।"[৩০]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শিক্ষা আসলে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।"[৩১]

ভিন্ন ধর্মের মানুষদের সাথে মুহাম্মাদ (স.) সহানুভূতিশীল ব্যবহার করতেন এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। ভিন্ন ধর্মের কোনো প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তিনি তাদের দেখতে যেতেন এবং তার মাথার কাছে বসতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ، مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا

"কেউ উত্তমরূপে অযু করে নেকীর আশায় তার কোনো (অসুস্থ) মুসলিম ভাইকে দেখতে গেলে তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর খারীফ (সত্তর বছর) পথ দূরে রাখা হবে।"[৩২]

---

২৯ *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৬, হাদীস নং ৫৫৪১; *হুলইয়াতুল আওলিয়া*, খ. ২, পৃ. ১০২; *শু'আবুল ঈমান*, খ. ৯, পৃ. ৫২৩, হাদীস নং৭০৪৮; মুসনাদু শাফি', খ. ১, পৃ. ৪১৯, হাদীস নং ৪৩৫; *তাফসীরে মাযহারী*, খ. ১, পৃ. ৪০৯।

৩০ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ২৫৬।

৩১ সূরা আল-মুমতাহিনাহ, আয়াত ৮।

সৈয়দ আমির আলী বলেন, "যখন বিশ্বের অর্ধেক জুড়ে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, মুসলিম শাসক ও গভর্নরগণ মুসলিম সমাজের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাদের ধর্ম অনুযায়ী উপাসনা করার পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছিলেন।[৩৩] খলিফা উমর (রা.) সকল ধর্মের মানুষকে সহানুভূতির চোখে দেখতেন। সংখ্যালঘুরা জিযিয়া কর দিয়ে নিরাপত্তা লাভ করতেন। খলিফা যদি তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হতেন তবে তাদের কর ফেরত দিতেন। যুদ্ধের শুরুতে উপসনালয়, গির্জা, শিশু, বৃদ্ধদের ওপর আক্রমণ করতে নিষেধ করেন।[৩৪]

দ্বীন ইসলামে ভিন্ন মতাবলম্বীদের হত্যা করার কোনো নিয়ম নেই। খাজা নাজিমুদ্দীনের আমলে আহমদিয়া বা কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলন থেকে পাঞ্জাবে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার লোক মারা যায়। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি ও উদারভাবে ধর্মকে ব্যাখ্যা করার দক্ষতা প্রমাণ করে ইসলামের গভীর জ্ঞান তার ছিল এবং ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি অনেক উদার ছিলেন। তিনি বলতেন, "এমনকি বিধর্মীকেও অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা ইসলামে কড়াভাবে নিষেধ করা আছে।"[৩৫] তাঁর চেতনায় ইসলামের সঠিক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সত্যিকার অর্থেই ইসলামে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

স্বাধীনতাত্তোরকালেও বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করেন। তখন এদেশের জনগণের শতকরা ৮৬.৬০ ভাগ মুসলিম, ১২.১ ভাগ হিন্দু, ০.৬ ভাগ বৌদ্ধ এবং ০.৩ ভাগ খ্রিস্টান ও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায় বসবাস করত।[৩৬] বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির নাগরিকের জন্য সমঅধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।[৩৭] রাষ্ট্রদর্শনের এ সহজপাঠ তিনি ধর্মের মৌলিক শিক্ষার মত অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। যেমনিভাবে রাসূল (স.) মদীনা সনদে দেখিয়েছিলেন।[৩৮]

---

৩২ ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-জানায়িয (বৈরূত: দারুল কুতুবিল আরাবী, তা.বি.), খ. ৩, হাদীস নং ৩০৯৭।

৩৩ Syed Amir Ali, *The Spirit of Islam* (Delhi: Low price publication, 1990), p. 212.

৩৪ অধ্যাপক কে. আলী, *ইসলামের ইতিহাস*, পৃ. ১৭৭।

৩৫ মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, পৃ. ৭৮-৭৯; নিগার চৌধুরী, *বাঙালি জাতীয়তাবাদ উদ্ভব ও বিকাশ* (ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৪।

৩৬ মো: শামসুল কবীর খান, *বাংলাদেশের অর্থনীতি*, পৃ. ৫০।

৩৭ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর, সংশোধিত অনুচ্ছেদ-২৭, পৃ. ৮।

৩৮ মদীনা সনদে রাসূলুল্লাহ (স.) বিভিন্ন গোত্রকে সাথে নিয়ে মদীনার সংবিধান তৈরি করে ছিলেন। যেমন- আউস গোত্র, খাযরাজ গোত্র, বনী মোস্তালিক গোত্র, বনী ইয়ামীন গোত্র প্রমুখ।

ধর্মীয় নিরপেক্ষতার পথ অবলম্বন

আজকাল ধর্মনিরপেক্ষতা আর ধর্মহীনতাকে এক করে তালগোল পাকিয়ে ফেলার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অনেকে আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে ধর্মনিরপেক্ষতা, ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের সাথে সম্পর্কহীনতা বুঝাতে চায়। অথচ ৭২-এর সংবিধানের চার মূলনীতিতে "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ" অন্যান্য দেশের কথিত ধর্মনিরপেক্ষতার মতো নয়, বরং কথাটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এটা ছিল বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব দর্শন। এর ব্যাখ্যা বঙ্গবন্ধু নিজেই দিয়ে গেছেন। সেই ব্যাখ্যা উপেক্ষা করে মুসলিমদের ওপর ধর্মহীনতা চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সদ্য স্বাধীন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল সমাবেশে ঘোষণা দেন, "বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলিম সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।" এর কিছুদিন পর তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে প্রদত্ত এক ভষণে বলেন, "বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলিম মুসলিমের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টান তার ধর্ম পালন করবে এবং বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নেইই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। এর একটা মানে আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না।"[৩৯]

বঙ্গবন্ধুর মতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিশব্দ হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বহু ধর্মের ধর্মীয় সহাবস্থান। কেননা বঙ্গবন্ধুর সরকারকেই দেখা গেছে, তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মচর্চার ব্যবস্থা করেছেন। মূলত দেশে এখন ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, তার অনেকটাই এ সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির কারণে। আমাদের বুঝাতে হবে যে, বঙ্গবন্ধু দেয়া "ধর্মনিরপেক্ষতবাদ" কোনো নাস্তিক দর্শন নয়, বরং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার একটি প্রক্রিয়াগত ব্যবস্থা। তাই তো বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ" হিসেবে পরিচিত। হাজার বছর ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সহনশীলতার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত এ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতা কোনোদিন মাথাচাড়া দেয়নি।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখেছেন, "বাংলাদেশের যে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ ঘোষিত হলো, তা ইসলামহীন সেক্যুলারিজম নয়। কারণ মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ইসলাম সংক্রান্ত অনুষ্ঠান একটু বেশিই যেন প্রচারিত হতো। হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম

৩৯ সৈয়দ আবুল মকসুদ জানিয়েছেন। দ্র. অনুপম হায়াৎ, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর শিক্ষকগণ।

নিয়ে বিশেষ কিছুই হতো না। কিন্তু কেন তা হতো? তা হতো এজন্য যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম শ্রোতার কাছে ইসলামী অনুষ্ঠানের বিশেষ আবেদন ছিল।[৪০]

মুসলিম সেবা সমিতি প্রতিষ্ঠা

১৯৩৭ সালে বঙ্গবন্ধুকে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি করানো হয়। গৃহশিক্ষক কাজী আবদুল হামিদ এমএসসি মাস্টার সাহেব গোপালগঞ্জে একটা "মুসলিম সেবা সমিতি" গঠন করেন, যার দ্বারা গরিব ছেলেদের সাহায্য করতেন। সকল মুসলিম বাড়ি থেকে মুষ্ঠির চাউল বিক্রি করে গরিব ছেলেদের বই এবং পরীক্ষার ও অন্যান্য খরচ দিতেন। হঠাৎ মাস্টার সাহেব যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তখন বঙ্গবন্ধু "মুসলিম সেবা সমিতি"র সম্পাদকের দায়িত্ব নিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেন, "যদি কোনো মুসলমান চাউল না দিত আমার দলবল নিয়ে তার ওপর জোর করতাম। দরকার হলে তার বাড়িতে রাতে ইট মারা হতো। এজন্য আমার আব্বার কাছে অনেক সময় শাস্তি পেতে হতো। আমার আব্বা আমাকে বাধা দিতেন না।"[৪১] কিশোর বয়স থেকে অসহায়কে সাহায্য করার গভীর অনুভূতি তৈরি হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর।

অসহায়ের বন্ধু ও অন্যায়ের প্রতিরোধকারী

বঙ্গবন্ধুর ভেতরে মুসলিমদের বাঁচানোর এক সুতীব্র অনুভূতি দানা বেঁধেছিল রাজনৈতিক জীবন শুরুর প্রারম্ভেই এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই তখন তিনি ভেবেছিলেন বাঙ্গালি মুসলিমদের সফলতা। তার আত্মজীবনীতে তিনি বলেন, "তখন রাজনীতি শুরু করেছি ভীষণভাবে। সভা করি, বক্তৃতা করি। খেলার দিকে আর নজর নাই। শুধু মুসলিমলীগ, আর ছত্রলীগ। পাকিস্তান আনতেই হবে, নতুবা মুসলমানদের বাঁচার উপায় নাই। খবরের কাগজ "আজাদ" যা লিখে তাই সত্য বলে মনে হয়।"[৪২] তিনি আরও বলেন, "১৯৪২ সালে আমি ফরিদপুর যেয়ে ছাত্রদের দলাদলি শেষ করে ফেলতে সক্ষম হলাম এবং পাকিস্তানের জন্যই যে আমাদের সংগ্রাম করা দরকার এ কথা তারা স্বীকার করলেন। তখন মোহন মিয়া সাহেব ও সালাম খান সাহেব জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন"।[৪৩]

স্কুল জীবনেও বন্ধু অন্যায়ভাবে নির্যাতনের শিকার হওয়ায় তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। বঙ্গবন্ধু যখন ১৯৪১ সালে গোপালগঞ্জে মিশন স্কুলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নেন, তখন

৪০ তদেব, পৃ. ১৮।
৪১ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৯-১০।
৪২ তদেব, পৃ. ১৫।
৪৩ তদেব, পৃ. ১৬।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ঐ সময় একজন মুসলিম ছাত্র অন্যায়ভাবে মারপিটের শিকার হয়। বঙ্গবন্ধু তখন স্কুলের শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কাছে বিষয়টির মীমাংসা চান। শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অন্যান্যের সহায়তা নিয়ে বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে মিটমাট করেন। বঙ্গবন্ধু ঐ শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেন। ঐ স্কুলে আর কখনো এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

ইসলামে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ঈমানের দাবি। হাদীসে শক্তি থাকলে হাত দিয়ে, না হয় মৌখিক প্রতিবাদ, অন্যথায় অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে বলা হয়েছে।

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় দেখবে সে যেন তা তার হাত দিয়ে বাধা দেয়, আর যদি হাত দিয়ে বাধা না দিতে পারে তবে যেন সে মুখ দিয়ে বাধা দেয়, আর যদি মুখ দিয়ে বাধা না দিতে পারে তবে যেন সে অন্তর দিয়ে বাধা দেয়, আর এটিই হলো দুর্বল ঈমানের পরিচয়।"[৪৪]

ইসলামের এ মৌলিক শিক্ষা তিনি তাঁর জীবনে বর্মের মতো গ্রহণ করেছিলেন। হয়তো শৈশবের ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তি থেকেই তাঁর এ মানসিক শক্তি ও মনোবল তৈরি হয়েছিল। ইসলাম শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকারই দেয়নি; বরং যালিমের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করার অধিকারও ইসলামে রয়েছে, এমনকি তাকে শাসন কর্তৃত্ব থেকে অপসারণও করা যাবে। কেননা শাসকের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে যুলুমের অবসান ঘটানো এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।[৪৫]

অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধকরণ ও আইন প্রণয়ন

আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া ও অসামাজিক কার্যকলাপকে হারাম করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

৪৪ *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৫৯; *সুনানে তিরমিযী*, হাদীস নং ২১৭২; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ১১৪০; *সুনানে নাসায়ী*, হাদীস নং ৫০০৮; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ১২৭৫।

৪৫ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

"হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয় করার শর তো কেবল ঘৃণার বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে। তবে কি তোমরা বিরত হবে না?"[৪৬]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"আর যিনার ধারে-কাছেও যেও না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"[৪৭]

ইসলামে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা বৈধ হলেও পাকিস্তান আমলে রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার নামে জুয়া, হাউজি ও বাজি ধরার প্রতিযোগিতা চলত। বঙ্গবন্ধু এটি বন্ধ করে সেখানে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করেন। কারণ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

"যদি কোনো মুসলিম কোনো গাছ রোপন করে অথবা ক্ষেতে ফসল বোনে আর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ প্রাণী খায়, তবে তা তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।"[৪৮] তিনি বৃক্ষরোপণ করে এ মাঠের নামকরণ করেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।[৪৯]

সুতরাং বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর ধ্যান ধারণায় ধর্মীয় চেতনা জাগরুক ছিল। ইসলামের নামে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে অবাধে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ চলত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে শাস্তির বিধান প্রণয়ন করেন।[৫০] এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটে।

মহৎ গুণের অধিকারী

বঙ্গবন্ধু শিক্ষকদের সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন। সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেছেন, "স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার সময়ও অধ্যাপক সাইদুর রহমানের পায়ে হাত দিয়ে তাকে

৪৬ সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ৯০-৯১।

৪৭ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩২।

৪৮ *সহীহুল-বুখারী*, হাদীস নং ২৩২০; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৫৬৩/১২।

৪৯ মো: শামসুল কবীর খান, *বাংলাদেশের অর্থনীতি* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৫।

৫০ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১৭৪।

শ্রদ্ধা জানাতে দেখেছি।"[৫১] তিনি উলামায়ে কিরামকে ব্যক্তিগতভাবে খুব সম্মান করতেন। তিনি পূর্ব বাংলার বিখ্যাত আলেম, যিনি "সদর সাহেব হুজুর" নামে পরিচিত, আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ) সম্পর্কে লিখেন, "গোপালগঞ্জে আমার নিজের ইউনিয়নে পূর্ব বাংলার এক বিখ্যাত আলেম মাওলানা শামসুল হক সাহেব জন্মগ্রহণ করেছেন। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন।"[৫২]

১৯৪৩ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ঐ সময় দুর্ভিক্ষের অবস্থা, বেকার হোস্টেলের ছাত্রদের সহায়তা এবং কলেজের শিক্ষক সাইদুর রহমান, আই এইচ জুবেরী, নারায়ণ বাবুসহ অধ্যাপকদের সহমর্মিতা সম্পর্কে জানা যায় বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতে। তিনি লিখেছেন, "এই সময় শহীদ সাহেব লঙ্গরখানা খোলার হুকুম দিলেন। আমিও লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাপিয়ে পড়লাম। অনেকগুলো লঙ্গরখানা খুললাম। দিনে একবার করে খাবার দিতাম। মুসলিম লীগ অফিসে, কলকাতা মাদ্রাসা এবং আরো অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খুললাম। দিনভর কাজ করতাম, আর রাতে কোনোদিন বেকার হোস্টেলে ফিরে আসতাম, কোনোদিন লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে থাকতাম।"[৫৩]

নিরন্নকে অন্নদান, অসহায়কে সাহায্য প্রদান এসব মানবীয় গুণাবলি ইসলামের অনবদ্য শিক্ষা, যা বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিজীবনে আমরা দেখতে পাই।

দেশের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা

তিনি জন্মভূমির মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এদেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবেসেছিলেন। আর দেশকে ভালোবাসা ইসলামের একটি মহান শিক্ষা। এটিকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, "মুসলিম লীগ ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করলেও জনগণের প্রয়োজন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে যেতে হবে।"[৫৪] মূলত তিনি এ দেশের প্রতি ভালোবাসার কারণেই ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের চেয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতি বেশি নজর দিয়েছেন। শুধু স্বার্থ হাসিলকারীরাই ধর্মকে রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

---

৫১ অনুপম হায়াৎ, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর শিক্ষকগণ।

৫২ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৫৬।

৫৩ তদেব, পৃ. ১৮।

৫৪ মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, পৃ. ৭৮-৭৯; নিগার চৌধুরী, *বাঙালি জাতীয়তাবাদ উদ্ভব ও বিকাশ*, পৃ. ২৬০-২৬১।

জন্মভূমির প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার শক্তিই তাকে নৈতিক বলে বলিয়ান করে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমী করে তুলেছিল।

ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন

বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শেষে বিমানবন্দর থেকে লাখো মানুষের গগনবিদারী জয় বাংলা স্লোগানের মধ্যদিয়ে একটি খোলা ট্রাকে রেসকোর্স ময়দানে এসে হাজির হলেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে যিনি এখানে তাঁর বক্তব্যে ইন্দোনেশিয়ার পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। একই বক্তৃতায় তিনি আবার রাষ্ট্রীয় চার স্তম্ভের মধ্যে একটি ধর্মীয়নিরপেক্ষতার কথাও বললেন।[৫৫] ধর্মনিরপেক্ষতাকে তিনি ধর্মহীনতা হিসেবে দেখেননি।[৫৬] আসলে এটি তাঁর প্রগতিশীল চেতনার পাশাপাশি ইসলামী চেতনাও মনোজগতে ধারণ করার একটি প্রমাণ। তাঁর শাসনামলে ১৯৭২ সালে সৌদি আরবে মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে ছয় সহস্রাধিক বাংলাদেশী মুসলিমকে হজ্জ পালনে প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস বিপন্ন, পাকিস্তানিদের এমন প্রচারণার জবাবে মুসলিম বিশ্বের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, "কেবল ইন্দোনেশিয়ার পরেই বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র।" তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি আরও বলেন, "ইসলামের নামে এদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুসলমানদের মেরেছে, অসম্মান করেছে নারীদের। আমি ইসলামকে অসম্মান করতে দিতে চাই না।" তিনি তদন্তের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠন এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে চালানো গণহত্যার পরিসর নির্ধারণের আহ্বানও জানান জাতিসংঘকে। তার বক্তব্য মুসলিম হত্যাকে ইসলামের প্রতি অসম্মান হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়টি ইসলামের প্রতি গভীর অনুরাগেরই বহিঃপ্রকাশ।

অসহায় মানব সমাজের পক্ষে নেতৃত্বদান

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি যালিমদের বিরুদ্ধে বাঙালি মযলুমের সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধু এ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। এটি ছিল ইসলামেরই খেদমত। যালিমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে ইসলাম জিহাদ হিসেবে উল্লেখ করেছে। যালিম যদি মুসলিমও হয়, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ আল-কুরআনে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৫৫ শামীম মোহাম্মদ আফজাল, *শেখ হাসিনার প্রেরণায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ২৬।

৫৬ *শেখ হাসিনার প্রেরণায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, পৃ. ২৬।

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

"আর মুমিনদের দুদল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও; অতঃপর তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"[৫৭]

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন,

اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"তোমরা যুলুম করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে।"[৫৮]

বছরের পর বছর বাঙালিদের বঞ্চিত করা হয়েছে। এ যুলুম অত্যাচার আর বঞ্চনার নিগড় থেকে মুক্তি করার জন্য তিনি কষ্ট স্বীকার করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষার ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা দানের মাধ্যমে মুক্তি দিয়েছেন এ জাতিকে। ধর্মীয় অনুপ্রেরণাও এখানে ছিল।

ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন যখন বেশ দানা বেঁধে উঠে, দেশের বাঙালি সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় কোনো না কোনোভাবে সে আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ে। দেশের এই সংক্ষুব্ধ পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কৈশোর জীবনে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেন স্কুল পরিদর্শনে আসা শেরে বাংলা এ কে এম ফজলুল হককে সংবর্ধনা দেয়ার মাধ্যমে।[৫৯] রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণ করেন মিশন স্কুলে অধ্যয়নকালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট থেকে।[৬০] ১৯৩৯ সালে তিনি প্রথম কারাবরণ করেন।[৬১] এরপর ১৯৪০ সালে তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৫৮-এর সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলন, ৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬-এর ছয়দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচনসহ অধিকাংশ আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি জাতির নেতৃত্ব দেন। বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে আজীবন সংগ্রাম করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে পুনর্গঠনের জন্য সময় পান মাত্র সাড়ে তিন বছর। তিনি তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ গঠনে অবদান রাখেন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তিনি ইসলামের খেদমতে বিভিন্ন ধরনের

---

৫৭ সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ৯।

৫৮ *সহীহুল-বুখারী*, হাদীস নং ২৪৪৭; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৫৭৮।

৫৯ তদেব, পৃ. ১৫।

৬০ তদেব, পৃ. ১৫।

৬১ তদেব, পৃ. ১৫।

কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এসকল উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে তার ইসলামী চেতনা ও ভাবধারা প্রকাশ পায়।

মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুসলিম বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) অধিবেশনে যোগদান করেন। এর ফলে ওআইসি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ এ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত অধিবেশনে ইসলাম ও বাংলাদেশ সম্পর্কে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সামনে তিনি যে বক্তব্য প্রদান করেন, তাতে আরব বিশ্বসহ মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।[৬২] এছাড়াও আরবসহ মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা সমুন্নত হয় এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়।

১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন করেন এবং সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেন। তিনি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনে ১ লক্ষ পাউন্ড চা, ২৮ সদস্যের মেডিকেল টিমসহ একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণ করেন।[৬৩] এ সমস্ত মৌলিক কার্যাবলির মাধ্যমে তাঁর ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রকাশ পায়। ধর্মের প্রতি কতটা গভীর অনুরাগ থাকলে সাংবিধানিক কাঠামোর বাহিরে এসে তিনি ধর্মীয় চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

১৯৭২ সালের ৪ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের আলোচনার জন্য যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সে অধিবেশনে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা নয় বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম-কর্ম করার স্ব স্ব অধিকার অব্যাহত থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মচর্চা বন্ধ করতে চাই না এবং তা করবও না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম-কর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রের কারো নেই।"[৬৪] এ অনবদ্য ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর ধর্মীয় চেনতার প্রকাশ ঘটে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের উপর চলার জন্য জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। ইসলামের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী সঠিকভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান বাহিনীর সাথে

৬২ অধ্যাপক কে. আলী, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা: আলী পাবলিকেশনস, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১৭৮।

৬৩ সলিমুল্লাহ খান সম্পাদিত, *বেহাত বিপ্লব ১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় সং., ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ২২৯।

৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

আঁতাতের অভিযোগে নিষিদ্ধ হওয়া ইসলামিক একাডেমি পুনরায় চালু করেন। ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ নামকরণ করেন "ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ"।[৬৫] কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রচার ও প্রসার কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারি করে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৬] ইসলামী আদর্শের যথাযথ প্রকাশ তথ্য ইসলামের উদার মানবতাবাদী চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা ছিল বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমি ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করা;

খ. মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমি ও ইনস্টিটিউট এবং সমাজ সেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূকে আর্থিক সহায়তা দেয়া;

গ. সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের ওপর গবেষণা পরিচালনা;

ঘ. ইসলামে মৌলিক আদর্শ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;

ঙ. ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো এবং জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেগুলোর সুলভ প্রকাশনা ও বিলি বণ্টনকে উৎসাহিত করা;

চ. ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশ করা;

ছ. ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির ওপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;

জ. ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;

ঝ. ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাতে সহায়তা করা;

ঞ. ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা;

---

৬৫ স্মরণিকা, জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা, ঢাকা মহানগরী আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৫ আগস্ট, ১৯৯৩।

৬৬ *বাংলা পিডিয়া*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি), পৃ. ৪৪১।

ট. বায়তুল মোকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি সাধন করা এবং

ঠ. উপর্যুক্ত কার্যাবলির যেকোনোটির ক্ষেত্রে আনুষাঙ্গিক কাজ সম্পাদনা করা।[৬৭]

বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গীতে সরকারি জায়গা বরাদ্দ

বিশ্ব ইজতেমা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা করার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে তুরাগ নদীর তীরবর্তী জায়গাটি প্রদান করেন। সেই থেকে অদ্যাবধি তাবলীগ জামায়াত ঐ স্থানে বিশ্ব ইজতেমা করে আসছে।[৬৮] এছাড়া তাবলীগ জামায়াতের মারকায বা কেন্দ্র নামে পরিচিতি কাকরাইল মসজিদের সম্প্রসারণকল্পে রমনা পার্কের অনেকখানি জায়গার প্রয়োজন যখন দেখা দেয়, তখন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নির্দ্বিধায় কাকরাইল মসজিদকে সম্প্রসারণ করার যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করেন।

রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামায়াত প্রেরণের ব্যবস্থা

রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। সে দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য বিদেশ থেকে কেউ অনুমতি পেত না। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়া সহযোগিতা করায় বঙ্গবন্ধুর সাথে সেদেশে নেতৃবৃন্দের একটি সুদৃঢ় ও বন্ধুত্বের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে স্বাধীনতার পর সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম তাবলীগ জামায়াত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যপদ লাভ

১৯৭৪ সালে ওআইসি সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বে সুদবিহীন শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর জেদ্দায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (ওউই) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সনদ (Islamic development Bank Charter) স্বাক্ষর করে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করে। যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতের পর ইসলামী ব্যাংক স্থাপিত হলেও বাংলাদেশের সুদমুক্ত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠায় তার উদ্যোগের কথা কেউ জনসম্মুখে নিয়ে আসেনি।

সীরাত মজলিস প্রতিষ্ঠা

---

৬৭ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১৭২-১৭৩।

৬৮ মাওলানা ইসহাক উবাইদি, বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্ম চিন্তা, মাসিক অগ্রপথিক, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৯৮, পৃ. ১২৭।

বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় "সিরাত মজলিস" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। সীরাত মজলিস ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে রবীউল আউয়াল মাসে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রথম বৃহত্তর আঙ্গিকে ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) মাহফিল উদযাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু বায়তুল মোকাররম মসজিদ চত্বরে মাহফিলের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন

ইসলামী আকীদাহ ভিত্তিক জীবন গঠন ও দ্বীনী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করেন। পূর্বে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড স্বায়ত্তশাসিত ছিল না। বঙ্গবন্ধু প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডকে স্বায়ত্তশাসন প্রধান করে এর নাম রাখেন "বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড"। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন এর মাধ্যমে জাগতিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় সাধিত হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয় এবং সরকারি চাকরি লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়।[৬৯]

হজ্জ পালনের জন্য সরকারি অনুদান

পাকিস্তান আমলে হজ্জযাত্রীদের জন্য কোনো সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা ছিল না। বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রথম হজ্জযাত্রীদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করেন এবং তিনি হজ্জযাত্রীদের ভ্রমণ কর রহিত করেন। এছাড়া হাজীগণ যাতে সমুদ্রপথে স্বল্প ব্যয়ে হজ্জ করতে পারেন সেজন্য "হিজবুল বাহার" নামে একটি জাহাজ ক্রয় করেন।

বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত প্রচার

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে তাঁরই নির্দেশে সর্বপ্রথম বেতার ও টেলিভিশনে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচার করার সুব্যবস্থা করা হয়।

কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন পাশের বিপক্ষে অনমনীয় অবস্থান

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে, "আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই" এ কথার জবাবে আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য, আমরা লেবাসসর্বস্ব ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম রাসূলে করীম (স.)-এর ইসলাম, যে ইসলাম জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামে প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বারবার যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন,

৬৯ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১৭২-১৭৩।

আমাদের সংগ্রাম সেই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে। যে দেশে শতকরা ৯৫ জন মুসলমান সেদেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাসের কথা ভাবতে পারেন তারাই, ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা ফানা করে তোলার কাজে।"

আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে আরব পক্ষ সমর্থন ও সাহায্য প্রেরণ

১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন করেন এবং বাংলাদেশে তার সীমিত সাধ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ অবদান রাখার চেষ্টা করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনে ১ লাখ পাউন্ড চা, ২৮ সদস্যের মেডিকেল টিমসহ একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণ করা হয়।

শবে কদর, শবে বরাত ও সীরাতুন্নবী (স.) উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা

ইসলামের ধর্মীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাংলাদেশ সিরাতুন্নবী (স.), শবে কদর ও শবে বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। উল্লিখিত দিবস সমূহের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সিনেমা হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ রাখারও নির্দেশনা প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বক্তৃতায় ইনশাআল্লাহ উচ্চারণ

বঙ্গবন্ধুর অসংখ্য স্মরণীয় ভাষণ রয়েছে। এ ভাষণসমূহের মধ্যে আমরা ইসলামী ভাবধারা পরিলক্ষিত হতে দেখি। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে তিনি বলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দিব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল্লাহ।"[৭০] কোনো কাজের সংকল্প করে "ইনশাআল্লাহ"[৭১] বলতে হয়, এটা ইসলামী সংস্কৃতি। তাঁর ভাষণের এ উক্তি দ্বারা তাঁর ঈমানী চেতনা ও আল্লাহর ওপর অগাধ ভরসার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় এবং বুঝা যায় তার ঈমানী শক্তি কত মজবুত ছিল।

উপসংহার

---

৭০ ড. হারুন অর রশিদ, *ছেষট্টি থেকে একাত্তর, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধ প্রেক্ষাপট ও ঘটনা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৪৫।

৭১ ইনশাআল্লাহ এর অর্থ যদি আল্লাহ তা'আলা চান। এখানে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস জড়িত। আর তা হলো কোনো মানুষ চিহ্নিত করে বলতে পারে না আগামী দিন কে বাঁচবে। আল্লাহ তা'আলা যেকোনো সময় তার মৃত্যু দিতে পারেন। জীবন-মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং ভবিষ্যতে কোনো কিছু করার ইচ্ছা বা ঘোষণা দিলে বলতে হয় "ইনশাআল্লাহ"।

পরিশেষে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি ইসলামসহ অন্যান্য সকল ধর্মের যথাযথ স্থান সঠিকভাবে নির্ধারণের ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষেই একজন মুসলিম ও খাঁটি বাঙালি ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যত গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছিল তার প্রত্যেকটিরই বিরোধিতা করেছে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর তাবেদার অনুচররা। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরও তাদের অপপ্রচার থামেনি; বরং কিছু উচ্চাভিলাষী তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাও তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে। এরপরেও বঙ্গবন্ধু ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে বহু অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে, স্বাধীন বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার-প্রসারে তিনি অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যুগ যুগ ধরে তাঁর এই অবদানের কথা স্মরণ রাখবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৬১ বর্ষ ১ম সংখ্যা
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.

কৃষি উন্নয়নে মুসলিম অবদানের সংক্ষিপ্ত রূপ

মো: খোন্দকার সামিউল আলীম*
তানবীর হোসাইন**

[Abstract : The greatest Allah created many animals and their first and prime thing to survive is food. So he himself takes responsibility to feed them. About this Allah tells, "The animals who live on earth are given food by Allah and He knows their residence and grave. And all are described in clear book." But most of the portion of this foods come to them directly or indirectly from farming or farming related goods which are presented for the mankind as the best and welfare. So the duty of men is to find and preserve the foods for mankind and other animals by farming. Allah says with this regard, "After finishing your Salah you spread on the earth and find food for you". For this our Prophet Mohammed (S) emphasized on farming and did the task for the welfare of men. He called the farming as the best occupation. Following this the Shahabas, Khalifa of the Umayad and Abbasies did many for the betterment of progress of farming such as digging wells and canals for irrigation, division of land, leasing of land and invest. For this why broadness of farming was increased and solvency of men was improved.]

[সারসংক্ষেপ: আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতে যে সকল প্রাণীকুল সৃষ্টি করেছেন, সে সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার প্রথম ও প্রধান উপকরণ হলো খাদ্য। আর তাই আল্লাহ নিজেই এ খাদ্যের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ সর্ম্পকে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর জমিনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল। সব কিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে।" তবে এ খাদ্যের সিংহভাগ আসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি বা কৃষিজাত পণ্য থেকে যা কি না মানবকুলের জন্য উত্তম ও কল্যাণময় পেশা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে অর্থাৎ কৃষির মাধ্যমে মানবজাতির ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য আহরণ ও সংরক্ষণ করা মানবের কাজ। এ সর্ম্পকে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "নামায শেষ হলেই তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আমার রিযিক সন্ধান করো"। আর তাই নবী করীম (সা) কৃষির প্রতি জোর ও বিভিন্ন কল্যাণকর কাজ করেছেন তিনি কৃষিকে উত্তম পেশা হিসেবে আক্ষা দিয়েছেন, এর ধারাবাহিকতাই সাহাবীগণ এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাগণ কৃষির জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধামূলক কাজ করেছেন যেমন- সেচ ব্যবস্থার জন্য কূপ ও খাল খনন, জমি বণ্টন ইজারা প্রণোদনা ইত্যাদি, ফলে কৃষির ব্যাপকতা বেড়েছে এবং সাধারণ মানুষে সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।]

* এম.ফিল গবেষক, দা'ওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
** এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ইসলাম ও কৃষি

মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা। এই মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হলো খাদ্য, যা কৃষি থেকেই উৎপন্ন হয়। আর এই কৃষির প্রধান ও অন্যতম মূল উপাদান হলো ভূমি। ভূমি ছাড়া কোন প্রকার জীবিকাই অর্জন করা সম্ভব নয় তাই ভূমির পরিচয় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

আল্লাহর সকল নিয়ামতের মধ্যে ভূমি হলো অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত, যা মানুষ তথা সকল জীবজন্তুর অধিকার রয়েছে (ভূমি) ভোগ করার। ভূমি আল্লাহ প্রদত্ত উৎপাদনের আদি ও মৌলিক উপকরণ। এটি প্রাণীকুলের জীবিকা অন্বেষণের জন্য আল্লাহর অফুরন্ত দান।

এ সম্পর্কে আল্লাহ ত'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুত তিনি তৈরি করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।"[১] সাধারণত ভূমি বলতে আমরা পৃথিবীর স্থলভাগ তথা মাটি বা জমিকে বুঝি, কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি বলে। অর্থাৎ প্রচলিত অর্থনীতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত সকল প্রাকৃতিক সম্পদকেই ভূমি বলে।

অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শালের মতে, "প্রকৃতি যে সম্পদ জল, স্থল, বায়ু ও তাপের মাধ্যমে মানুষকে উপহার দেয় তাই ভূমি।" তিনি বলেন, ভূমি বলতে সেসব সম্পদ এবং শক্তিসমূহকে বোঝায় যা জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত এবং যা মানুষের সাহায্যার্থে স্রষ্টা উপহার দিয়েছেন।[২]

ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. এ.এইচ. এম. সাদেক বলেন, "ইসলামে ভূমি শব্দটি একটি ভিন্ন প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হয়। যেসব বস্তুগত সম্পদকে উৎপাদন কার্যে ইজারা বা ভাড়া খাটানো হয় এবং যা উৎপাদনের উপাদান হিসেবে ব্যবহারের সময় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় না তাকে ভূমি বলে।"[৩]

---

১. সূরা আল-বাকারাহ : ২৯।
২. ড. কে. টি. হোসেন ও ড. এ. এইচ. এম. সাদেক, *ইসলামি অর্থনীতি* (ঢাকা: বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩৬।
৩. ড. কে. টি. হোসেন ও ড. এ. এইচ. এম. সাদেক, *ইসলামি অর্থনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।

ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. এম.এ. মান্নান ভূমির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "ভূমিসত্ব বা ভূমির মালিকানা মহান আল্লাহর। এর ব্যবহারিক মালিকানা হলো জনসাধারণের ও রাষ্ট্রের।"[৪]

এই সংজ্ঞা দ্বারা বোঝা যায় যে সমস্ত ভূমি মালিকানা আল্লাহর আর মানুষ এর বাহক মাত্র। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ أَعْطَى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى

"সে বলল, আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন।"[৫]

তিনি আরো বলেন,

هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও জমিনে যা আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৬]

মোটকথা, "ভূমি হলো এমন একটি বস্তু যা সম্পূর্ণ প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায় এবং এটি সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি ও মালিকানাধীন। জণসাধারণ ও রাষ্ট্র এর ভোক্তা বা বাহক মাত্র।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

"হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি।"[৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"এমন কিছুই নাই যে, যা আমি কুরআনে উল্লেখ করিনি।"[৮]

এই আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, আল্লাহ কুরআনে সকল বিষয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আলোচনা করেছেন। কৃষি এর মধ্যে অন্যতম। কেননা কৃষি মানুষ ও প্রাণীকুলের জীবনধারণের মূল ও মৌলিক উৎস হিসেবে স্বীকৃত, এটি আল্লাহর নিয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম। কৃষি শুধু মানুষের দৈহিক খোরাক যোগায় না, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক খোরাকও যোগায়। আল্লাহর অস্তিত্ব এবং মানুষের জন্ম ও মৃত্যু রহস্য একজন কৃষকের চোখে অতি সহজে

৪. ড. এম.এ. মান্নান, *ইসলামি অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ* (ঢাকা: ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৭০।

৫. সূরা ত্বা-হা : ৫০।

৬. সূরা আল-হাশর : ২৪।

৭. সূরা আলে ইমরান : ১৯১।

৮. সূরা আল-আন'আম : ৩৮।

ধরা পড়ে। তাই ইসলাম কৃষিকে মহান ও পুণ্যের কাজ বলে অভিহিত ও কৃষককে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

এরই আলোকে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল-

أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

"কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বলেন, ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জিত খাদ্য।"[৯]

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যেসব খাদ্যবস্তু ছড়িয়ে রেখেছেন সেগুলোর সংরক্ষণ করা মানুষের কর্তব্য। আর এ সংরক্ষণের জন্য চাষাবাদ ও আহরণের নাম কৃষি। আল্লাহ প্রদত্ত বিভিন্ন উৎসকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন এবং আহরণের জন্য সঠিক ও সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানোকেও কৃষি কাজ বলা হয়। তাই এ আলোকে বলা যায় যে, খাদ্যশস্য বা সফল উৎপাদন, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, মৌমাছি পালন, বনজ সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কৃষির অন্তর্ভুক্ত।

মানুষ হলো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তাই একেই সকল খাদ্য শস্য নিজেদের ও অন্যান্য প্রাণী কুলের জন্যেই কৃষি কাজের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ কৃষির মাধ্যমে সকল প্রাণীর খাদ্য উৎপন্ন হয়। তাই ইসলাম কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"আর জমিনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল। সব কিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে।"[১০]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং করবেন তাদের সকলের খাদ্যের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেছেন। কৃষি কাজের মাধ্যমে এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে খাদ্যশস্যের সংস্থান করা মানবজাতির কর্তব্য।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا

৯. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ* (বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৯ খ্রি.), হাদীস নং ১৭২৬৫; আলাউদ্দীন আলী ইবন হিসাম উদ্দীন আল-মুতালাক্কা আল-হিন্দী আল-বুরহানপুরী, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আক্বওয়াল ও আফ'আল* (বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮১ খ্রি.), হাদীস নং ৯১৯৬, ২ খ., পৃ. ৪।

১০. সূরা হূদ : ৬।

"বরং তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের নেই।"[১১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

"তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য পানীয় এবং তা থেকে হয় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা জন্তু চরাও।"[১২]

অন্যত্র তিনি বলেন,

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"তার (বৃষ্টিধারা) দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল, যায়তুন, খেজুর, আঙুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের জন্য নির্দশন রয়েছে।"[১৩]

কৃষির উপর নবী করীম (সা) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন, "জমির লুকায়িত ভাণ্ডারে খাদ্যের অনুসন্ধান করো।"[১৪] এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা জমির মধ্যে যে খাদ্যাভাণ্ডার লুকিয়ে রেখেছেন তা কৃষি কাজের মাধ্যমে উদ্ধার করার দায়িত্ব মানুষেরই।

রাসূল (সা) কৃষি কাজকে একটি পুণ্যের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যারা ফলের ও শস্যের গাছ লাগায় তারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে। হাদীসে এসেছে নবী করীম (সা) বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ .

"যখনই কোন মুসলিম গাছ অথবা শস্য রোপণ করে এবং তা থেকে যদি কোন মানুষ, পাখি, পশু, তাদের আহার্য গ্রহণ করে তখন রোপণকারীর পক্ষে এটি একটি সাদাকা হিসেবে পরিগণিত হয়।"[১৫]

---

১১. সূরা আন-নামল : ৬০।

১২. সূরা আন-নাহল : ১০।

১৩. সূরা আন-নাহল : ১১।

১৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুশায়রী আন-নিসাপুরী, সহীহ মুসলিম (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), হাদীস নং ২৩৫০।

১৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫ম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), হাদীস নং ২৩২০।

তাই বলা যায় যে, কৃষি কর্মের উপর আল-কুরআন যে অর্থপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত প্রদান করেছে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নবী করীম (সা) ও তাঁর সাহাবাগণ কৃষিক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার দ্বারা আরব উপদ্বীপ ও আরব উপদ্বীপের বাইরের দেশেও কৃষি ব্যবস্থায় ব্যপক তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি সাধিত হয়।

কৃষি কাজ একটি উত্তম কাজ। এ কাজে নিয়োজিত থেকে নিজের পরিবারের এবং দেশের মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আর এ কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় করতে হবে। কেননা কৃষি কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব।

যুগে যুগে কৃষির উন্নয়ন

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। এতে কৃষি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত মানবজীবনের সবকিছুই সন্নিবেশিত হয়েছে। কৃষি মানুষের জীবনধারণের অন্যতম মৌলিক চালিকাশক্তি। এটি ছাড়া আল্লাহর জমিন থেকে খাদ্য উৎপাদন সম্ভব নয়। যা আল্লাহর রাসূল (সা.) স্বয়ং করেছেন। তাঁরই পথনির্দেশনা অনুসারে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)ও কৃষি কাজের সম্প্রসারণ করেছেন। যা খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলেই প্রতীয়মান হয়। নিম্নে রাসূল (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের কৃষি কাজের উন্নয়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

রাসূল (সা)-এর সময়ে কৃষির উন্নয়ন

বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আল্লাহর নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলার মানুষকে দেয়া তাঁর অপার অনুগ্রহ, উৎস ও উপকরণসমূহ উল্লেখ প্রসঙ্গে জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষি কাজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَهُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

"তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপাদন করেছি এবং আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি যা নুয়ে থাকে এবং আঙুরের বাগান, যায়তূন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন বিভিন্ন গাছের প্রতি লক্ষ্য করো যখন সেগুলো ফলন্ত হয়। এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য করো, নিশ্চয় এগুলোতে নির্দশনা রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।"[১৬]

১৬. সুরা আল-আনআম : ৯৯।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُوْنٍ - وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِيْنَ

"আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার ওপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উন্নত করেছি। আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যও যাদের অন্নদাতা তোমরা নও।"[১৭]

সুতরাং বলা যায় যে, কৃষি কাজের জন্য কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও উৎসাহব্যঞ্জক বাণী রয়েছে। কৃষিকে নিজের অনুগ্রহেই আল্লাহ তা'আলা সহজ করে দিয়েছেন। যে কেউ কৃষি কাজের মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে অতিরিক্ত অর্থ হাসিল করতে পারে। কেননা কৃষি উৎপাদনকে বিশ্ব মানবের প্রতি আল্লাহর একটি বিরাট অনুগ্রহ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। কৃষির উন্নতি বিধানে তৎপর হওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর ফরয। কারণ রাষ্ট্রের নাগরিকদের খাদ্যসামগ্রী যোগাতে ও হেফাযত করতে কৃষির উন্নয়ন ছাড়া অসম্ভব।

অনাবাদী জমি বন্দোবস্ত দান

যদিও আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ এলাকা বালুকাময় মরুভূমি ছিল। কিন্তু রাসূল (সা) মদীনা রাষ্ট্র গঠন করার পর রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে চাষাবাদের জন্য বহু অনাবাদী জমি বন্দোবস্ত দান করেন।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন,

قَالَ عُمَرُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

"ওমর (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী জমি আবাদ করবে সে তার মালিক হবে।"[১৮]

আবাদযোগ্য ভূমি চাষের জন্য উৎসাহ প্রদান

আবাদযোগ্য ভূমি যেন অনাবাদি না থাকে সেই কল্পে চাষাবাদের প্রতি রাসূল (সা) উৎসাহ ও গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

"কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপণ করে অথবা কোন খাদ্য-শস্যের চাষ করে অতঃপর ঐ বৃক্ষের ফল বা উৎপাদিত শস্য হতে মানুষ, পশুপাখি বা অন্য জীবজন্তু আহরণ করে, তাতে ঐ ব্যক্তির সাদকার নেকী লাভ হয়।"[১৯]

---

১৭. সুরা আল-হিজর : ১৯-২০।

১৮. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ২১৬৭।

১৯. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ২৩২০।

চাষযোগ্য জমি বণ্টন

রাসূল (সা) কৃষিকে বিস্তার করার জন্যে এতটায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর নিজ জমি থেকেও জনসাধারণের মধ্যে কৃষি উৎপাদনের জন্য চাষযোগ্য জমি বণ্টন করে দেন। আর এই জমি সম্পর্কে ইমাম যুহরী বলেন, "আল্লাহ তা'আলা নবী করিম (সা)-কে যে সমস্ত জিনিস দিয়েছেন, বনী নাযিরদের সম্পত্তি তার অন্যতম যা ইতঃপূর্বে কারো দখলে বা মালিকানায় যায়নি। কাজেই তা রাসূলে করীম (সা)-এর সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়। কৃষি কাজের জন্য তিনি সে ভূমি মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। আর আনসাদেরকে এই জমির মালিকানা বা অংশ প্রদান করেন।"[২০] বনী নাযীর গোত্রের জমি সম্বন্ধে হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, "বনী নাযীর গোত্রের দখলে যে জমি ছিল তা আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা)-কে যে সমস্ত জিনিস দিয়েছেন তার অন্যতম। এ জমি কোন মুসলিম ভোগ দখলে যায়নি বা মালিকানা অর্জন করেনি, এটা রাসূল (সা) এর সম্পত্তি ছিল। এ সম্পত্তি থেকে তিনি নিজের খরচ বহন করতেন ও অবশিষ্ট দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ঘোড়া এবং অস্ত্র ক্রয় করতেন।"[২১]

উপর্যুক্ত বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ আছে যেখানে আল্লাহ তা'আলা বনী নাযীর গোত্রের সম্পত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلٰى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلٰكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আল্লাহ তা'আলা বনী নাযীর গোত্রের নির্বাসিত ইহুদীদের সম্পত্তি তাঁর রাসূলকে ফায় হিসেবে দিয়েছেন তার জন্যে তোমরা কেউ ঘোড়া কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, আল্লাহ তো যার উপর চান, তাঁর রাসূলদের কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।"[২২]

সেচ ব্যবস্থা ও কৃষি পরিদর্শক নিযুক্তকরণ

খাদ্য চাহিদা পূরণ ও অধিক শস্য ফলানোর জন্য রাসূল (সা) কৃষি জমিতে সেচ ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং সাহাবীগণকে এ ব্যাপারে একে অপরের সাহায্য করার জন্য উপদেশ প্রদান করেছেন। নবী করীম (সা) সাহিবুল হিমা বা চারণভূমির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও নিয়োগ দান করেন। হিমা শব্দের অর্থ রক্ষা করা বা আশ্রয় দেয়া এবং বিশেষ অর্থে বোঝায় পশুচারণ ভূমি। মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাসূল (সা) রাজধানী শহরের বাইরে কিছু জমি মুসলমানদের হিমারূপে চিহ্নিত করে দেন। সেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গবাদিপশু চরত। গবাদিপশু রক্ষা ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের রোধ করার জন্যে নবী করীম

২০. ইয়াহ্ইয়া বিন আদম, *কিতাবুল খারাজ* (কায়রো: দারুস শুরূক, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১৩৪।

২১. পূর্বোক্ত।

২২. সূরা আল-হাশর : ৬।

(সা) কয়েক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন। বিভিন্ন আমলে সংরক্ষিত আরো অনেক পশুচারণ ভূমি ছিল।"[২৩]

কৃষি উন্নয়নে রাসূল (সা.)-এর বিভিন্ন নির্দেশনা

নবী করীম (সা) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে কৃষির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। জনগণকে কৃষির প্রতি আগ্রহী করা এবং কৃষির গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্যে তিনি কৃষির অনেক গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সা) বলেছেন, "জমির গভীরে গিয়ে জীবিকার অন্বেষণ করো।"[২৪]

কৃষির উন্নয়ন ছাড়া রাষ্ট্রের খাদ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অকল্পনীয়। রাসূল (সা)-এর শাসনামলে মদীনা কৃষি কাজে সমৃদ্ধ ছিল। নবী করীম (সা) এর উৎসাহ পেয়ে কৃষি ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি সাধিত হয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মদীনার অনসারগণ তাদের জমিতে চাষাবাদ ও বাগানের কাজে ব্যস্ত থাকত। মদীনার ফল ও ফসলের মধ্যে খেজুর ছিল প্রধান এছাড়া আনজির, আঙুর, আনার প্রভৃতি ফলও উৎপাদিত হতো।[২৫] তবে মদীনার সব জমিই উর্বর ও উৎপাদনশীল ছিল না, কিছু জমি শুষ্ক ও অনুর্বরও ছিল। সেখানে বীজ থেকে অঙ্কুরিত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া ও ফসল ফলার জন্য পানি ও উর্বরতার প্রয়োজন ছিল। তাই তারা বৃষ্টির পানি জমিয়ে রাখত এবং প্রয়োজনে তা দিয়ে সেচ কার্য সম্পাদন এবং জমি উর্বরতার জন্যে গবাদী পশুর বিষ্ঠা ব্যবহার করত। নবী করীম (সা)-এর শাসনামলে পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও অগ্রগতির ব্যবস্থা হয়। মদীনার কৃষি জমিতে ফসল ফলানোর জন্য পানি সেচ দেয়া হতো, বৃষ্টির পানির স্বাভাবিক প্রবাহ এবং কুয়া ও ডোবার পানি দ্বারা। আল্লাহর বাণী তাদের কাছে ছিল অনুসরণীয়, তাই মদীনার কৃষকগণ মহান আল্লাহ প্রদত্ত পানির যথাযথ ব্যবহার করত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ - يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"তিনি তোমাদের জন্য আসমান থেকে নাযিল করেন পানি। তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য পানীয়, তাতেই জন্মায় গাছ-গাছালি উদ্ভিদ, যাতে তোমরা চরিয়ে থাক পশু। তা

২৩. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, রাসূল মুহাম্মদ সা. এর সরকার কাঠামো (ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২৯৩-২৯৫

২৪. সহীহ আল-মুসলিম হাদীস নং ২৩৫০।

২৫. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা: এম. আবদুল্লাহ্ এন্ড সন্স, ২য় সংস্করণ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩০২।

থেকেই তিনি তোমাদের জন্মান শস্য, যায়তুন, খেজুর গাছ, আঙুর এবং সব রকমের ফলাদি। চিন্তাশীল লোকদের জন্য অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন।"[২৬]

নবী করীম (সা) মদীনা রাষ্ট্রের জন্য যে সকল নীতি প্রণয়ন করেছেন তার মধ্যে কৃষিনীতি অন্যতম। এই কৃষিনীতি শুধু ফসল উৎপাদনেই নয়, বরং ভূমি ও উৎপাদিত ফসল ভোগ ও বণ্টনের বিস্তারিত ব্যবস্থা ছিল। নবী করীম (সা) কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে কৃষি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই তার শাসনামলেই এই কৃষিনীতি নিষ্ঠার সাথে অনুসৃত হয়েছিল।

খোলাফায়ে রাশেদীনদের সময়ে কৃষির উন্নয়ন

খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রে কৃষির প্রচুর উন্নতি ও কৃষিভিত্তিক সঙ্কংকার করা হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরনো নদী ও খাল পুনঃখনন, চাহিদা অনুযায়ী নতুন খাল খনন, বাঁধ তৈরীর মাধ্যমে পানি জমা রাখা, বন্যার হাত থেকে কৃষি জমি রক্ষা করা এবং কৃষির উন্নয়নের জন্য সার্বিক সহায়তা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে বন্যা কবলিত ফসলি জমি ও অনাবাদি ভূমি চাষের উপযুক্ত হয়, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বহগুণে বৃদ্ধি পায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুদৃঢ় হয়।

ক. হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সময়ে কৃষি

হযরত আবূ বকর (রা.) নবী করিম (সা)-এর প্রর্দশিত পথ অনুসরণ করে ইসলামী রাষ্ট্রের কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। খলিফা আবূ বকর (রা.) তাঁর শাসনামলে রাষ্ট্রের মালিকাধীন কিছু কিছু জমি উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ বায়তুলমালে জমাদানের শর্তে ইজারা দিয়েছিলেন। তিনি আবাদি জমি জায়গিরও প্রদান করেন। তিনি হযরত মুজ্জাআহ (রা.)-কে হাদরামাওত নামক একটি ভূমি জায়গির প্রদান করেন।"[২৭] এছাড়াও তিনি হযরত আকরা ইবন হাবিস ও উয়াইনা ইবন হিসন আলা ফাযারী (রা.)-কেও ভূমি জায়গির প্রদান করেন।[২৮]

তবে কোনো ভূমি যদি জায়গির বা ইজারা দেয়া হতো, আর সে ভূমি অনাবাদি ফেলে রাখলে তার জায়গির বা ইজারা বাতিল হয়ে যেত এবং ভূমি ফেরত নিয়ে অন্য কাউকে চাষাবাদের জন্য জায়গির বা ইজারা দেয়া হতো। তাই জমি হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে সে চাষাবাদ করত, এতে তার উৎপন্ন ফসল নিজ চাহিদা মিটিয়ে পাশের লোকের নিকট বিক্রয় করত।

---

২৬. সুরা আন-নাহল : ১০-১১।

২৭. আবু নুআয়েশ, *মাআরিফুস সাহাবাহ* (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), হাদীস নং ৫৭১৬, উদ্ধৃতঃ ড. আহমদ আলী, আবূ বকর আছ ছিদ্দীক (রা.), বিআইসি, ঢাকা, অক্টোবর ২০১৩, পৃ. ৩৭২।

২৮. ইবনু হাজার, *আল ইসাবাহ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬।

হযরত আবূ বকর (রা.) কৃষি জমিতে সেচ কাজের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি ও রাষ্ট্রের খাদ্যের চাহিদা পূরণ হয়।[২৯]

খ. হযরত উমর (রা.) এর সময়ে কৃষি

হযরত উমর (রা.) নবী করিম (সা) ও আবূ বকর (রা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উন্নতি কল্পে কৃষি কার্যের ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াসে তিনি আইন প্রণয়ন করেন এবং চাষিদের মধ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারি পর্যায়ে সকল প্রকার সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করেন।[৩০] নিম্নে কৃষিক্ষেত্রে তাঁর কতিপয় কর্মপন্থা উল্লেখ করা হলো:

জমি ইজারাদান: আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারূক (রা.) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেন। কখনো কোনো ইজারা গ্রহণকারী যদি কৃষি জমি অনাবাদি অবস্থায় ফেলে রাখত তাহলে তিনি তার ইজারা বাতিল করে দিতেন। তিনি কৃষি উৎপাদনে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, কেউ স্বীয় মালিকানাধীন জমিও তিন বছর অনাবাদি ফেলে রাখলে সে জমি চাষাবাদে সক্ষম অন্য কাউকে দিয়ে দেয়া হতো।[৩১] এ থেকেই বুঝা যায় যে খলীফা উমর (রা.) কৃষি উৎপাদনকে বৃদ্ধি করার জন্য কতটা কঠোর ও সথেষ্ট ছিলেন। তাই তার এরূপ প্রচেষ্টার ফলে রাষ্ট্রের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয়।

কৃষি জমি পৃথকীকরণ ও কৃষির গুরুত্ব: হযরত উমর (রা.) বিজিত অঞ্চলসমূহে প্রচলিত নিবর্তনমূলক কৃষি ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে তাঁর শাসনাব্যবস্থায় একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি কৃষি জমিসমূহ চিহ্নিতকরণ বা সুনির্দিষ্ট করার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং কৃষির প্রতি গুরুত্ব প্রদানে একটি আইন প্রণয়ন করেন, "অনধিক তিন বছর কোন জমি অনাবাদি পড়ে থাকলে তা রাষ্ট্রীয়ভাবে বাজেয়াপ্ত করা হবে।"[৩২]

ভূমি জরিপ ও কৃষিঋণ ব্যবস্থা: হযরত উমর (রা.) কৃষিকাজের উন্নতির জন্য সিরিয়া, মিশর, ইরাক ও দক্ষিণ পারস্যসহ তাঁর রাজ্যের প্রায় সব জমি জরিপ করান এবং তার সময়ে পর্যাপ্ত কৃষিঋণ দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদেরকে উৎসাহিত করতেন।

জমি ফেরত: কৃষি কাজ করার সুযোগদান ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি সুবিধা বঞ্চিত মানুষদেরকে বিশেষ সুযোগ দান করেন। যেমন- রোমান ও পারসিকদের শাসনকালে যারা জমিজামা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল খলীফা তাদের সে সব জমি ফেরত দিয়ে কৃষি কাজ করার

---

২৯. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-কুরআনে কৃষি 'সেমিনার স্মারক'* (ঢাকা: এগ্রিকালচারিস্টস' ফোরাম অব বাংলাদেশ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২০।

৩০. মুহাম্মদ নূর উল্লাহ আযাদ, *হযরত ওমর ফারুক (রা.)* (ঢাকা: সোলেমানিয়া বুক হাউজ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১৪৫।

৩১. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬।

সুযোগ করে দেন। তবে তা ব্যক্তি মালিকানাধীন হয়ে যেত না। শুধু উৎপন্ন ফসল ভোগ করে তার পরিবার পরিজনের অভাব মেটাতে পারত। জায়গির বা ইজারা দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জমির চাষাবাদ বাড়ানো।[৩৩]

সেচব্যবস্থার উন্নয়ন: হযরত উমর ফারূক (রা.) কৃষিকাজের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের সুবিধার্থে বেশ কয়েকটি প্রকল্প প্রণয়ন করেন, তার মধ্যে সেচপ্রকল্প ছিল অন্যতম। তিনি বেশ কিছু খাল খননের মাধ্যমে পানি সেচের ব্যবস্থা করেন। যেমন- আবূ মূসা টাইগ্রীস (দজলা) নদী থেকে বসরা পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাইল খাল কেটে পানি সংকট দূর করেন। এ খাল থেকে বসরার নাগরিকদের সেচের ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ খালটি নহর-ই মূসা নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া মাকবূল বিন ইয়াসির-এর তত্ত্বাবধানে দজলা নদী থেকে পারস্যে (বর্তমান ইরান) নহর-ই-সাদ এবং একই নদী থেকে ইরাকে নহর ও মালিক নামক খাল খনন করা হয়। আরো একটি খাল উমর (রা.)-এর পরামর্শে খুজিস্তানের গভর্নর আল জুয বিন মু'আবিয়া সেখানে কয়েকটি খাল খনন করেন। মিসরের গভর্নর হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) খলীফার অনুমতিক্রমে ৬৪৩ সালে একটি বৃহৎ খাল খনন করেন, এটি 'আমীরুল মুমিনীন খাল' নামে সুপরিচিত লাভ করে। এই খাল খননের মাধ্যমে নীল নদের সাথে লোহিত সাগরের সংযোগ স্থাপিত হয়। এই খালগুলো খননের মূল লক্ষ্য ছিল আরব দেশের বিশাল অনাবাদি শুষ্ক জমি উদ্ধার করে পানি সেচের মাধ্যমে চাষাবাদযোগ্য করে তোলা। এই পানি সেচব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত হওয়ার জমির উর্বরতা বেড়ে যায়, যার ফলে কৃষি উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক মাকরিযীর বর্ণনা মতে, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতেকালে শুষ্ক মৌসুমে দৈনিক এক লক্ষ বিশ হাজার শ্রমিক সেচ প্রকল্পে কাজ করত এবং তাদেরকে নিয়মিত বেতন দেয়া হতো।[৩৪]

বাঁধ নির্মাণ: হযরত উমর ফারূক (রা.) কৃষি উন্নয়নের সুবিধার্থে শুধু বেশ কয়েকটি খাল খননই করেননি, তিনি বর্ষা মৌসুমে কৃষি জমিকে প্লাবনের হাত থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থাও করেন। তিনি ফোরাত ও দজলা প্লাবনের হাত থেকে উপকূলবর্তী কৃষি ভূখণ্ড রক্ষার জন্য এই দুটি নদীর তীরে বেড়িবাঁধ নির্মাণ করেন। এ বাঁধ নির্মাণ কাজ তদারকি করেন তৎকালিন মুসলিম প্রকৌশলীগণ।[৩৫]

গ. হযরত উসমান (রা.) এর সময়ে কৃষি

ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনী (রা.) নবী করিম (সা) আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.) এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে তিনিও ইসলামী রাষ্ট্রের কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। হযরত উসমান (রা.) তাঁর সময় কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।

---

৩৩. পূর্বোক্ত।

৩৪. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

৩৫. মুহাম্মদ নূর উল্লাহ আযাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

তিনি সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

কূপ ক্রয়: হিজরতের পর মুসলমানদের সুপেয় পানির অসুবিধা দূর করার জন্য হযরত উসমান (রা) মদীনায় সুবৃহৎ কূপ রূমা কূপ ২০,০০০ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে সকল মুসলিমের জন্য ওয়াকফ করে দেন। এতে যেমন সুপেয় পানির অভাব দূর হয় তেমনি স্বল্প পরিসরে কৃষি কাজেও ব্যবহৃত হতো।[৩৬]

খাল পুনঃখনন: হযরত উসমান গনী (রা.) মদীনায় অবস্থিত বনাতলা ইলাহ নামক খাল পুনরায় খনন করে এ থেকে আরমায় পানি সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করেন এবং এর নিকটবর্তী অঞ্চলকে পানি সেচের মাধ্যমে চাষযোগ্য করে তোলেন, যার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

বাঁধ নির্মাণ: হযরত উসমান (রা.) স্বীয় শাসনামলে মদীনায় বন্যা প্রতিরোধের জন্য একটি বড় বাঁধ নির্মাণ করেন। এ বাঁধটি মাহরুজ বাঁধ নামে সুপরিচিত ছিল। এই বাঁধ নির্মাণ করে তিনি মদীনার কৃষি জমি ও নগরীকে প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করেন, যার ফলে মদীনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

উমাইয়া খিলাফতে কৃষির উন্নয়ন

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি উন্নয়নে উমাইয়া শাসকগণ কৃষির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব এবং কৃষি উন্নয়নে জোর প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখেন। যার ফলে তারা কৃষিতে সফলতা অর্জন করেন। উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মু'আবিয়া (রা.) তাঁর রাজ্যের সকল অনাবাদি জমি চাষাবাদের যোগ্য করে তোলার জন্য ও কৃষির আওতায় আনার জন্য নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেন। নিম্নে কয়েকটি কর্মপন্থা উল্লেখ করা হলো:

সেচব্যবস্থা: উমাইয়া শাসকগণ কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি বৃদ্ধির জন্য পানি সেচের নানাবিধ সুব্যবস্থা করেন, যার মধ্যে কূপ ও খাল খনন অন্যতম।

কূপ খনন: উমাইয়া শাসকগণ কৃষি ফসল বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি সেচের জন্যে অনেক কূপ খনন করেন এবং কৃষকগণ তা থেকে পানি সেচকার্য করার ফলে গম, খেজুর ও অন্যান্য কৃষি ফসল বৃদ্ধি পায়।

খাল খনন: উমাইয়া শাসনামলে কৃষি ফসল বৃদ্ধির জন্য পানি সেচের সুব্যবস্থা কল্পে অনেক খাল খনন ও পুনঃখনন করা হয়। হযরত উমর (রা.) এর সময়ে খননকৃত মালিক নামক খালটি হযরত মু'আবিয়া (রা.) আরো গভীর করে পুনরায় খনন করে পানি সেচের গতি আরো বৃদ্ধি করেন। মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আশ্-শুহাদা, আজরাক ও কাযিমাহ নামক খাল খনন করে হযরত মু'আবিয়া (রা.) কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেন। এতে মদীনার নিকটবর্তী কৃষি জমি গুলোতে

৩৬. ইবনু হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী* (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪০৮।

গম, যব, খেজুর সহ বিভিন্ন ফসল বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এর পরবর্তী শাসক ইয়াযীদ একটি খাল খনন করেন, যার নামকরণ করা হয় 'নহর-ই ইয়াযীদ'। আর এ খালের পানি দিয়ে নতুন আরো অনেক জমি সেচের আওতাভুক্ত হয়।[৩৭]

এরপর খলীফা আবদুল মলিকের আমলে তাঁর রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে কৃষি কাজের উন্নতির জন্য পূর্বাঞ্চলীয় গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খাল খনন করেন। তিনি এই আন নাইল খাল খননের মাধ্যমে দজলা ও ফোরাত নদী দুটিকে সংযোগ করেন, যার ফলে দুটি নদীর পানির প্রবাহ সমান্তরাল থাকত এবং সারা বছর এসকল অঞ্চলের কৃষকগণ সেচকার্য চালাতে পারত। এছাড়াও আবদুল মালিক আয-যাভী নামক আর একটি বিখ্যাত খাল খনন করেন। উমাইয়া শাসকগণ কৃষি সেচের জন্য প্রচুর কূপ ও খাল খনন করেন, যার ফলে কৃষি উৎপাদন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

বাঁধ নির্মাণ: বাঁধ নির্মাণ শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যেই হয় না, অনেক সময় পানি জমিয়ে রাখার জন্যও বাঁধ নির্মাণ করা হয়। উমাইয়া খলীফাগণ কৃষি জমিতে পানি সেচ করার উদ্দেশ্যে পাহাড়ি অঞ্চলে কিছু বাঁধ নির্মাণ করেন এবং প্রয়োজনে সেই পানি কৃষি জমিতে ব্যবহার করা হয়, এতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে ফোরাত ও দজলা নদীর বন্যায় খালের তীর ভাঙ্গন ও কৃষি জমি প্লাবিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্যে শাসকগণ বিভিন্ন স্থানে বাঁধ নির্মাণ করেন। ফোরাত ও দজলা নদীর তীরে বাঁধ নির্মাণ ও পানি সেচ কাজের প্রকল্প প্রকৌশলী হাসান আল নাবাতির নকশা অনুসারে উমাইয়া শাসনকাল ৭০৫-৭১৫ এবং ৭২৪-৭৪৩ সালে সমাপ্ত করা হয়। যার ফলে বহু কৃষি জমি বন্যা ও শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা পায় এবং কৃষি কাজ সহজ হয়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।[৩৮]

কৃষি কাজে গবাদিপশু ব্যবহার ও সংরক্ষণ: উমাইয়া শাসনামলে কৃষি কাজের জন্য গরু, মহিষ ও ঘোড়ার ব্যবহার বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সে সময়ে চাষাবাদের কাজে সহায়তার জন্য ভারত থেকে মহিষ আমদানি করা হয়। এছাড়াও চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত ষাঁড় জবেহ করা নিষিদ্ধ করা হয়।[৩৯] যার ফলে ঘোড়া, ষাঁড় ও মহিষ কৃষি কাজের জন্য সংরক্ষিত হয় এবং কৃষি কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে।

আব্বাসীয় খিলাফতে কৃষি উন্নয়ন

৩৭. মাওলানা নূরুদ্দীন, *মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান রা.* (ঢাকা: মীনা বুক হাউস, ১ম সংস্করণ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১৭৯।

৩৮. মাওলানা নূরুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.২২১।

৩৯. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০।

আব্বাসীয় খিলাফতের যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষির অবদান ও গুরুত্ব ছিল ব্যাপক। ইরাকের ভূখণ্ড ছিল খুবই উর্বর এবং তা 'আল সাওয়াদ' নামে পরিচিত ছিল। কৃষির জন্য খুবই উর্বর ছিল মেসোপটেমিয়া, দজলা-ফোরাত নদীর তীর। আব্বাসীয় শাসকগণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কাজ করেন। এর মধ্যে ভূমি জরিপ, পুরনো খাল সংস্কার, নতুন কূপ ও খাল খনন এবং পানি নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা করে কৃষির ব্যপক পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য।[৪০] নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হলো:

ভূমি জরিপ: রাষ্ট্রীয়ভাবে কৃষিকে উন্নয়ন করতে হলে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রথমেই রাষ্ট্রের আবাদি-অনাবাদি জমি এবং জমির প্রকার, মোট জমির পরিমাণ, সেচ ব্যবস্থার উপায় এছাড়াও বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে এবং বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে জমি জরিপ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভূমি জরিপের মাধ্যমেই অবগত হওয়া যায় যে, রাষ্ট্রের ভূমির ধরণ কেমন। তাই সেই লক্ষ্যেই আব্বাসীয় শাসকগণ তাদের শাসনাধীন সকল অঞ্চলের ভূমিসমূহে জরিপ কর্মসূচী পরিচালনা করেন।

অনাবাদি বা পতিত জমির ব্যবস্থা: আব্বাসীয় আমলে ভূমিহীনদের শুমারি করা হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীনদের মধ্যে পতিত জমি বিলি বণ্টন করা হয় এবং রাজস্ব মাপ করা হয়। শর্ত ছিল শুধু জমি চাষ করতে হবে। এর ফলে যেমন ভূমিহীনরা জমির মালিকানা পায় তেমনি কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে অবদান রাখার সুযোগ পায়।

সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন: আব্বাসীয শাসকগণ সেচব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন কূপ ও খাল খনন, পুরনো খাল সংস্কার এবং সেচ ব্যবস্থার সাথে জড়িত কাজগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেন এবং সরকারি কাজের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কূপ ও খাল খনন এবং সংস্কারের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাকে প্রাধ্যান্য দেন। খলীফা আবূ জাফর আল মনসূর (শাসনকাল-৭৫৪-৭৭৫ সাল) নহর ঈসা, নহর সারগার ও নহর আল মালিক নামে তিনটি প্রধান খাল কাটেন, যার মাধ্যমে কৃষিকার্যে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সেচ ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় বাগদাদের প্রধান কাযী আবূ ইউসুফ (র.) এক প্রতিবেদনে কৃষিকাজের উন্নয়নের জন্য যে কোনো মূল্যে কূপ ও খাল খননকে সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিক কাজ বলে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।[৪১]

আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশীদ (শাসনকাল ৭৮৬-৮০৯ সাল) এর গৌরবময় শাসনকালে তার স্ত্রী সম্রাজ্ঞী জুবাইদা হজ্জব্রত পালনে মক্কায় আগত মুসলমানদের পানির কষ্ট দূর করার জন্য ১ লক্ষ দীনার ব্যয়ে পঁচিশ মাইল দূর হতে একটি খাল খনন করে পবিত্র নগরীতে

৪০. মাহবুবুর রহমান, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশসমূহ ৭৫০-১২৫৮* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১ম সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৮-১০।

৪১. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩১২।

পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এই খাল 'নহর-ই-জুবাইদা' নামে প্রসিদ্ধ। এটি নিঃসন্দেহে সম্রাজ্ঞী জুবাইদার ধর্মনিষ্ঠার পরিচায়ক। এই খাল মক্কার কৃষিকাজেও গতিসঞ্চার করে।[৪২]

ফোরাত নদী তথা ইউফ্রেটিস থেকে পুরনো খালের পুনঃখনন বা নতুন খাল খনন করে উন্নত সেচ ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও সেচকল্পে 'নহর-ই কুছা' এবং 'বৃহৎ সারাহ' এই দুটি নদী থেকে একাধিক খাল খনন করে সেই অঞ্চলগুলোর মধ্যে আরো শাখা খাল খনন করে ব্যপক কৃষি সেচকার্য সম্পাদন করা হয়, যার ফলে উক্ত অঞ্চলে কৃষি বিপ্লব ঘটে।

কৃষি ঋণ প্রদান: কৃষিকার্য সম্পাদনের জন্য বেশ অর্থের প্রয়োজন, যা সাধারণ কৃষকের জন্য অনেক কষ্ট সাধ্য বা প্রায় অসম্ভব। এ বিষয়টি মাথায় রেখে চাষিদেরকে কৃষিকাজের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে আব্বাসীয়গণ বিনা সুদে ঋণ প্রদান করেন সহজেই কৃষকগণ তার কৃষিকার্য সম্পন্ন করে আর্থিক সচ্ছলতা পান এবং যতটুকু ঋণ প্রদান করা হতো ততটুকুই ফেরত নেয়া হতো।

কৃষিপ্রযুক্তি: আব্বাসীয় শাসনামলে ইউরোপ ও চীন এবং মধ্য এশিয়া অঞ্চলের সাথে সু-সম্পর্কের ফলে বিশ্বের উন্নত কৃষিপ্রযুক্তির ধারণা ও প্রশিক্ষণ আরব, ইরাক, ইরানের কৃষকরা গ্রহণ করে, যার ফলে কৃষিতে আধুনিককায়ন সম্ভব হয়।

ফল-ফসল ও ফুল উৎপাদন: ইরাক বা মেসোপোটেমিয়াই ছিল আব্বাসীয় শাসনামলে কৃষি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। এখানে ধান, বার্লি, গম, তিল, আখ, খেজুর, শন, বাদাম, কমলালেবু, শিম, বেগুন, তুলা ইত্যাদি ফল উৎপাদিত হতো। সে সময় বিজ ফসল উৎপাদনের জন্য খুরাসান ছিল সমৃদ্ধ, এখানে কমলালেবু, আতা, পিচফল, খেজুর, আপেল, আঙ্গুর, আম, জলপাই, বেগুন, ডুমুর ইত্যাদি বিজ ফসল উৎপাদিত হতো। মিশর, ফারস ও আল আহওয়াযে আখ চাষ হতো, খাওয়ারিজমে তরমুজ হতো। এছাড়াও সে সময় দামেস্ক ফল ও ফুল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। ফুলের মধ্যে রাজা ছিল গোলাপ। সেই সময় প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ফুলগাছ ও বাগান করা হতো। জুঁই, ডায়োলেট, সানফ্লাওয়ার, মেহেদি ফুল, ডেফোডিল, বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হতো। আব্বাসীয় যুগে ফুলের বেশ কদর ছিল এবং ফুল চাষে সৌখিন বাগান মালিকরা অনুরাগী ছিলেন, এটি ইতিহাস থেকে জানা যায়।[৪৩]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মানুষসহ সকল প্রাণীর খাদ্যের দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন এবং পৃথিবীর আনাচে-কানাচে খাদ্যবস্তু ছড়িয়ে রেখেছেন, তাই সেগুলো সংরক্ষণের মাধ্যমে মানুষ ও অন্য প্রাণীকুলের খাদ্যচাহিদা মেটানো মানুষের কাজ। এই সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন,"জমির লুকায়িত ভাণ্ডারে খাদ্যের অনুসন্ধান করো।"[৪৪] আর এই কাজকে কৃষিকাজ বলা হয়।

---

৪২. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরি, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৩১৯।

৪৩. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১২।

৪৪. *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৩৫০।

নবী করীম (সা) এই মহৎ কৃষি কাজকে উৎসাহ দিয়ে বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

"কোন মুসলিম যখন কোন কিছু রোপন করে অতঃপর তা থেকে কোন মানুষ অথবা কোন চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তা রোপনকারীর জন্য সাদাকার সমতুল্য সাওয়াব হয়।"[৪৫] রাসূল (সা) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কোন বৃক্ষ রোপন করল আল্লাহ তার জন্য একটি প্রতিদান নির্ধারণ করে রেখেছেন সে গাছ থেকে ফল বের হোক বা না হোক।"[৪৬] এছাড়াও হাদীসে কৃষি কাজকে সাদকায়ে জারিয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন, "সাতটি বিষয়ে আমলের প্রতিদান মৃত ব্যক্তির কবরেও প্রদান করা হবে। যেমন শিক্ষা দেয়া, নদী ও কূপ খনন করা, খেজুর গাছ লাগানো, মসজিদ নির্মাণ করা, মাসহাফের অধিকারী এবং এমন সন্তান দুনিয়ায় রেখে যাওয়া যে সন্তান ঐ ব্যক্তির ইন্তিকালের পর তার জন্য দু'আ করবে।"[৪৭] আর এভাবেই কৃষি কাজকে কুরআন ও হাদীসে একটি উন্নত পেশা হিসেবে গণ্য করে, কৃষির প্রতি ব্যাপক গুরুত্ব ও অগ্রধিকার প্রদান করা হয়েছে। যার সুফল নবী করীম (সা) থেকে শুরু করে সাহাবী (খোলাফায়ে রাশেদীন) এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাগণের মাধ্যমে ব্যাপকতা লাভ করেছে।

৪৫. *সহীহুল বুখারী* হাদীস নং ২৩২০; ইমাম তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত* (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), ৯ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৯৮৭, পৃ. ১৪।

৪৬. ইমাম তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর* (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), হাদীস নং ৩৯৬৯, পৃ. ১৪৮।

৪৭. ইমাম আল-বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৩৪৪৯, পৃ. ২৪৮।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬১ বর্ষ ১ম- ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.

গুজব প্রতিরোধে ইসলাম : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. মোঃ নজরুল ইসলাম*
মো. জাফর আলী**[১]

[Abstract: *As a social being, people exchange information with each other in order to live in a society. Information should never be misinterpreted at the time of exchanging because any rumor can be spread by wrong information. As a result, many lives and property may be damaged; nasty incidents like loss of respect can happen. As Islam is a universal way of life, there is no room for rumors. Islam has instructed that if anyone gives any news, its truth should be verified and propagated. In recent years, various embarrassing situations have been created in Bangladesh due to rumors. Unexpectedly, some people have lost their lives as victims of rumors. Starting from the educated society, the beggars of the path have also been living in fear of rumors. However, if Islamic rules are followed to prevent rumors, it is hopeful to avoid all kinds of unwanted incidents. This article is aimed at ensuring that no one is embarrassed by rumors or dies suddenly.]*

ভূমিকা

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামে অমূলক, অলীক, মিথ্যা, ভ্রান্ত, বিভ্রান্তিমূলক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত কোন তথ্য বা গুজব ছড়ানোর স্থান নেই। কেননা এর মাধ্যমে অশান্তি, অরাজকতা ও অস্থিতিশীল পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে সমসাময়িক সময়ে গুজবের নামে বিভিন্ন রকমের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। যা নিয়ে জনমনে বিভিন্ন রকমের অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে 'ছেলেধরা' সন্দেহে নিতান্ত নিরীহ, নিরপরাধ, মানসিক ভারসাম্যহীন, প্রতিবন্ধী ও নারীসহ অনেক মানুষ গণপিটুনির শিকার হয়ে আহত ও নিহত হয়েছেন। যা অত্যন্ত ভয়ংকর ও দুঃখজনক। অহেতুক গুজব ছড়ানোর ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত যেকোনো ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত তৈরি হয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাব-মূর্তি ক্ষুণ্ন হবারও তীব্র আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানের যুগে গুজব রটানো এবং তা বিশ্বাস করা কোনো সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষের কাজ হতে পারে না। তা সত্ত্বেও বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন

---

[১]* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

** এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; প্রভাষক (আরবি) রামপুর আদর্শ আলিম মাদ্‌রাসা, কামরাঙ্গা, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।

কিছু মানুষ ও অসাধু চক্র ইসলামে নিষিদ্ধ ফিতনা-ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) প্রসারের লক্ষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, স্কাইপি, হোয়াট্সঅ্যাপ, ম্যাসেঞ্জারসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অহেতুক গুজব ছড়িয়ে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটিয়ে অস্থিতিশীল ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে গুজব প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। যথাসময়ে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যত্যয় ঘটলে এর শাখা-প্রশাখা বেড়ে চরম আকার ধারণ করার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়ার মতো নয়। যদিও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও মানুষের সচেতনতার ফলে গুজবের প্রচার-প্রসার অনেকটা মুখ থুবড়ে পড়েছে, তথাপি ইসলামের আলোকে গুজব প্রতিরোধের নানা কৌশল অবলম্বন করে একে সহজেই দমন করা যাবে। ফলস্বরূপ গণপিটুনির শিকার হবে না ভবঘুরে, মানসিক ভারসাম্যহীন, প্রতিবন্ধী, নিরপরাধ, নিরীহ কোনো সাধারণ মানুষ, কোনো তাজা প্রাণ আর অকালে ঝরে পড়বে না, খালি হবে না কোনো মায়ের কোল, বিনা অপরাধে এতিম হবে না কোনো সন্তান! আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামের দৃষ্টিতে গুজব প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।]

গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা

গুজব বিশ্বব্যাপী এক ত্রাস, অসচেতনতা, অস্বাভাবিকতা, অস্থিরতা ও ভয়াবহতার নাম। বাংলাদেশেও গুজবের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার করে গুজব সৃষ্টি করা হচ্ছে আরও বেশি। গুজবের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল(Vested Interest Group)বিভিন্ন সময়ে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে গুজব সৃষ্টি করে। বাজারে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধির অস্থিরতা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক অস্থিরতার মতো চরম অনাকাঙ্ক্ষিত গুজবও সৃষ্টি করা হচ্ছে। সর্বশেষ ভোলায় গুজবের মাধ্যমে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে তাতে ৪ (চার) জন নিরীহ মানুষের প্রাণ গিয়েছে। গুজবের ভয়াবহতার কারণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সবাই এক বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত করছেন। তাই গুজবের এই ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদেরকে সোচ্চার হতে হবে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ, যার অধিকাংশ মানুষ ধর্মপ্রাণ। এসকল নিরীহ মানুষকে ইসলামের দিক নির্দেশনার আলোকে গুজব সম্পর্কে অবহিত করা হলে গুজবের মতো ঘৃণ্য ও অনৈসলামিক কাজ বন্ধ করা সহজ হবে। উপরোল্লিখিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে এই গবেষণার অবতারণা।

গুজবের পরিচয়

গুজব শব্দের অর্থ রটনা, জনশ্রুতি, জনরব।[২] গুজব ছড়ানো মানে ভুল কথা, মিথ্যা তথ্য, ভিত্তিহীন সংবাদ বা বিভ্রান্তিকর খবর ছড়ানো ও অসঙ্গত তথ্য প্রচার করা। গুজবের আরবি

---

[২] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য (সম্পা.), *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি, জানুয়ারি-২০১০, ঢাকা, পৃ. ৩৫৯।

প্রতিশব্দ إشاعة (ইশা'আতু) ও نشر (নাশ্‌রুল আফওয়াহ)।[৩] গুজবের ইংরেজি প্রতিশব্দ RumorওHearsay[৪]এবং ব্রিটিশ ইংরেজি প্রতিশব্দ Rumour.[৫] জনসাধারণের সম্পর্কিত কোন বিষয়, ঘটনা বা ব্যক্তি নিয়ে মুখে মুখে প্রচারিত কোনো বর্ণনা বা গল্পকে গুজব বলা হয়। সামাজিক বিজ্ঞানের ভাষায়, গুজব হলো এমন কোন বিবৃতি যার সত্যতা অল্প সময়ের মধ্যে অথবা কখনই নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।[৬] গুজব সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে, গুজব হলো প্রচারণার একটি উপসেট মাত্র। গুজব অনেক ক্ষেত্রে "ভুল তথ্য" এবং "অসঙ্গত তথ্য" এই দুই বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। "ভুল তথ্য" বলতে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যকে বুঝায় এবং "অসঙ্গত তথ্য" বলতে বুঝায় ইচ্ছাকৃতভাবে ভ্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা।[৭] গুজব সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিতে গিয়ে বৃটেনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্লস ওয়ান (PLOS ONE) ২০০৬ সালের ৪ মার্চ সামাজিক মাধ্যমে গুজব ছড়ানোর ওপর একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে এবং সবকিছু বিবেচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা উপস্থাপন করে। প্লস ওয়ানের গবেষণা মতে, 'আপাতদৃষ্টিতে সত্য বা গ্রহণযোগ্য কিন্তু যার সত্যতা ও সঠিকতা সহজে নিরূপণ করা যায় না এবং যা অনেক রকম উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা, কল্পনা, ধারণা ইত্যাদি তৈরি করে তা প্রকাশ বা প্রচারণাকে গুজব বলা যায়।'[৮]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, কোনো ভুল, অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তিমূলক সংবাদের সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে অন্যদের কাছে তা প্রচার করা তথা ছড়ানোকে গুজব বলা হয়।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে গুজবের ভয়াবহতা

বাংলাদেশে বিগত কয়েক মাস ধরে গুজব রটানো যেন মহামারি আকার ধারণ করেছে। 'পদ্মা সেতু নির্মাণে মাথা লাগবে' এমন অহেতুক গুজব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে 'ছেলেধরা' নামক গুজব সারাদেশে প্রকট আকার ধারণ করে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, গুজবের বলি হয়েছে এমন অনেক নিরীহ, নিরপরাধ মানুষ, যাদের গুজবের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। গুজব রটানোর ঘটনা এবারই বাংলাদেশে নতুন নয়। বরং এর পূর্বেও এদেশে অনেক মানুষ গুজবের কারণে আহত বা নিহত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গুজবের তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

---

৩ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান (আল মু'জামুল ওয়াফী)*, রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি., ঢাকা, পৃ. ৮৩ ও ৮৮৪।

৪ Mohammad Ali et. al (ed.), Bangla Academy Bangla-English Dictionary, Bangla Academy, June 1994, Dhaka, P. 169.

৫ Wikipedia. 2019. Accessed Oct. 26, 2019; https://bn.wikipedia.org/wiki/গুজব

৬ Wikipedia. 2019. Accessed Oct. 26, 2019; https://bn.wikipedia.org/wiki/গুজব

৭ Wikipedia. 2019. Accessed Oct. 26, 2019; https://bn.wikipedia.org/wiki/গুজব

৮ মেজর নাসির উদ্দিন আহাম্মেদ (অব.), গুঞ্জন থেকে গুজব, গুজব থেকে গুরুতর কিছু, *বাংলা ইনসাইডার* (www.banglainsider.com), ঢাকা, সোমবার, আগস্ট ১২, ২০১৯।

২০১১ সালে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে পুলিশের গাড়ি থেকে নামিয়ে ১৬ বছরের এক কিশোরকে গণপিটুনি দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ঢাকার সাভারের আমিন বাজারে ডাকাত সন্দেহে পাঁচ ছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।[৯] একই বছর 'ছেলেধরা' সন্দেহে প্রতিবন্ধী নারীসহ গাজীপুরে তিনজনকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।[১০] সাম্প্রতিক সময় গুজবের ব্যাপারে পত্রিকান্তে জানা যায়, গুজবের কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে, ঢাকার কেরাণীগঞ্জের রসুলপুরে, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে, গাজীপুরের চান্দনায় এবং ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায়।[১১] মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) এক হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত ছয় মাসেই গণপিটুনিতে মারা গেছেন ৩৬ জন। অন্য হিসেবে ২১ জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত দেশজুড়ে গণপিটুনিতে ৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।[১২]

২০১৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে সারা দেশব্যাপী নানা গুজবে সবচেয়ে বেশি গণপিটুনির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

৭জুলাই ২০১৯ লক্ষ্মীপুরে 'ছেলেধরা' সন্দেহে গণপিটুনির শিকার হন এক বৃদ্ধ। ৯ জুলাই রাত আটটার দিকে ঢাকার মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধের চাঁদ উদ্যানে 'ছেলেধরা' সন্দেহে রবিউল নামের এক যুবককে (২৫) পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে একই অজুহাতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং বরিশালের গৌরনদীতে গণপিটুনিতে আহত হন তরিকুল ইসলাম ও মিজানুর রহমান। ১২ জুলাই পটুয়াখালীর গেরাখালী গ্রামে গণপিটুনিতে নিহত হন দাদন মিয়া।[১৩] গুজবের কারণে ১১ জুলাই বৃহস্পতিবার চাঁদপুরের ইসলামপুর গাছতলা এলাকায় গণপিটুনিতে মানসিক ভারসাম্যহীন মনু মিয়া (৪০) নামক এক ভিক্ষুক মারাত্মক আহত হয়।[১৪] ১৬ জুলাই চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে গণপিটুনির শিকার হন তিনজন।[১৫] ১৯ জুলাই ২০১৯ শুক্রবার রাতে ঢাকার কেরাণীগঞ্জে 'ছেলেধরা' সন্দেহে দুই যুবককে গণপিটুনি দেয়া হয়, যাদের একজন মৃত্যুবরণ করেন।[১৬]

---

৯ নঈম নিজাম (সম্পা.), চাঁদে সাঈদীকে দেখা যাওয়ার গুজব, বাংলাদেশ প্রতিদিন, (অনলাইন ভার্সন), রবিবার, মার্চ ৩, ২০১৩।

১০ সাইমুম চৌধুরী, সাম্প্রতিক গুজব, প্রাগুক্ত।

১১ প্রাগুক্ত।

১২ BBC NEWS | বাংলা www.bbc.com ঢাকা, বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২২, ২০১৯; এম এ খান মাসুদ (সম্পা.), *দৈনিক জনকণ্ঠ*, বর্ষ ২৭, সংখ্যা ১৫৮, ঢাকা, বুধবার, জুলাই ২৪, ২০১৯, পৃ. ১

১৩ মুস্তাফিজ শফি (সম্পা.), গুজব না অন্য কিছু, *দৈনিক সমকাল*, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ১১৮, ঢাকা, সোমবার, জুলাই ২২, ২০১৯, পৃ. ১৭।

১৪ সাইফুল আলম (সম্পা.), *দৈনিক যুগান্তর* (অনলাইন সংস্করণ), বর্ষ ২০, সংখ্যা ১৫৬, ঢাকা, শুক্রবার, জুলাই ১২, ২০১৯।

১৫ মুস্তাফিজ শফি (সম্পা.), গুজব না অন্য কিছু, প্রাগুক্ত।

১৬ তাসমিমা হোসেন (সম্পা.), *দৈনিক ইত্তেফাক* (বেটা ভার্সন), রবিবার, ২০ জুলাই, ২০১৯।

গুজবের কারণে সবচেয়ে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন ঢাকার উত্তর বাড্ডায়। গত ২০ জুলাই ২০১৯ চল্লিশ বছর বয়সী এক মা তাঁর শিশু সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করানোর নিয়মাবলি জানতে ঢাকার উত্তর বাড্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যান। স্কুল শিক্ষকদের সাথে কথা-বার্তায় কিছু অসংলগ্নতার গুজব বাইরে ছড়িয়ে পড়লে এলাকার লোক 'ছেলেধরা' সন্দেহে ওই মহিলাকে গণপিটুনি দেয়। মহিলাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার নাম তাসলিমা বেগম রেনু।[১৭] এই দিন সকালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি আল-আমিন নগর এলাকায় 'ছেলেধরা' সন্দেহে মো. সিরাজ (২৮) নামে এক যুবককে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়। একই উপজেলার পাইনাদী নতুন মহল্লায় সকাল ১০ টায় শারমিন বেগম (২৫) নামের এক মহিলাকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। একই দিনে কুমিল্লার লাকসাম পৌরসভার পেয়ারাপুর এলাকায় রফিকুল ইসলাম নামের এক ভিক্ষুককে 'ছেলেধরা' সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে পা ভেঙ্গে দেয় এলাকাবাসী। এ দিনে লালমনিরহাট শহরের খোঁচাবাড়ি মৌজার ডাইলপট্টি এলাকায় মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারীকে গণপিটুনি দেয়া হয়।[১৮] মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের রহিমপুর ইউনিয়নের দেওড়াছড়া চা বাগান এলাকায় 'ছেলেধরা' সন্দেহে গণপিটুনির শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন আনুমানিক ৫০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি।[১৯] ২১ জুলাই ২০১৯ সাভারের তেঁতুলঝোড়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে বাসা ভাড়া করতে গিয়ে 'ছেলেধরা' সন্দেহে গণপিটুনির শিকার হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০৪ নম্বর ওয়ার্ডে এক নারীর মৃত্যু হয়।[২০] একই দিনে নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার বুড়িদহ গ্রামে ছয় ব্যক্তি (নওগাঁ সদর উপজেলার খাগড়া গ্রামের সাদ্দাম হোসেন, আলিম হোসেন ও খলিলুর রহমান এবং ফারতপুর গ্রামের রেজাউল করিম) গণপিটুনির শিকার হয়ে গুরুতর আহত হন। টাঙ্গাইল জেলার শান্তিকুঞ্জ মোড়, সদর উপজেলার কান্দিলা ও কালিহাতী উপজেলার সয়াপালিমা গ্রামে পৃথকভাবে তিন জন (আকাশ [৪২] ও ২ জন অজ্ঞাত) গণপিটুনির শিকার হন। কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলার দুতিয়ার দিঘিরপাড় এলাকায় এক নারীসহ তিনজন [ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার বেজোড়া গ্রামের আবদুস সালাম (৭০), তার স্ত্রী রত্না বেগম ও ঐ গ্রামের রিকশাচালক আনোয়ার হোসেন (৩০)] গণপিটুনির শিকার হন।[২১]

---

১৭ নঈম নিজাম (সম্পা.), *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, বর্ষ ১০, সংখ্যা ১২০, তৃতীয় সংস্করণ,ঢাকা, রবিবার, ২১ জুলাই, ২০১৯, পৃ. ১।

১৮ নঈম নিজাম (সম্পা.), *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, প্রাগুক্ত; মতিউর রহমান (সম্পা.), *প্রথম আলো*, (অনলাইন সংস্করণ), ঢাকা, রবিবার, ২১ জুলাই, ২০১৯।

১৯ এম এ খান মাসুদ, প্রাগুক্ত।

২০ নঈম নিজাম, প্রাগুক্ত।

২১ মতিউর রহমান (সম্পা.), *প্রথম আলো*, (অনলাইন সংস্করণ), প্রাগুক্ত।

এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে 'ছেলেধরা' সন্দেহে শতাধিক নিরীহ, নিরপরাধ মানুষ গণপিটুনিতে আহত হয়েছে। যাদের বেশিরভাগ মধ্যবয়সী নারী, মানসিক ভারসাম্যহীন, ভিক্ষুক অথবা কর্মজীবী অপরিচিত নর-নারী। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা তাপস পালও নগরীর কাট্টলী মুন্সিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে আকস্মিক গুজবের করুণ শিকারে পরিণত হচ্ছিলেন! অবশ্য স্কুল কর্তৃপক্ষ, জনপ্রতিনিধি ও পুলিশের সহযোগিতায় ওই শিক্ষা কর্মকর্তা অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি থেকে রেহাই পান।[২২]

সর্বশেষ গত ২১ অক্টোবর ২০১৯ ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার ঈদগাহ এলাকায় হ্যাক করা ফেসবুক আইডির মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার গুজব ছড়িয়ে 'তৌহিদী জনতা'র ব্যানারে জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে চারজন নিহত হনএবং বিশজন পুলিশসহ শতাধিক আহত হন।[২৩]

গুজব প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা

ইসলাম একটি আদর্শ জীবন ব্যবস্থা, যেখানে মানুষের জন্য উত্তম নির্দেশনাসমূহ রয়েছে। ইসলামকে ধারণ, লালন ও পালন করলে পৃথিবীর কোন মানুষ বিভ্রান্ত হবে না। ইসলামের ছায়াতলে নিজে যেমন ভালো থাকবেন, তেমনি সমাজের সকলকে একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা উপহার দিতে পারবেন। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্তম জীবনাদর্শের নির্দেশনা দেয়। তাই গুজবের মতো ভয়াবহ ও ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত থাকতে ইসলামে যথাযথ নির্দেশনা রয়েছে। যা পালনের মধ্যে দিয়ে গুজবমুক্ত এক উত্তম সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যারা গুজব ছড়ায় তারা কেউ জেনে-শুনে আবার কেউ না জেনে এই জঘন্য কাজটি করে থাকে। এর কারণে যে কত বড় ক্ষতি হচ্ছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপই যেন নেই তাদের! ইসলামের দৃষ্টিতে তারা বড় অন্যায় কাজ করছে। গুজব রটানো ইসলামের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ কাজ। কারণ কোনো বিষয়ের সঠিক জ্ঞান না থাকলে তা প্রচার করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

"হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতি করে বস

---

[২২] নঈম নিজাম, এবার 'ছেলেধরা' গুজবের শিকার শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রাগুক্ত (অনলাইন ভার্সন), ঢাকা, বুধবার, ২৪ জুলাই, ২০১৯।

[২৩] নঈম নিজাম, গুজবে রণক্ষেত্র ভোলা, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা, সোমবার, অক্টোবর ২১, ২০১৯, বর্ষ ১০, সংখ্যা ২১১, পৃ. ১।

এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।"[২৪] অত্র আয়াতের শিক্ষা হচ্ছে, কোন বিষয়ে তথ্য সামনে আসলে অবশ্যই যাচাই-বাছাই করে তা প্রচার করতে হবে, নতুবা এর দ্বারা কারো ক্ষতি হলে তার দায়ভার প্রচারকারীকেই বহন করতে হবে।

গুজব রটানো মিথ্যাবাদী ও নির্বোধের কাজ

লেবাননে জন্ম নেয়া আমেরিকার অর্থনীতি বিষয়ক গবেষক জিয়াদ কে আব্দেল নূরের মতে, মানুষকে যারা ঘৃণা করে, তারা গুজব রটায়, বোকারা তা প্রচার করে আর মূর্খরা তা বিশ্বাস করে।[২৫]কোনো বিষয়ের তথ্য যাচাই-বাছাই ব্যতিরেকে বিশ্বাস করা যেমন পাপের কাজ তেমনি তা ছড়ানোও পাপের কাজ। বোকা ও মিথ্যাবাদী ব্যতীত কেউ এ ধরনের ঘৃণ্য কাজ করতে পারে না। বুদ্ধিমান ও সত্যবাদী কখনো কারো কাছে অসত্য বা না জেনে কোনো তথ্য প্রচার করে না।

এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত বাণী প্রণিধানযোগ্য:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না; কান, চোখ, অন্তর এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত চাওয়া হবে।"[২৬]

আর কোনো বিষয়ের সত্যাসত্য না জেনে প্রচার করার দ্বারা নিজের ব্যক্তিত্ব ও সম্মান ধূলায় মিশিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। উপরন্তু এর দ্বারা মিথ্যাবাদী উপাধি ছাড়া প্রাপ্তির খাতায় কিছুই যোগ হবে না।

নিম্নের হাদীস শরীফ তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفى بِالْمَرْءِ أَثِمًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

"আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন: কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন কথা শোনা মাত্রই (যাচাই না করে) বলে বেড়ায়।"[২৭]

গুজব রটানো যেহেতু মিথ্যাবাদীর কাজ, সেহেতু গুজব রটনাকারী মুনাফিকের স্বভাব। কারণ মিথ্যা বলা মুনাফিকের অন্যতম বদ অভ্যাস।

হাদীস শরীফে এসেছে:

---

[২৪] আল-কুরআন, ৪৯:০৬।

[২৫] মেজর নাসির উদ্দিন আহাম্মেদ (অব.), গুঞ্জন থেকে গুজব, গুজব থেকে গুরুতর কিছু, প্রাগুক্ত।

[২৬] আল-কুরআন, ১৭:৩৬।

[২৭] সুলায়মান ইব্ন আশ'আছ আবূ দাউদ, *সুনানু আবী দাউদ*, বৈরূত: আল মাকতাবাতুল আছরিয়্যা, তা.বি. হাদীস নং ৪৯৯২।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

"আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি: ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে; ২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে এবং ৩. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে।"[২৮]

নিফাকিতে যাদের অন্তর ভরপুর তারা মানুষের কল্যাণে কখনো আত্মনিয়োগ করে না, বরং কার কী ক্ষতি হলো সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই; বিধায় তারা অবলীলায় গুজব রটায় এবং ছড়ায়।

গুজব রটনাকারী নিছক অপবাদ দেয়

কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া অত্যন্ত নিকৃষ্টতম এবং জঘন্যতম কাজ। কোন নর-নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার ফলে তার জীবন পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। গুজবের মতো মিথ্যা অপবাদের কারণে গণপিটুনি এমনকি মৃত্যুর মতো ঘটনা পর্যন্ত ঘটে থাকে! জেনে-শুনে কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ইসলামী শরী'আতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

"যারা এই অপবাদ (ইফ্কের ঘটনা) রচনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে মহাশাস্তি।"[২৯]

সুতরাং প্রমাণিত হলো, গুজব রটনো এবং তা ছড়ানো গুরুতর পাপের কাজ, যা কোন মুমিনের স্বভাবে থাকতে পারে না।

গুজব রটানো শয়তানের কাজ

মানুষের চির শত্রু অভিশপ্ত শয়তান সর্বদা মানুষকে ধোঁকায় ফেলতে সিদ্ধহস্ত। গুজব ছড়িয়ে মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব-বিভেদ লাগিয়ে রাখা শয়তানের অন্যতম লক্ষ্য। এটা বাস্তবায়ন করার জন্য শয়তান মানুষের আকৃতি পর্যন্ত ধারণ করে থাকে। সে মানুষকে গোলক ধাঁধায় ফেলে নিজে অন্যত্র ছিটকে পড়ে।

নিম্নের হাদীস শরীফে তার প্রমাণ পাওয়া যায়:

---

[২৮] আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরা, *আস-সহীহ আল-বুখারী*, দারুল কলম, কিতাবুল ঈমান, বাবু আলামাতিল মুনাফিক, হাদীস নং ৩৩।

[২৯] আল-কুরআন, ২৪:১১।

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِيْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِيَ الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الكِذْبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلاً أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلاَ أَدْرِيْ مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ.

"আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে। অতঃপর লোকদের কাছে এসে তাদেরকে মিথ্যা গুজব বর্ণনা করে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। অতঃপর তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলে, আমি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি; তার চেহারা দেখলে চিনি। কিন্তু যে বলেছে তার নাম জানি না।"[৩০]

গুজব রটানো প্রতারণার শামিল

মিথ্যা ও ভ্রান্ত তথ্য ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা প্রকারান্তরে তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার শামিল। সকল প্রকার প্রতারণা ইসলামে নিষিদ্ধ। প্রিয় নবী (সা) প্রতারকদেরকে নিজের উম্মত থেকে খারিজ করে দিয়েছেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

"যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৩১]সুতরাং গুজব রটানোও এক প্রকার জঘন্য প্রতারণা।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَهُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ لَهُ كَاذِبٌ.

"এর চেয়ে গুরুতর বিশ্বাসঘাতকতা আর কী হতে পারে যে, তুমি তোমার ভাইকে মিথ্যা বিবৃতি দিলে আর সে তোমাকে বিশ্বাস করল।"[৩২]

গুজব রটানোর দ্বারা হত্যাকাণ্ড ঘটানো মহাপাপ

বিনা কারণে গুজব রটানোর দ্বারা নিরীহ, নিরপরাধ মানুষকে গণপিটুনি দেয়া বা হত্যা করা জঘন্যতম পাপের কাজ। এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের কারণে সমগ্র মানবজাতিকে যেন হত্যা করা হলো! আল্লাহ তা'আলা এ সকল পাপিষ্ঠকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.

---

৩০ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূত: ইহইয়াউত্ তুরাছিল আরাবি, তা.বি), হাদীস নং ১৭।

৩১ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী *জামিউত তিরমিযী*, (বৈরূত: দারু ইহইয়াতিত তুরাছিল আরাবী, তা. বি.), হাদীস নং ১৩১৫।

৩২ মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬৪, আবূ দাউদ, *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাব ৭১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৯৭১; ইমাম আহমাদ, *মুসনাদ*, খণ্ড-৪, পৃ. ১৮৩, হাদীস নং ১৭৭৮৫।

"এ কারণে আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল (অন্যায় হত্যার মন্দ পরিণতির কারণে); আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।"[৩৩]

মানবহত্যা মহাপাপ ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.

"আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।"[৩৪]

পবিত্র কুরআনের এসব আয়াতে একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করলে সকল মানুষকে হত্যা করা হয়- এ কথার মাধ্যমে হত্যাকর্মের জঘন্যতাকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে একজন মানুষকে জীবিত রাখা সকল মানুষকেই জীবিত রাখার মতো মহৎ কর্ম হিসেবে উল্লেখ করে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একটি নিরপরাধ মানুষের জীবন বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে সমগ্র মানবজাতির জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে।[৩৫]

নবী করীম (সা) সকল প্রকার বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছেন।বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেছেন:

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هذَا.

"তোমাদের জীবন, তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের জন্য পবিত্র, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের শহর ও তোমাদের এই মাস।"[৩৬]

এছাড়া যেকোনো প্রকার হত্যাকাণ্ড ঘটানো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর কাছে নিন্দনীয় এবং ঘৃণিত কাজ। শান্তির ধর্ম ইসলাম তা কখনও সমর্থন করে না।

হাদীস শরীফের ঘোষণা:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

"আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: আল্লাহর নিকট পৃথিবী ধ্বংস হওয়াটা অধিকতর সহজ ব্যাপার একজন মুসলমান খুন হওয়ার চাইতে।"[৩৭]

---

৩৩ আল-কুরআন, ৫:৩২।

৩৪আল-কুরআন, ১৭:৩৩।

৩৫ ড. মুহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ২০০৪, ঢাকা, পৃ. ৩৮৬।

৩৬ বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল হাজ্জ, বাবুল খুতবাতি আইয়্যামা মিনা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৭৩৯; মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল হাজ্জ, বাব: ১৭, প্রাগুক্ত, হাদীস ন. ২৮১৫।

৩৭ইমাম তিরমিযী, *জামিউত-তিরমিযী*, কিতাবুত দিয়াত আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বাবু মা জাআ ফী শাদীদি কাতলিল মুমিন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৩৯৫।

গুজবের শিকার হয়ে গণপিটুনি এবং বিনা অপরাধে মানুষ হত্যার মতো জঘন্য কাজ কিয়ামতের আলামতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি কেউই এ হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ অবগত নয়! (যা কিয়ামতের একটি আলামত)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَيَدْرِي الْقَاتِلُ فِيْ أَيِّ شَيءٍ قُتِلَ وَلاَيَدْرِي الْمَقْتُوْلُ عَلَى أَيِّ شَيءٍ قُتِلَ.

"নবী করীম (সা) বলেছেন: ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন, মানুষের কাছে এমন এক সময় আসবে, যখন হত্যাকারী জানবে না যে, কী দোষে সে হত্যা করল এবং নিহত ব্যক্তি জানবে না যে, কী কারণে সে নিহত হলো।"[৩৮]

গুজব রটনার কারণে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে কোনো মানুষ নিহত হলে, হত্যাকারী (গুজব রটনাকারী) হত্যার দায়ভার বহন করবে।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.

"কেউ কোনো দোষ বা পাপ করে পরে তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।"[৩৯]

বিনা কারণে মানুষ হত্যা করা গুরুতর অপরাধ এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

রাসূলে কারীম (সা) বলেন:

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ اَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا أَوِ الرَّجُلُ يَمُوْتُ كَافِرًا.

"প্রত্যেক গুনাহ আশা করা যায় আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন, তবে ঐ ব্যক্তির গুনাহ ব্যতীত, যে ইচ্ছা করে কোন মুসলমানকে হত্যা করে অথবা কাফির অবস্থায় মারা যায়।"[৪০]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

مَنْ اَعَانَ عَلى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اَيِسٌ مِّنْ رَّحْمَةِ اللهِ.

"কোনো ব্যক্তি কোনো মুমিনকে হত্যা করার ব্যাপারে সামান্য কথা দিয়ে সাহায্য করলেও সে মহান আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার কপালে লেখা থাকবে, আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।"[৪১]

---

৩৮ মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুছ ছা'আহ, বাবু লা তাকুমুছ ছা'আতু হাত্তা ইয়ামুররুর রাজুলু বিকবরির রাজুলি ফাইয়াতামান্না আইয়্যা মাকানাল মায়্যিতি মিনাল বালা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৭১৯৫।

৩৯ আল-কুরআন, ৪:১১২।

৪০ *সুনানে নাসাঈ*, কিতাবু তাহরীমিদ দাম, বাবু কাতলিল হারাম ফিল মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৩৯৮৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১১৭।

হত্যাকারীর কঠিন বিচার হবে। কারণ বিচার দিবসে সর্বপ্রথ হত্যার বিচার হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةَ وَاَوَّلُ مَا يَقْضِى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ.

"আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বান্দার নিকট থেকে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। আর সর্বাগ্রে মানুষের হত্যার বিচার হবে।"[৪২]

হাশরের ময়দানে নিহত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন:

يَجِيئُ الْمَقْتُوْلُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتِهِ وَرَأْسِهِ بِيدِهِ وَأَوْدَاجِهِ تَشْخَبُ دَمًا يَقُوْلُ: يَا رَبِّ قَتَلَنِيْ هذَا حَتَّى يُدْنِيْهِ مِنَ الْعَرْشِ.

"কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে কপালের চুল ও মাথা ধরে নিয়ে আসবে। তখনও তার গলার কাটা রগসমূহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। সে বলবে, 'হে আমার রব! এ (ব্যক্তি) আমাকে হত্যা করেছে।' এমনকি সে তাকে আল্লাহর আরশের কাছে নিয়ে যাবে।"[৪৩]

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের জঘন্য ও নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে কুরআনুল কারীমে বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا . وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.

"যারা আল্লাহ ও রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ তো তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে পীড়া দেয় এমন কোনো অপরাধের জন্য যা তারা করেনি; তারা অপবাদের ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।"[৪৪]

অত্র আয়াতে স্পষ্ট হলো, বান্দাদের কষ্ট দেওয়ার দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দেয়ার শামিল। কেননা কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতে বান্দাদের ঋণ দেয়া আল্লাহকে ঋণ দেয়ার সাথে সাজুয্য দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মাজীদের বাণী:

---

৪১ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ কুসওয়ানী, *সুনানে ইব্ন মাজাহ*, কিতাবুত দিয়াত, বাব: ১, হাদীস নং ২৬২০।

৪২ *সুনানে নাসাঈ*, কিতাবু তাহরীমিদ দাম, বাবু তা'যীমিদ দাম, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৩৯৯৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১১৯।

৪৩ সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন আন রাসূলিল্লাহ (সা), বাবু ওয়া মিন সুয়ারিন নিসা, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৩০২৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৩৪৮।

৪৪ আল-কুরআন, ৩৩:৫৭-৫৮।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً.

"কে সে, যে আল্লাহ্‌কে করযে হাসানা (নিঃস্বার্থ ঋণ) প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহু গুণে বৃদ্ধি করবেন।"[৪৫]

এ আয়াতে কারীমায় প্রতীয়মান হয়, মানুষকে নিঃস্বার্থে ঋণ প্রদান করলে সে ঋণ যেন আল্লাহ তা'আলাকে প্রদান করা! আর তিনি এটাকে নিজের দিকে নিসবত (সম্বন্ধ) করে তার সাওয়াব বহু গুণে বাড়িয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।এছাড়া হাদীস শরীফে সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহর পরিবারের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রিয়ভাজন হওয়া যাবে।

হাদীস শরীফে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী করীম (সা) বলেছেন: সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আর তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সে, যে তাঁর সৃষ্টির প্রতি অধিক দয়া প্রদর্শনকারী।"[৪৬]

গুজব রটানোর শাস্তি

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে

বর্তমানে দেশে গুজব ছড়ানোর জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মোবাইল ফোন, ফেসবুক, টুইটার, ম্যাসেঞ্জার, ইমু ও ইউটিউবসহ নানা মাধ্যম। এসকল মাধ্যমের অপব্যবহার করে যেকোনো গুজব সহজেই ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে। কিছু অসাধু চক্র তাদের নিজস্ব আইডি বা ফেইক (ভুয়া) আইডির সাহায্যে সবচেয়ে বেশি গুজব ছড়িয়ে থাকে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেহেতু এ ধরনের গুজব ছড়ানো হয়, তাই এ ধরনের অপরাধ 'সাইবার অপরাধ' হিসেবে বিবেচিত হবে।

সাইবার অপরাধের আওতায় পড়ে ফেসবুক বা যেকোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা কোনো গণমাধ্যমে এমন কিছু লেখা বা মন্তব্য করা, যা মানহানিকর, বিভ্রান্তিমূলক, অশালীন, অরুচিকর, অশ্লীল বা আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে করা হয়।

অনলাইন ব্যবহার করে এমন কোনো সংবাদ ছড়ানো যাতে দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে, লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা, যৌনতা ইত্যাদি উল্লেখ বা ইঙ্গিত করে

---

৪৫ আল-কুরআন, ২:২৪৫।

৪৬ আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, *বায়হাকী*, হাদীস নং ৩৯৯৯।

কুৎসা রটানো বা মানহানিকর, অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে এমন সবই 'সাইবার অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে দেশে অরাজক ও অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করলে, রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা সম্ভাবনা আছে এরকম যেকোনো কর্মকাণ্ডে কিংবা দেশবিরোধী কোনো কিছু অনলাইনে শেয়ার করলে তাও 'সাইবার অপরাধ' হবে। এছাড়া কারো নামে অনলাইনে ফেইক আইডি (ভুয়া একাউন্ট) খুললে বা হ্যাক করলে, ভাইরাস ছড়ালে, তথ্য চুরি করলে কিংবা ইলেকট্রনিক কোনো সিস্টেমে অনধিকার প্রবেশ করলে সাইবার অপরাধ হবে। সাইবার অপরাধ হয় এরকম কোনো পোস্ট বা স্ট্যাটাস বা মন্তব্য, ছবি বা ভিডিও শেয়ার, লাইক কিংবা ট্যাগ করলেও সাইবার অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সাইবার অপরাধের শাস্তি বিধানে বলা হয়েছে, এটি জামিন অযোগ্য অপরাধ। সাক্ষ্য প্রমাণে অপরাধ প্রমাণিত হলে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩)- এর ধারা ৫৭ (দুই) এ বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ করে তার শাস্তি সর্বোচ্চ ১৪ বছর কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ৭ বছর কারাদণ্ড এবং ১ কোটি টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[৪৭]

গুজবের কারণে কেউ খুন হলে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তার খুনীর শাস্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।[৪৮]

ইসলামী আইনের আলোকে

ইসলামের দৃষ্টিতেও গুজব বা মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে অস্থিতিশীল করা মারাত্মক শাস্তিযোগ্য অপরাধ। গুজব ছড়ানো কেবল মুনাফিক এবং পাপিষ্ঠ লোকদেরই কাজ। এসকল হীন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.

"মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রবল করব; এরপর এই নগরীতে আপনার প্রতিবেশীরূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে।"[৪৯]

---

৪৭ মো.রায়হান ওয়াজেদ চৌধুরী, অনলাইনে গুজব ছড়ানো সাইবার অপরাধ, *যায়যায়দিন*, বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৭৮, ২৮ আগস্ট ২০১৮, ঢাকা; *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত, এপ্রিল ৯, ২০১৮, পৃ. ৪০১৮-৪০১৯।

৪৮ গাজী শামছুর রহমান, *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, খোশরোজ কিতাব মহল, তৃতীয় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, ঢাকা, পৃ. ৬৭৬-৬৭৭, ধারা-৩০২।

গুজব রটানোর মাধ্যমে কোনো সতী-সাধ্বী মহিলার চরিত্রে কালিমা লেপন করা ইসলামী আইনে জঘন্য অন্যায় এবং পাপের কাজ হিসেবে বিবেচিত। এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত সকলকে কঠিন শাস্তি বিধানের জন্য আল্লাহ তা'আলা কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আল-কুরআনের বাণী:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

"যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী।"[৫০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُون.

"যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"[৫১]

মিথ্যা ও ভ্রান্ত তথ্য ছড়িয়ে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের অপরাধীরা দুনিয়ার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগের পাশাপাশি পরকালে কঠিন আযাবের মধ্যে নিপতিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

"কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত (অভিশাপ) করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।"[৫২]

ইমাম তাবারী (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি হত্যার উদ্দেশ্যেই কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তার শাস্তি হবে জাহান্নামের আযাব, যেখানে সে চিরদিন থাকবে এবং তার সময় অসীম আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।[৫৩]অযথা গুজব ছড়ানোর ফলে সৃষ্ট গণপিটুনির

---

৪৯ আল-কুরআন, ৩৩:৬০।

৫০ আল-কুরআন, ২৪:৪।

৫১ আল-কুরআন, ২৪:১৯।

৫২ আল-কুরআন, ৪:৯৩।

৫৩ ইব্ন জারীর তাবারী (র), *তাফসীরে তাবারী*, ৭ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৪৩৮।

নির্মম শিকার হয়ে কোনো মানুষ নিহত হলে, গুজব রটনাকারীকে হাশরের কঠিন ময়দানে কোটি কোটি মানুষের সামনে 'হত্যাকারী' হিসেবে বিচারের জন্য দণ্ডায়মান হতে হবে। আর জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবার সমূহ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়!

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا.

"যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ (নিরাপত্তাপ্রাপ্ত) ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না; অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ (জান্নাতে পৌঁছার) চল্লিশ বছর পথের দূর থেকে পাওয়া যাবে।"[৫৪]

সর্বাবস্থায় মুসলমান হিসেবে অন্য মুসলমানের জান-মাল ও ইজ্জতের হিফাজত করা অন্য মুসলমানের উপর একান্ত কর্তব্য। কেননা এগুলো পবিত্র আমানত স্বরূপ। গুজব রটিয়ে অযথা মুসলমানের এসকল আমানতের খেয়ানত করা স্পষ্ট নিষিদ্ধ কাজ।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ.

"মুসলমানের উপর সকল মুসলমানের সম্মান ও তার সম্পদ এবং রক্ত (প্রাণ) পবিত্র।"[৫৫]

গুজব রটিয়ে অন্যায়ভাবে কারো প্রাণ কেড়ে নেয়া কখনো সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

গুজব প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা

শান্তির ধর্ম ইসলামে গুজব প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, যা পালন করলে গুজব প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হবে।

সন্দেহপূর্ণ সংবাদ পরিহার করা

কোনো সংবাদ শ্রবণের পর তা সন্দেহ-সংশয়পূর্ণ হলে তা পরিহার করতে হবে। কারণ সন্দেহ-সংশয় শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। সন্দেহপূর্ণ সংবাদ বর্জন করা মুমিনের অন্যতম গুণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ।"[৫৬]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা কুধারণা পোষণ করা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, কুধারণা করা হলো সবচেয়ে (বড়) মিথ্যা কথা। একই

---

[৫৪] বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুদ দিয়াত, বাব-৩০, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৯৬১৪; তিরমিযী, *জামিউত্-তিরমিযী*, দিয়াত, বাব-১১, প্রাগুক্ত, হাদীস ন. ১৪০৩।

[৫৫] তিরমিযী, *জামিউত্-তিরমিযী* কিতাবুল বির, বাব- ১৮, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯২৭; আবূ দাউদ, সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব- ৩৫, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৮৮২।

[৫৬] আল-কুরআন, ৪৯:১২।

বর্ণনায় সুফইয়ান (র) বলেন, সংশয় (ধারণা) দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এক প্রকারের সংশয়ে পাপ হয়; আরেক প্রকারের সংশয়ে পাপ হয় না। যাতে পাপ হয়, তা হচ্ছে এই যে, সংশয় মনে করা সত্ত্বেও তা বলা বা প্রচার করা এবং যে প্রকারের সংশয়ে কোনো পাপ হয় না, তা হলো এই যে, সংশয় সৃষ্টি হলে তা না বলা কিংবা প্রচার না করা।[৫৭]

যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ

কখনও গুজবের কারণে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিলে গুজবে কান না দেয়া এবং তা প্রচার করা থেকে বিরত থাকা মুসলমানের অন্যতম কর্তব্য। তারপরও গুজবের মতো ঘৃণ্য কাজে কেউ জড়িয়ে পড়লে তথা এর দ্বারা কারো জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে তৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

"যখন শান্তি অথবা শংকার কোন সংবাদ তাদের নিকট আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে। যদি তারা তা রাসূল কিংবা তাদের মধ্যে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে তোমাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলে শয়তানের অনুসরণ করত।"[৫৮]

গুজব রটনা ও ছড়ানোর ক্ষেত্রে বাধা দেয়া

গুজবের মতো মিথ্যা ও ভ্রান্তির ছড়াছড়ি কোথাও হতে দেখলে সেটা প্রতিহত করা একজন মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। উম্মতে মুহাম্মদীকে আল্লাহ তা'আলা যে মিশন দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা হলো 'সুকৃতির প্রসার ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ'। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে গুজবের মতো খারাপ কাজকে প্রতিহত করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দেবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।"[৫৯]

---

[৫৭] আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, (অনুবাদ: মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ), *তিরমিযী শরীফ*, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ১৯৯৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৪০২।

[৫৮] আল-কুরআন, ৪:৮৩।

[৫৯] আল-কুরআন, ৩:১০৪।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য কল্যাণের তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করো, অসৎকাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস করো।"[৬০]

মুমিন হিসেবে গুজব বিশ্বাস করা এবং তা ছড়ানো কখনো কাম্য হতে পারে না। বরং সেটাকে 'অনুচিত' হিসেবে আখ্যায়িত করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ.

"এবং তোমরা যখন এটা (মিথ্যা অপবাদ) শুনলে তখন কেন বললে না, 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ!"[৬১]

সুতরাং আমাদেরকে গুজব রটানোর ব্যাপারে এ আয়াত থেকে শিক্ষা নিয়ে এ ধরনের গুরুতর পাপের কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে। পাশাপাশি কেউ হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এরকম ঘৃণ্য কাজ করলে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করে তা বন্ধের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

হাদীস শরীফে রয়েছে:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. وِذلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ কোন মন্দ আচরণ (শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ড) দেখলে সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিরোধ করে। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তবে সে যেন জবান দ্বারা তা প্রতিহত করে। যদি এতটুকুও সক্ষম না হয়, তবে অন্তত অন্তরে সেটা খারাপ জানবে (মনে-প্রাণে ঘৃণা করবে)। আর এ স্তর হলো দুর্বল ঈমানের পরিচয়।"[৬২]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন:

كَلاَّ وَاللهِ لَتَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَ عَلى يَدِى الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا.

---

[৬০] আল-কুরআন, ৩:১১০।

[৬১] আল-কুরআন, ২৪:১৬।

[৬২] মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানি কাওনিন নাহী আনিল মুনকার মিনাল ঈমান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৭৭/৭৮; মিশকাত, পৃ. ৪৩৬।

"কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান করবে এবং অবশ্যই যালিমের দুই হাত ধরে তাকে সৎপথে ফিরে আসতে ও সত্যের উপর অবিচল থাকতে বাধ্য করবে।"[৬৩]

সুতরাং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদানের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে গুজব রটনাকারীদের নিবৃত্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রিয় নবী (সা) আরো বলেন:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه لَتَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَ اللهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

"সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে থাকবে। অন্যথায় অচিরেই আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি নিপতিত করবেন। এরপর তোমরা তাঁর কাছে দু'আ করবে, কিন্তু তোমাদের সে দু'আ কবুল হবে না।"[৬৪]

গুজব প্রতিরোধে সুপারিশ

গুজবের ভয়াবহতা দিন দিন ছড়িয়ে পড়ছে। এতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। সবাই এক প্রকার আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। সুতরাং গুজব প্রতিরোধ করা এখন সময়ের অন্যতম দাবিতে পরিণত হয়েছে। গুজব প্রতিরোধের ক্ষেত্রে "Prevention is better than cure" প্রতিরোধ প্রতিকার অপেক্ষা উত্তম নীতি অবলম্বন করতে হবে। কোথাও গুজবের মতো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা প্রতিরোধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি

গুজব প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতার বিস্তার ঘটাতে হবে। এ কাজে অন্যান্যদের সাথে মসজিদের খতিবদের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। জুমু'আর দিন সমাজের সর্বোচ্চ সংখ্যক লোক মসজিদে উপস্থিত হয়ে থাকেন, তখন জুমু'আ পূর্ব আলোচনায় গুজবের ভয়াবহতা ও এর প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে খতিবগণ গুরুত্বারোপ করতে পারেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য ধর্মগুরুগণ তাদের অনুসারীদের মাঝেও এ ধরনের সচতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন।

মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা

---

৬৩ আবূ দাউদ, *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল মালাহিম, বাবুল আমরি ওয়ান নাহী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৩৩৬।

৬৪ তিরমিযী, *জামিউত্-তিরমিযী*, কিতাবুল ফিতান, বাবু মা জাআ ফিল আমরি বিল মা'রূফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২১৬৯।

ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় গুজব প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। কারণ মিডিয়া হচ্ছে জাতির দর্পণ। জাতির এ দুরবস্থা দূরীকরণে তাদের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার সীমিতকরণ

গুজব ছড়ানোর অন্যতম একটি মাধ্যম সামাজিক যোগাযোগে ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো (ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব ইত্যাদি)। এসকল মাধ্যমে যেন কেউ অহেতুক গুজব ছড়িয়ে কারো ক্ষতি বা সম্ভ্রমহানি ঘটাতে না পারে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। বিশেষ করে ভুয়া আইডি ব্যবহার করে অনেকে এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। সুতরাং এসকল মাধ্যম ব্যবহারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং এর ব্যবহার সীমিত করতে হবে। ভুয়া আইডি বন্ধ করতে জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

জরুরী সেবার নম্বরে ফোন করা

কোথাও গুজব সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা গেলে 'দেখি না কী হয়' চিন্তাধারা থেকে বের হয়ে সাথে সাথে বাংলাদেশের জরুরী কল সেন্টার '৯৯৯' নম্বরে বিনামূল্যে ফোন করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করতে হবে এবং গুজব প্রতিরোধে তাদের সহায়তা চাওয়া যেতে পারে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর ভূমিকা গ্রহণ

গুজব ও গণপিটুনি প্রতিরোধ করার জন্যে দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। পুলিশ বাহিনীকে গুজব প্রতিরোধে এলাকা ভিত্তিতে তৎপর হয়ে কাজ করা, খোঁজ-খবর রাখা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এজন্য ক্রাইম ইন্টেলিজেন্সকে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কোথায় এ ধরনের অপরাধ প্রবণতা আছে, সেটাও খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

অতি দ্রুত গুজব রটানোর বিচার সুনিশ্চিত করা

কথায় আছে, "Justice delayed justice denied" বিচার বিলম্ব করা বিচার বঞ্চিত করার শামিল। গুজবের কারণে যে সকল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়, তার বিচার ত্বরিৎ গতিতে করতে হবে। এক্ষেত্রে যে দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে তা পরিহার করে প্রয়োজনে দ্রুত বিচার আইনের আওতায় এনে যথাযথ বিচার সুনিশ্চিত করতে হবে।

আইনের সংস্কার

বর্তমানে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালনের পূর্ণ বাস্তবায়নকল্পে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায়, আইনের ফাঁক-ফোঁকরে প্রকৃত অপরাধী খালাস পেয়ে যায়, পক্ষান্তরে নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ডিত হয়ে সাজা ভোগ করে। গুজব

রটনাকারীদের বেলায়ও যেন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে নজর রেখে আইন ব্যবস্থাকে আরো ঢেলে সাজাতে হবে।

প্রকাশ্যে শাস্তির ব্যবস্থা করা

গুজবকে সমূলে উৎপাত করার জন্য গুজব রটনাকারীদেরকে জনসম্মুখে ও প্রকাশ্যে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এর ফলে আর কেউ গুজব রটানোর মতো জঘন্য কাজ করতে দুঃসাহস দেখাবে না।

ইসলামী অনুশাসনের পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটানো

গুজবের মতো মিথ্যা, বানোয়াট ও ভ্রান্ত তথ্য ছড়ানো থেকে মানুষকে পূর্ণ নিবৃত্ত করতে হলে সকলের মাঝে ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী অনুশাসনের পূর্ণ বাস্তবায়ন ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ের লোকদের মাঝে ঘটানো গেলে 'গুজব' নামক কোনো অযাচিত শব্দ আমাদের আর শুনতে হবে না।

উপসংহার

গুজব একটি জঘন্য মিথ্যাচার এবং অযথা অপবাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। গুজবের ফলে অনেক নিরীহ, নিরপরাধ সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গুজবকে বর্তমানে সামাজিক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অপরাধ বিজ্ঞানীরা। অনেক মানুষ নিছক গুজবের কারণে নিরাপত্তাহীনতা ও চরম উৎকণ্ঠার মাঝে দিনানিপাত করছেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে। একইসাথে ইসলামের দেওয়া নির্দেশনা সম্পর্কে সকল মানুষকে অবহিত করতে পারলে গুজবের ভয়াবহতা কমিয়ে আনা সম্ভব। ইসলামের অনুশাসন মেনে চললে তথা যেকোনো সংবাদ শ্রবণ করা মাত্র বিশ্বাস না করে তার সত্যাসত্য যাচাই-বাছাই করলে গুজব প্রতিরোধ করা অনেকাংশে সম্ভবপর হবে। একইসাথে কেউ কখনো রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে পারবে না। বেশিরভাগ গুজবই প্রচার পেয়ে থাকে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে; অতএব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। গুজবের মাধ্যমে নারীর সম্মানহানীর মতো যেসব অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি তৈরি হয় তা বন্ধেও সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। তাই আধুনিক যুগে মানুষকে সর্বোচ্চ সতর্ক থেকে গুজব প্রতিরোধ করতে হবে। সাধারণ জনগণ, সরকার ও জনপ্রতিনিধিসহ সর্বমহল গুজব প্রতিরোধে কঠিন পদক্ষেপ নিয়ে জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ করতে হবে। দেশের প্রান্তিক পর্যায় থেকে রাজধানীসহ সর্বমহলে গুজব প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ইসলামী নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা সময়ের অন্যতম দাবী।সর্বোপরি, মানবতার জয়গান গেয়ে কোনো মানুষের যেন বিন্দুমাত্র ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য 'গুজব' নামক ব্যাধিপ্রতিরোধ করে এর করাল গ্রাস থেকে পূর্ণ মুক্তি লাভ করে সুখী, সমৃদ্ধশালী ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য নিরাপদ বসুন্ধরা গড়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬১ বর্ষ ১ম- ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.

তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

সাহিদা আকতার*

[Abstract : The Holy Qur'an is the direct word of Almighty Allah, the sublime words. Just as its thoughts and content belong to Allah, so does every word and language belong to Allah. Allah revealed this eternal commandment of his to the Prophet (peace be upon him) in the language of his people. As this book, which is applicable at all times and in all circumstances, is the main source of the Islamic way of life, it is a must for every Muslim to learn from it. The language of the Holy Quran is simple and touching. However, there are many verses in the Qur'an which cannot be understood by the general public. It is difficult for an ordinary reader to identify his desired subject in the Qur'an. The Al-Qur'an, which contains the conveniences, customs and methods of Arabic rhetoric, uses a few common and metaphorical words and phrases which are not generally understood, but require a well-organized experience like interpretation and analysis, which is called 'ilmut tafsir' in Arabic. Tafsir is one of the top experiences in the science of Shariah. Al-Quran is one of the main sources of this experience. The subject matter of Ilmut Tafsir is to understand the context of the revelation of the sura's and verses of the Qur'an, to understand the underlying meaning and significance, to review, to search for directions and to analyze theoretically. The real purpose of the commentary of the Qur'an is to understand its verses correctly. The interpretation of the Qur'an actually started during the lifetime of the Prophet (peace be upon him). The first commentator on the Qur'an was Rasulullah (peace be upon him). Tafsir of the first century Hijri started from the age of the Sahabi and extended to the first half of the age of the Tabi'is. The Tabi'is engaged in the practice of tafsir in the second century after the Hijri first century. Tafsir has followed the path of famous commentators in the age of Tabein. The main sources of Tafsir books written in later times are Hadith, the language of the Sahabis and their various views. Then there is the long history of evolution of Tafsir, many scholars have focused on the interpretation of the Qur'an, the study of various aspects of the Qur'an and have made an unprecedented contribution to the development of the knowledge of tafsir. This article discusses the origin and evolution of Ilmut Tafsir.]

[সারসংক্ষেপ: *পবিত্র আল-কুরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রত্যক্ষ কালাম, সুমহান বাণী। এর ভাব ও বিষয়বস্তু যেমন আল্লাহর নিজস্ব, তেমনি এর প্রতিটি শব্দ এবং ভাষাও আল্লাহর নিজস্ব। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই শাশ্বত বিধানকে স্বজাতির ভাষায় নবী করীম (সা.)-এর নিকট অবতীর্ণ করেন। সর্বকালে সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য এ কিতাব ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল উৎস হওয়ায় এর শিক্ষা লাভ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য একটি আবশ্যিক*

**প্রভাষক, দুলারহাট আদর্শ কলেজ, চরফ্যাশন, ভোলা ও এম.ফিল.গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।*

বিষয়। পবিত্র কুরআনের ভাষা সহজ-সরল ও হৃদয়স্পর্শী। তবে কুরআনে এমনও অনেক আয়াত রয়েছে, যা সাধারণের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় আল-কুরআনে শনাক্ত করা দুরূহ কাজ। আরবী অলংকার বিজ্ঞানের সৌকর্য, রীতি ও পদ্ধতি সংবলিত আল-কুরআনে এমন স্বল্পপ্রচলিত ও রূপকার্থবোধক শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, যা সাধারণভাবে বোধগম্য নয়, বরং এগুলো অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন পড়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মতো এক সুবিন্যস্ত অভিজ্ঞানের, যা আরবী ভাষায় 'ইলমুত তাফসীর' নামে খ্যাত। তাফসীর শরীয়তের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষমানের একটি অভিজ্ঞান। আল-কুরআন হচ্ছে এই অভিজ্ঞানের মূল উৎসের অন্যতম। আল-কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহের নাযিলের প্রেক্ষাপট, অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য সঠিভাবে অনুধাবন, পর্যালোচনা, দিকনির্দেশনা অনুসন্ধান ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ইলমুত তাফসীরের প্রতিপাদ্য বিষয়। আল-কুরআনের মুফাসসিরগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো-এর আয়াতগুলোকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা। কুরআনের তাফসীর বাস্তবে রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই শুরু হয়েছে। কুরআনের প্রথম মুফাসসির হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। হিজরী প্রথম শতকের তাফসীর শুরু হয় সাহাবীগণের যুগ থেকে তার বিস্তৃতি তাবি'ঈগণের যুগের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। হিজরী প্রথম শতকের পর দ্বিতীয় শতকে তাফসীর চর্চায় তাবি'ঈগণের আত্মনিয়োগ করেন। তাবি'ঈগণের যুগে বিখ্যাত মুফাসসিরদের কেন্দ্র করে তাফসীরশাস্ত্র পথ পরিক্রমণ করেছে। পরবর্তী যুগসমূহে রচিত তাফসীরের কিতাবসমূহের মূল উৎস হাদীস, সাহাবায়েকিরামের ভাষা ও তাদের মূল্যবান অভিমত। অতঃপর তাফসীর শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসের দেখা যায়, অনেক মনীষী কুরআন ব্যাখ্যায়, কুরআনের বিভিন্ন দিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেছেন এবং তাফসীর অভিজ্ঞানের বিকাশ সাধনে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।]

ভূমিকা

আল-কুরআন জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল ও প্রধান উৎস, মানবজাতির পরিপূর্ণ জীবন দর্শন। এটি আরবী ভাষায় অবতীর্ণ। যার শিক্ষা সময় ও স্থানের উর্ধ্বে। দুনিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ না করা উম্মী রাসূল (সা.) এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আরবী ভাষায় ওহী অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি কুরআন নিজেই সত্যায়ন করেছে। বিশ্ব মানবতার শান্তি, ঐক্য, উন্নতি ও মুক্তি সনদ আল-কুরআন। এটা সর্বকালের সকল মানুষের পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এর প্রতিটি শব্দ ও আয়াতে রয়েছে কল্যাণের অফুরান পথ। এতে আরবী অলংকার বিজ্ঞানের সৌকর্য রীতি ও পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে। এ মহাগ্রন্থে অনেক স্বল্প প্রচলিত ও রূপকার্থবোধক শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, যা সাধারণভাবে বোধগম্য নয় বরং এগুলো অনুধাবনের জন্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে তাফসীর বলা হয়। আর আল-কুরআনের বর্ণনা অনুধাবনের জন্য যে শাস্ত্র আলোচনা করে তা তাফসীর শাস্ত্র নামে অভিহিত।

আরবী জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় তাফসীর শব্দটি আল-কুরআনের বাণী হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে তাফসীর বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। সাহাবীগণ কোন আয়াতের শাব্দিক বিশ্লেষণ এবং ভাব উদঘাটনে সক্ষম না হলে তাঁরা নবী করীম (সা.)-এর শরণাপন্ন হতেন। তিনি তাঁদেরকে আল-কুরআন সম্পর্কিত তাঁদের উপস্থাপিত বিষয়াদি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে তারা সহজেই সংশ্লিষ্ট আয়াতের

মর্ম অনুধাবনে সক্ষম হতেন। এভাবে নবীযুগে তাফসীর বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়। নবী করীম (সা.)-এর ইন্তিকালের পর সাহাবী, তাবিঈ ও তাবি-তাবি'ঈনের যুগে এ অভিজ্ঞান বিকশিত হয়, সম্প্রসারিত হয় এর দিগন্ত। হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে এটি পূর্ণ শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।সূচনাকাল থেকে অদ্যাবধি আল-কুরআনকে ঘিরে অসংখ্য বিদগ্ধ পণ্ডিত তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ সমস্ত মনীষী ও তাদের রচিত তাফসীরকে কেন্দ্র করে অনেকেই অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করে এ অভিজ্ঞানকে করেছেন সমৃদ্ধ। এসব গ্রন্থের কয়েকটির আলোকে আমি নিম্নে তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্।

তাফসীর এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ: আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাফসীর (**تفسير**) শব্দের অর্থ স্পষ্ট করা, প্রকাশ করা, প্রসারিত করা, ব্যাখ্যা করা। এটি আরবী শব্দ। শব্দটি 'আল-ফাসরু' (**الفسر**) ধাতু থেকে এসেছে।[১] এর অর্থ হচ্ছে, **البيان والكشف** অর্থাৎ বর্ণনা করা এবং স্পষ্ট করা।[২] **الشرح والبيان** বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

"তাঁরা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপন করলেই আমি তার সঠিক জবাব ও ব্যাখ্যা প্রদান করি"।[৩]

প্রসিদ্ধ আরবী অভিধান 'লিসানুল আরব' প্রণেতা বলেন: **الفسر** অর্থ পর্দা উন্মোচন আর তাফসীরের কাজ হলো অস্পষ্ট শব্দের মূলতত্ত্ব উদঘাটন করা।[৪] ডাক্তার যেভাবে রোগীর বাহিরের অবস্থা দেখে অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুধাবন করেন সে অনুধাবন করাকে 'তাফসিরাহ বলা হয়।[৫] তাফসীর শব্দটি বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।[৬] অতএব বলা যায়, তাফসীর শব্দটি বিভিন্ন পরিভাষাকে শামিল করলেও ইসলামী পরিভাষায় একে কুরআনের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

তাফসীরের পারিভাষিক অর্থ

---

১ জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন* (মিসর: মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৭০হি./১৯৫১খ্রি.), স.৩, খ.২, পৃ. ১৭৩।

২ আবু হায়্যান, *আল-বাহরুল মুহীত* (বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, ১৪১২হি./১৯৯২খ্রি.), পৃ. ২৬।

৩ আল-কুরআন, ২৫:৩৩।

৪ ইবনে মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল আরব* (কায়রো: মাকতাবাহ আমীরিয়্যাহ, ১৩০২হি.), খ.৬, পৃ. ৩৬১।

৫ তাফসিরাহ (**تفسرة**) একটি বিশেষ্য পদ। অনেকের মতে, তাফসীর শব্দটি তাফসিরাহ ক্রিয়ামূল হতে গঠিত। দ্র.*আল-ইতকান*, খ.২, পৃ. ৪৮৯।

৬ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৩হি./১৯৯২খ্রি.), খ.১২, পৃ. ১৮২।

ইসলামী পরিভাষায় তাফসীর শব্দটির সংজ্ঞা সম্পর্কে আলিমগণ বৈচিত্রময় বক্তব্য পেশ করেছেন। আল্লামা জুরজানী (র.) তাঁর আত-তা'রীফাত (**التعريفات**) নামক গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন[৭]:

توضيح معنى الأية وشأنها وقصتها والسبب الذى نزلت فيه بلفظ يدل دلالة ظاهرة

"আয়াতের অর্থ-সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং আয়াত অবতীর্ণের কারণ স্পষ্ট নির্দেশিত শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা।"

আল্লামা যারকাশী (র.) তাফসীর শাস্ত্রকে একটি বিজ্ঞান হিসাবে আখ্যা দিয়ে বলেন:

هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد ﷺ وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه

"এটি এমন এক বিজ্ঞান যার দ্বারা মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব অনুধাবন, তার অর্থের ব্যাখ্যা ও আয়াতের বিধি বিধান এবং রহস্য জানা যায়।"[৮]

আল্লামা তাশ কুবরা যাদাহ (র.) বলেন:

هو علم من معنى نظم القران بحسب الطاقة البشرية وبحسب ما تقتضيه القواعد العربية مبادئه العلوم العربية وأصول الكلام وأصول الفقه والجدل وغير ذلك من العلوم الجملة

"মানুষের সামর্থ্যের ভিত্তিতে এবং আরবী ব্যাকরণ ও মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন– আরবী ভাষা জ্ঞান, কালাম শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে আল-কুরআনের আয়াতের অর্থ জানা যায় এমন বিজ্ঞানের নাম হলো তাফসীর।"[৯]

বর্তমান যুগের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর আল্লামা যারকানী আল আযহারী-এর সংজ্ঞায় বলেন :

هوعلم يبحث فيه عن احوال القران الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية

"তাফসীর এমন এক বিজ্ঞান যা আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর উদ্দেশ্য নির্ণয়ে মানুষের সামর্থ্যানুযায়ী কুরআন কারীমের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে।"

---

৭ আস সাইয়েদ আস শরীফ আলী বিন মুহাম্মদ জুরজানী, *আত-তারীফাত* (ইস্তানবুল: আহমদ কামিল, ১৩২৭হি.), পৃ. ৪২-৪৩।

৮ আবূ হায়্যান আসীরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আন্দালুসী, *আল-বাহরুল মুহীত* (বৈরূত: দারুল ফিক্হ, ১৪১২হি./১৯৯২খ্রি.), খ.১, পৃ. ২৬।

৯ তাশ কুবরা যাদাহ্, *মিফতাহুস সাদাত ওয়া মিসবাহুস সিয়াদাত* (দামিশক: দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৫৪।

আবার কেউ কেউ বলেন, এটি এমন একটি অভিজ্ঞান, যাতে আল কুরআনের আয়াতের বিভিন্ন অর্থ, আয়াত নিঃসৃত আহকাম এবং অবতরণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।[১০]

আল্লামা মাতুরীদী (র)-এর মতে,

التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأي

"তাফসীর হচ্ছে অকাট্যভাবে বলা যে, কুরআনের এ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এ অর্থ গ্রহণ করেছেন, যদি এর পক্ষে অকাট্য দলীল থাকে (অর্থাৎ রিওয়ায়াত থাকলে) তাহলে তা সঠিক, অন্যথায় তা তাফসীর বির রায় বা নিজের মতভিত্তিক তাফসীর।"

মূলত তাফসীর শব্দটি এক বিশেষ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যা দ্বারা আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে বুঝায়। কুরআন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মূলনীতিসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে 'ইলমুত তাফসীর' আর যিনি কুরআনের ব্যাখ্যা করেন তাকে 'মুফাস্‌সির' বলে।[১১]

তা'বীলের পরিচয়

পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাফসীর শব্দের পাশাপাশি আরেকটি প্রায় সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে তাবীল। শব্দ দুটির একই অর্থে ব্যবহার যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনি কিছু ভিন্নার্থে ব্যবহারও প্রচলিত আছে। **تأويل**শব্দটি মূলধাতু **الأوْلُ** থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, এর অর্থ হলো **الرجوع**অর্থাৎ ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা ইত্যাদি।[১২] আবার অনেকে বলেন, **تأويل**শব্দটি **الإِيَالَةُ السياسة**শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন, এর অর্থ যাচাই-বাছাই করা বা পর্যালোচনা করা।[১৩]

আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী (র.) বলেন, 'তা'বীল অর্থ ফিরে আসা। মুওয়াউয়াল (**مؤول**) ঐ স্থানকে বলে যার দিকে ফিরে আসা হয়। কোন বস্তুকে চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে ফিরিয়ে দেয়া, নাম বা কাজকে তার অভীষ্ট, লক্ষ্যে উন্নীত করা।'[১৪]

---

১০ মুহাম্মদ আব্দুল আযীম আয-যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন* (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮খ্রি.), খ.২, পৃ. ৪।

১১ জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, খ.২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০।

১২ ইবনে মানযূর, *লিসানুল আরব*(বৈরূত: দারু এহইয়া, ১৪১৬হি.), স.১, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪।

১৩ জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, খ.২ পৃ. ২২১।

১৪ ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.) পৃ.৩১।

পবিত্র কুরআনে তা'বীল শব্দটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা,[১৫] শেষ পরিণতি,[১৬] কর্ম-সম্পাদন,[১৭] সংবাদ,[১৮] ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ[১৯] ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

তা'বীলের পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণে পূর্ববর্তী (মুতাকাদ্দিমীন) ও পরবর্তী (মুতাআখখিরীন) আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন। পূর্ববর্তী আলিমগণ তা'বীলকে দুভাগে ব্যাখ্যা করেন:

এক: আয়াতের প্রকাশ ও গোপনীয় অর্থের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা।

هو تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه

"তা'বীল হচ্ছে কালামের ব্যাখ্যা ও অর্থের বর্ণনা করা। চাই তা প্রকাশ্য কালামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক বা বিপরীত হোক।"[২০] এক্ষেত্রে তা'বীল ও তাফসীর সমার্থবোধক হবে।[২১]

দুই: **هو نفس المراد بالكلام** "কোন কালামে যে অর্থ উদ্দিষ্ট বা লক্ষ্য তা-ই তা'বীল।"[২২]

অপরদিকে পরবর্তী আলিমগণের দৃষ্টিতে তা'বীলের সংজ্ঞা হচ্ছে :

هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح

"আয়াতের বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তে সম্ভাব্য অর্থ গ্রহণ করাকে তা'বীল বলে।"

মুফাসসিরগণের পরিভাষায়, আল কুরআনের আয়াতের অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম উদ্ভাবন করাকে তা'বীল বলা হয়।[২৩]

অনেক আলিমের মতে:[৮]শব্দকে প্রবলতর অর্থ থেকে অপ্রবলতর অর্থের দিকে এমন প্রমাণ সাপেক্ষে ফিরানোর নাম তা'বীল, যা দ্বারা রূপান্তরিত অর্থ সুস্পষ্ট হয়।"

আধুনিক আলিমগণ তা'বীলের নিম্নরূপ সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন:

هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بدليل يقترن به

"কোনো দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে কোন একটি শব্দের বলিষ্ঠ অর্থকে বাদ দিয়ে সম্ভাব্য অর্থ গ্রহণ করাকে তা'বীল বলে।"[২৪]

---

১৫ আল কুরআন: ১২ : ৬, ১২: ৩৭।

১৬ আল-কুরআন: ৪:৫৯।

১৭ আল কুরআন, ১৮:৮২।

১৮ আল-কুরআন: ৭:৫৩।

১৯ আল-কুরআন: ৩:৭।

২০ যারকানী, মানাহিলুল ইরফান, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৭।

২১ প্রখ্যাত তাবিঈ মুজাহিদ বলেন إن العلماء يعلمون التاويل "আলিমগণ কুরআনের তা'বীল জানেন।' এখানে তা'বীল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাফসীর। (দ্র. ড. হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন*, পাকিস্তান, ইদারাতুল কুরআন, ১৯৯৭খ্রি., খ. ১, পৃ. ১৫।

২২ যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

২৩ শায়খ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

২৪ মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন* (কায়রো: মাকতাবা ওয়া, তা.বি.), পৃ. ৩৩৭।

ড. হুসাইন আয্-যাহাবী এ প্রসঙ্গে বলেন, তা'বীল শব্দটি উসূলীগণ ব্যবহার করে এর দ্বারা এমন বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে থাকেন, যা প্রমাণের মুখাপেক্ষী।[২৫]

আলিমগণ প্রদত্ত তা'বীল এর সংজ্ঞা থেকে এটিই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, আল-কুরআনের আয়াতের সম্ভাবনাময় অর্থের মধ্যে অগ্রগণ্য অর্থ গ্রহণ করাকে তা'বীল বলা হয়।

তাফসীর ও তা'বীলের মধ্যে পার্থক্য

তাফসীর হচ্ছে নিশ্চিত দৃঢ়তার সাথে বলা যে, এ শব্দের অর্থ এটাই। আর আল্লাহ তা'আলার উপর এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, তিনি এ অর্থই বুঝিয়েছেন। এরূপ কথার পেছনে নিশ্চিত দলীল মওজুদ থাকলে অর্থাৎ রিওয়ায়াত বা হাদীসের দলীল থাকলে তা সঠিক। আর না হলে তাকে বলা হবে, "নিজস্ব অভিমতের তাফসীর" (**تفسير بالرأى**)। এরূপ তাফসীর নিষিদ্ধ। আর তা'বীল বলা হয়, আল্লাহ তা'আলার প্রতি সাক্ষ্য আরোপ না করে এবং অকাট্যভাবে না বলে একাধিক অর্থ থেকে যেকোন একটি অর্থকে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা।"[২৬]

তাফসীরে রূহুল মা'আনীর ভূমিকায়বলা হয়েছে- 'ইবারত তথা মূল বক্তব্য থেকে যে অর্থ স্পষ্ট নির্গত হয়তা বর্ণনা করাকে তাফসীর বলে। আর ইবারত থেকে যে অর্থ ইঙ্গিতে বুঝা যায় তা বর্ণনা করাকে তা'বীল বলে।'[২৭] আল্লামা জুরজানী (র.) বলেন, **يخرج الحى من الميت** আয়াতের তাফসীর হলো 'ডিম থেকে পাখি বের করা।' পক্ষান্তরে এর তা'বীল হলো কাফির থেকে মুমিন অথবা মূর্খ থেকে জ্ঞানী বের করা।[২৮]

কেউ কেউ বলেন, **التفسيريتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالدراية** 'অর্থাৎ তাফসীর রিওয়ায়াতের সাথে সম্পৃক্ত আর তা'বীল দলীল প্রমাণ ভিত্তিক উপলব্ধির সাথে সম্পৃক্ত।[২৯]

জামউল জাওযামী কিতাবে বলা হয়েছে:

التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل عليه لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا في الواقع ففاسد، أو لاشيء فلعب لا تأويل

"আয়াতের বাহ্যিক অর্থকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সম্ভাব্য অর্থে ব্যাখ্যা করাকে তা'বীল বলে। কোন দলীলের ভিত্তিতে যদি এরূপ করা হয়তবে তা সঠিক। আর কাল্পনিক দলীলের ভিত্তিতে যদি

---

২৫ *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৮।

২৬ জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ.২ পৃ. ১৭৩।

২৭ সাইয়্যেদ মাহমূদ আলূসী, *রূহুল মা'আনী* (বৈরূত: দারু এহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), খ.১, পৃ.৪।

২৮ আল-জুরজানী, *আত-তা'রীফাত* (দামিশক: দারুদ্ দাইয়্যান লিত তুরাছ, তা.বি.), পৃ. ২৭।

২৯ জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, খ.২ পৃ. ৪৫০।

দুর্বল অর্থ গ্রহণ করা হয়তবে তা বাতিল। আর নিশ্চিত বা কাল্পনিক কোন প্রকার দলীলই যদি না থাকে তবে তা হবে আল্লাহর কালামের অবমূল্যায়ন।"[৩০]

মোটকথা তাফসীর শব্দটি আয়াতের শব্দগত ও তাত্ত্বিক টীকাসহ ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর তা'বীল শব্দটি আয়াতে অন্তর্নিহিত সম্ভাব্য অর্থের মধ্য থেকে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।

তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি

উলূমুল কুরআন বা কুরআনিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ইলমে তাফসীর বা তাফসীর বিজ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটে। সর্বপ্রথম কুরআন নাযিলের সাথে সাথেই ইলমে তাফসীর চর্চার উদ্ভব ঘটে। কেননা দেখা যায় যে, কুরআনে কারীমের কোথাও যা সংক্ষেপে এসেছে অন্যস্থানে তা বিস্তারিত এবং কোথাও শর্তহীনভাবে কোন হুকুম এসেছে, যা অন্যস্থানে শর্তযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে, আবার কোনটি আম বা সাধারণভাবে এসেছে, যা অন্যস্থানে খাস বা সীমিত তথা নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এটাই প্রকৃতপক্ষে বয়ান বা তাফসীর।[৩১] এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, **إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ** "অতঃপর আমার উপরই তার বয়ান বা বর্ণনা করার দায়িত্ব।"[৩২] এতে প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং মহান আল্লাহ হলেন সর্বপ্রথম কুরআনের ব্যাখ্যাকারী ও তাফসীরকারী। সুতরাং তাফসীর মহান আল্লাহর বর্ণনা দ্বারা গোড়াপত্তন হয়। তারপর নবী করীম (সা.)-এর বর্ণনা দ্বারা।

সূচনায় তাফসীর শাস্ত্র দুটো পর্যায়ে বিকাশ লাভ করে। কুরআন কারীমের তাফসীরের প্রথম স্তরটা কুরআন কারীমের আয়াত দ্বারা শুরু হয়, একটি আয়াতকে অন্য আয়াত দ্বারা স্পষ্ট করণের মাধ্যমে। দ্বিতীয় স্তরটা শুরু হয় নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী দ্বারা।[৩৩] আবূ দাউদ (র.) তাঁর সুনান গ্রন্থে মিকদাম ইবনে মা'দিকারাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেন, "সাবধান! আমি কুরআন কারীম ও তার সাথে অনুরূপ বাণী নিয়ে এসেছি।"[৩৪] তিনি আল্লাহর অনুমতি ও দিক নির্দেশনায় কোন কিছুর হুকুম আম বা সাধারণ ঘোষণা করেন, কিছু খাস বা নির্দিষ্ট করেন, এর সাথে সংযোজন করেন, আল্লাহর কিতাবে যা

---

৩০ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৮।

৩১ ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, *তাফসীরুল কুরআন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪২৭হি./২০০৬খ্রি.), স.২, পৃ. ৫৪।

৩২ আল-কুরআন, ৭৫:১৯।

৩৩ *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন*, খ. ১, পৃ.৪৫; মানাহিলুল ইরফান, খ.২, পৃ. ১৬-১৭।

৩৪ আউনুল মা'বুদ শরহে সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবুফি লুযূমিস সুন্নাহ, খ.১২, পৃ. ২৭৭; হাদীস ৪৬০৪ ।https://islamweb.net/ar/library/index.

এসেছে তার হুকুম জারি করেন।[৩৫] কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে নবী করীম (সা.)-এর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

প্রথমত: মুজমালের বর্ণনা দ্বারা। যেমন– পবিত্র কুরআনে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত নামাযের প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের সময় নির্ধারণ এবং রাকা'আতের পরিমাণ ও পদ্ধতি বর্ণনা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন: **صلوا كما رأيتمونى أصلى** "তোমরা সালাত আদায় করো, যেমনভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ।"[৩৬] এমনিভাবে রাকা'আতের পরিমাণ ও অন্যান্য দিক।

দ্বিতীয়ত:মুশকালের ব্যাখ্যা দ্বারা।যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী:

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ পর্যন্ত না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা প্রকাশিত হবে।"[৩৭]

রাসুলূল্লাহ (সা) এ আয়াতে উল্লিখিত শুভ্র রেখাকে দিনের আলো ও কালো রেখাকে রাতের অন্ধকার দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।[৩৮]

তৃতীয়: আমকে খাসকরণ দ্বারা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ

"তোমাদের উপর মৃত জন্তু ও রক্তকে হারাম করা হয়েছে।"[৩৯]

এটা আম, রাসূলুল্লাহ (সা.) একে খাস করেছেন, মৃত টিড্ডিকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করে তিনি বলেন:

أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك، والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال

"আমাদের জন্য দুটি মৃত ও দুধরণের রক্তকে বৈধ করা হয়েছে- তাহলো মাছ ও টিড্ডি এবং রক্তগুলো হলো কলিজা ও প্লিহা।"[৪০]

চতুর্থত: মুতলাককে মুকাইয়্যাদ করণ। যেমন আল্লাহ তা'আলা উত্তরাধীকার আইনের বিষয়ে বলেন:

فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

---

৩৫ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-*কুরতুবী*, *আল-জামি লিআহকামিল কুরআন* (বৈরূত: ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৪০৫হি./১৯৮৫খ্রি.), খ.১, পৃ.৩৮।

৩৬ আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, খ.১, পৃ. ১৬২।

৩৭ আল-কুরআন: ২: ১৮৭।

৩৮ কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, বাংলা বঙ্গানুবাদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন), খ.১, পৃ. ১২ (মুখবন্ধ)।

৩৯ আল-কুরআন: ৫:৩।

৪০ ইমাম ইবনে মাজাহ,*সুনানে ইবনে মাজাহ*, কিতাব: আল-আত-ইমা, খ.২, পৃ. ২৯৯।

"অতঃপর যদি মৃত ব্যক্তির কয়েকজন ভাই থাকে, তবে মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়তের পর যে অসিয়তের পর যে অসিয়ত করে সে মৃত্যুবরণ করেছে কিংবা তার আদায় করার পর।"[৪১]

আয়াতে মুতলাক শর্তহীন অসিয়তকে হাদীস দ্বারা দুটি দিক থেকে মুকাইয়্যিদ করা হয়েছে।

(ক) হাদীসে এসেছে নবী করীম (সা) এক-তৃতীয়াংশের বেশী অসিয়ত করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) মুসআব ইবনে সা'দ হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলূল্লাহ (সা) আমার নিকট আসলেন, আমি তাঁকে বললাম, আমার সকল সম্পদ আমি অসিয়ত করে দেই। নবী করীম (সা) বললেন, না। তারপর বললাম, অর্ধেক সম্পত্তি অসিয়ত করি। তিনি বললেন, না। তারপর এক তৃতীয়াংশের কথা বললে তিনি বললেন, হ্যাঁ। কেননা এক তৃতীয়াংশই অধিক।[৪২]

(খ) উত্তরাধিকাদের জন্য অসিয়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) আবূ উমামা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূল (সা) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করে রেখেছেন। কাজেই উত্তরাধিকারীদের জন্য কোনো অসিয়ত নেই।[৪৩]

পঞ্চমত:শব্দ বা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের অর্থ বর্ণনা দ্বারা। যেমন সূরা ফাতিহার **المغضوب عليهم**দ্বারা ইহুদী ও **الضالين** দ্বারা নাসারাদের উদ্দেশ্য করা। আদী ইবনে হাতিম (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই **المغضوب عليهم** হলো ইহুদী সম্প্রদায়, আর **الضالين** হলো নাসারা তথা খ্রিস্টান সম্প্রদায়।[৪৪]

ষষ্ঠত:নসখের বর্ণনা দ্বারা।যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো কখনো আল্লাহর দিক-নির্দেশনা বর্ণনা করেছেন, অমুক হুকুম অমুক হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কাজেই নবী করীম (সা)-এর বাণী, "ওয়ারিসের জন্য কোন অসিয়ত নেই এবং ওয়ারিসের আয়াত দ্বারা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বর্ণিত অসিয়তের আয়াতের হুকুমকে রহিত করে দেয় এবং তিলাওয়াত বাকি থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

৪১ আল-কুরআন : ৪ : ১১।

৪২ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, সহীহ মুসলিম নববীর শরাহসহ (কায়রো: আল-মাতবাআতুল মিসরিয়্যা, ১৩৪৭হি./১৯২৯খ্রি.), খ.১১, পৃ. ৮১।

৪৩ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ* (সিরিয়া: দারুল হাদীস, ১৯৭০খ্রি.), বাবুল অসিয়ত লিল ওয়ারিস, খ.৪, পৃ. ১৫০।

৪৪ **المغضوب عليهم هم اليهود وان الضالين هم النصارى** দ্র. আবূ ঈসা আত-তিরমিযী, জামিউত-তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু মিন সূরাতি ফাতিহাতিল কিতাব (বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াইত তুরাছ, তা.বি.), খ.৫, পৃ. ২০৪।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ

"আমি তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছি যে, যখন তোমাদের কারোর সামনে মৃত্যু হাযির হবে, তবে পিতা-মাতা ও নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজনের জন্য সঠিকভাবে অসিয়ত করে যাবে। আর খোদাভীরুদের উপর এটা দায়িত্ব বটে।"[৪৫]

ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "এর দ্বারা পিতা-মাতা ও নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসিয়ত সাব্যস্ত হয় এবং বিশুদ্ধ মতে এটা ওয়াজিব ছিল মীরাসের আয়াত নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত। আর যখন ফারাইয সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো, তখন পূর্বের আয়াত রহিত হয়ে যায় এবং প্রত্যেকের অংশ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে যায়।[৪৬]

প্রমাণ স্বরূপ নিম্নোক্ত হাদীসও পেশ করেছেন। আবূ দাঊদ (র) তাঁর সুনানে আবূ উমামা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাপককে তার প্রাপ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কাজেই ওয়ারিসের জন্য আর কোন অসিয়ত নেই।"[৪৭]

সপ্তমত:কুরআন কারীমের বর্ণিত হুকুমকে তাকীদ ও শক্তিশালী করা। কুরআন কারীমের বর্ণিত হুকুমকে তাকীদ ও শক্তিশালী করা। আর তা তখন প্রযোজ্য হবে, যখন হাদীসে বর্ণিত হুকুম কুরআন কারীমের অনুরূপ হবে। যেমন ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'তোমরা স্ত্রীগণকে সৎ উপদেশ দিবে। কেননা তাঁরা পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি আর পাঁজরের হাড় খুবই বক্র। কাজেই যদি তুমি তা সোজা করতে যাও তখন ভেঙ্গে যাবে। আর ঐ অবস্থা রেখে দিলে ক্রমশ বক্র হতে থাকবে। কাজেই স্ত্রীগণকে সৎ উপদেশ দিবে।"[৪৮]

আর এই হাদীসখানা আল্লাহর বাণী, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে।"[৪৯]-এর অনুরূপ।

অষ্টমত:কুরআন কারীমের চেয়ে অতিরিক্ত হুকুম বর্ণনা দ্বারা।যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى

"তোমরা সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের।"[৫০]

---

৪৫ আল-কুরআন: ২ : ১৮০।

৪৬ ইবনে কাসীর, খ.১, পৃ. ২১১।

৪৭ *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল ওসায়া, বাবু আল-ওসিয়াতি লিল ওয়ারিস, খ.৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১।

৪৮ সহীহ বুখারী, খ. ৯, পৃ. ২৫৩।

৪৯ আল-কুরআন : ১৯।

৫০ আল-কুরআন: ২:২৩৮।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, **الصلوة الوسطى صلاة العصر** "মধ্যবর্তী সালাত হচ্ছে আসরের সালাত।"[৫১]

আল-কুরআন সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যিম্মাদারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন। যে জন্যে দেখা যায়, আল-কুরআনের কোন একটা দিক কোন স্থানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলে অন্য স্থানে তা স্পষ্ট করে দেয়া হয়। এর পাশাপাশি নবী করীম (সা.)-কেও কুরআন বোঝার মতো প্রজ্ঞা ও মেধা দেয়া হয়েছিল। কেননা তিনি কুরআনের শিক্ষক হিসেবে অভিহিত, যা স্বয়ং কুরআনেই ঘোষণা করা হয়েছে।[৫২] তাই অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে, নবী করীম (সা.) সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে গোটা আল-কুরআনের বিষয়বস্তু বুঝতেন, এমনিভাবে সাহাবায়ে কিরামও বিস্তারিতভাব না হলেও মোটামুটিভাবে সে কুরআনের ব্যবহৃত হুকুমসমূহ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কুরআন নাযিলের প্রাথমিক পর্যায়ে কোন আয়াত অস্পষ্ট মনে হলে বা আয়াতের সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবনের জন্য সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট তা জিজ্ঞাসা করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সে সব আয়াতের অর্থ, হুকুম ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে তাফসীরের উৎপত্তি ঘটে এবং সাহাবীগণ কুরআনের যে সকল বিষয়ে বোঝার প্রয়োজন অনুভব করতেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তা ব্যাখ্যা করে দিতেন। এভাবে প্রশ্নোত্তর ও কুরআন হাদীসের সমন্বিত চর্চার মাধ্যমেই তাফসীর অভিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। আর রাসূলূল্লাহ (সা) হলেন মানুষের মধ্যে কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাকারী।[৫৩]

তাফসীর প্রাথমিক অবস্থায় হাদীসেরই অংশ ছিল। মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলনের পাশাপাশি তাফসীর সম্পর্কিত রিওয়ায়াত হাদীসের সাথে জুড়ে দেন। তখন ইলমে তাফসীর ছিল হাদীসের একটি শাখা। এ স্তরে তাফসীরের কোন পৃথক গ্রন্থ ছিল না। বরং বিভিন্ন শহরের আলিমগণের নিকট থেকে বর্ণিত হাদীস একত্রিত করে নবী কারীম (স) ও সাহাবীগণ (রা)-এর থেকে বর্ণিত তাফসীর তার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়।

তাফসীর শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

---

৫১ আবু ঈসা তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, সালাত অধ্যায়।

৫২ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

"তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মাঝে এমন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের মাঝে তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং আল-কুরআন ও হিকমত শিক্ষা দেন।" দ্র. আল-কুরআন: ৬২:২; আর এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়াতের প্রধান দায়িত্ব।

৫৩ ড. সুবহী সালিহ, *মাবাহি ফী 'উলূমিল কুরআন* (বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৫খ্রি.), পৃ. ২৮৯।

ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, তাফসীর সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে নবী করীম (সা.)-এর পর থেকে। কিন্তু পরবর্তী সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ দিক লাভ করে, যা সময়ের বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। সে অনুসারে তাফসীরের ক্রমবিকাশের ধারাকে প্রধানত ৩টি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক যুগের আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যুগ তিনটি নিম্নরূপ:[৫৪]

১. মৌখিক বর্ণনার যুগ: এটা নবী করীম (সা.) এর সময় থেকে নিয়ে তাবি'ঈগণের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগে কিছু কিছু সংকলন থাকলেও বর্ণনার ধারাটা বেশী প্রাধান্য পায়। যা ঐ যুগের একটা বৈশিষ্ট্যে রূপ নেয়। এটি হিজরী প্রথম শতকের তাফসীর। এ শতকে কুরআনের সম্পূর্ণ তাফসীর লিখিত হয়নি, তাফসীর সংশ্লিষ্ট ভাষ্যসমূহকে আলাদাভাবে সংকলনও করা হয়নি। এ শতকে তাফসীর সংকলিত বা সম্পাদিত হয়েছে মাত্র। এ কারণে হাদীসের সাথে এতদসংক্রান্ত আলোচনা সংমিশ্রিত দেখা যায়। হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে তাফসীর অধ্যায় সংযোজিত হয়।[৫৫]

২. সংকলন যুগ: তাফসীর সংকলনের যুগ ব্যাপকভাবে শুরু হয় উমাইয়া যুগের শেষ ও আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে। ঐ সময়ে সংকলনকর্ম ব্যাপক হারে হতে থাকে যে, তা ঐ সময়ের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যে রূপ নেয়। আবূ মুহাম্মদ ইসমাঈল ইবন আবদুর রহমান আল-কূফী আস-সীদী (র) (মৃ. ১২৭ হি./৭৪৪ খ্রি.) এবং আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন আল-জুরাইজ আল-মাক্কী আল-আসাদী (মৃ. ১৫০ হি./৭৬৭ খ্রি.)-কে স্বতন্ত্র তাফসীর রচয়িতাদের পথিকৃৎ মনে করা হয়।[৫৬] তারা ধারাবাহিকভাবে কুরআনের ভাষ্য রচনা করেন এবং হাদীস থেকে পৃথকভাবে স্বতন্ত্র গ্রন্থে কেবল তাফসীরই অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে এঁদের তাফসীর গ্রন্থের বিদ্যমানতা এখন পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায়নি। ইবন জারীর তাবারী (র) (মৃ. ৩১০ হি./৯২২ খ্রি.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'জামি'উল বয়ান' এবং ইমাম আবূ মনসূর আল-মাতুরীদী (র) (মৃ. ৩৩৩ হি./৯৪৪ খ্রি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাবীলাতু আহ্লিস-সুন্নাহ' গ্রন্থে এঁদের অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৫৭]

৩. আধুনিক যুগ: খ্রিষ্ট্রীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কাল থেকে একবিংশ শতাব্দী অবধি সময়কাল বুঝাতে আধুনিক শব্দটি বহুল প্রচলিত। তাছাড়া অধুনা জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তির উৎকর্ষ তথা শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে তাফসীর সাহিত্যের নবতর উৎকর্ষ এসেছে। যেমন– শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু রচিত 'তাফসীরুল মানার', আল্লামা জামালুদ্দীন কাসিমী রচিত 'মাহাসিনুত তা'বীল' (তাফসীরে কাসিমী), ড. মুহাম্মদ আস-সাইয়্যিদ তানতাভী রচিত 'আত-তাফসীরুল

---

[৫৪] ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, *তাফসীরুল কুরআন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

[৫৫] ড. যাহাবী, *আল-ইত্তিজাহাতুল মুনহারিকা ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম* (তা. বি.), পৃ. ১৪।

[৫৬] Dr. M.M. Rahman,Introduction to Al-mauridi's Ta'wilat, p. 83.

[৫৭] ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআন পরিচিতি* (ঢাকা: নুবালা পাবলিকেশন্স, ১৯৯২খ্রি.), পৃ. ২৩২।

ওয়াসীত লিল কুরআনিল কারীম, আবূ মুহাম্মদ আবদুল হাক হাক্কানী দেহলভী রচিত 'তাফসীরে হাক্কানী', মুফতী মুহাম্মদ শফী রচিত তাফসীরে 'মা'আরিফুল কুরআন' ইত্যাদি।

রাসূল (সা.)-এর যুগে তাফসীর চর্চা

রাসূল (সা.)-এর উপর কুরআন মাজীদ নাযিল শুরু হয় ৬১০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৫৮] এই সময়ের মধ্যে তার উপর কুরআন মাজীদ নাযিল সম্পন্ন হয়। কুরআন মাজীদের আয়াত ও সূরাসমূহ বিশ্লেষণ করে তাফসীরকারগণও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে, এর অধিকাংশ সূরা ও আয়াত নাযিল হয়েছে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য নিয়ে। অবশিষ্ট সূরা ও আয়াতসমূহে মানবজাতির জন্য অত্যাবশ্যক হিদায়াত বিবৃত হয়েছে। কুরআন মাজীদের ভাষা আরবী এবং এটি আরবী ভাষাভাষী লোকদের নিকট প্রেরিত হয়েছিল, যে কারণে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেই এর প্রাথমিক হিদায়াত লাভ করা সমকালীন লোকদের পক্ষে সম্ভব ছিল। তারপরও কোথাও যদি কোনো দুর্বোধ্যতা বা রহস্যময়তা থেকে থাকে, তা ব্যাখ্যা করার জন্য স্বয়ং রাসূল (সা.) প্রস্তুত ছিলেন। ফলে তাঁর জীবদ্দশায়সাহাবী বা অন্য কারো কুরআন মাজীদের তাফসীর করতে হয়নি বা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। বরং সকলেই প্রয়োজনীয়ব্যাখ্যাটি রাসূল (সা.)-এর নিকট থেকেই শুনতে আগ্রহী ছিলেন। এ কারণে রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায়কুরআন তাফসীরের অন্য কোন ধারা প্রত্যক্ষ করা যায়না। বরং নবী করীম (সা.)-ই এককভাবে এর ব্যাখ্যা দেয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন। বস্তুত এটি তাঁর নবুওয়াতী দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

"(আল্লাহর বাণী) প্রচার করাই কেবল রাসূলের কর্তব্য। আর তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ আল্লাহ তা জানেন।"[৫৯]রাসূল (সা) ছিলেন আল-কুরআনের প্রথম ভাষ্যকার। আল কুরআনকে জনসমক্ষে তুলেধরাই ছিল তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য।[৬০]তাই তিনি সাহাবীগণকে আল-কুরআনের যে মাহাত্ম শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদের সামনে এ মহাগ্রন্থের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন, তা থেকেই তাফসীর অভিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়। রাসূল (স.)-এর যুগে তাফসীরের গোড়াপত্তন হলেও তখন তা গ্রন্থাবদ্ধ হয়নি, বরং তা সাহাবীগণের স্মৃতিপটে

---

[৫৮] পবিত্র কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছিল হেরা গুহায়। এর পর বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রয়োজনে খণ্ড খণ্ড আকারে নবুওয়াতী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী এটি নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের তিন মাস পূর্বে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে একাদশ হিজরীর ১২ই রবীউল আওয়াল কুরআনের অবতরণ সমাপ্ত হয়। দ্র. শেখ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব নজদী, *মুখতাসার সীরাতে রাসূল* (মিশর: মাতবায়ে সালাফিয়া, ১৩৭৯হি.), খ.১, পৃ. ৭৫; জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী 'উলূমিল-কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১।

[৫৯] আল-কুরআন, ৫:৯৯।

[৬০] এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ"আমি আপনার প্রতি এক স্মারক (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানুষের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন এবং যাতে তারা গবেষণা করে।" দ্র. আল-কুরআন, ১৬:৪৪ ।

সংরক্ষিত ছিল। তারা আল-কুরআন মুখস্ত করার পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর যাবতীয় বাণীসমূহ মুখস্থ করে রাখতেন। এমনিভাবে নবী করীম (সা.) যুগে বিক্ষিপ্তভাবে তাফসীর সংরক্ষিত হয়।

হাদীস হলো কুরআন মাজীদের তাফসীর। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, হাদীসে রসূল (সা.) সে মূলনীতি বাস্তবায়নের পথ ও পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন। যে কারণে প্রতীয়মান হয়নবী করীম (সা.)-এর যুগে কুরআন মাজীদের তাফসীর হয়েছিল, তবে তা হয়েছিল সমকালীন জীবনযাত্রার চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য।

সাহাবী (রা.)-এর যুগে তাফসীর চর্চা

রাসূল (সা.)-এর ইন্তিকালের পর সাহবীগণের মধ্যে অনেকেই তাফসীর করেছেন। তাঁরা তাঁদের তাফসীরে বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করতেন। সাহাবীগণের তাফসীরের উৎসসমূহ: প্রথমত কুরআনুল কারীম: কেননা এর একটি আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ। দ্বিতীয়ত। সুন্নাতে রাসূল (সা.), সাহাবীগণ যখন কুরআনে কারীমের কোন ব্যাখ্যা পেতেন না, তখন তাঁরা নবী করীম (সা.)-এর বাণী দ্বারা তাফসীর করতেন। কেননা তাঁরা সর্বদা নবীজীর কাছে থাকতেন, উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন। আর নবীজীর চরিত্রই ছিল গোটা কুরআন মাজীদের ফলিত দিক।[৬১] হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত **كان خلقه القران** "তাঁর জীবনচরিত আল-কুরআন"।[৬২] তৃতীয়ত. তাঁদের ইজতিহাদ তথা গবেষণা। সাহাবীগণ যখন কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা কোন তাফসীর করতে সক্ষম হতেন না, তখন তাঁরা ইজতিহাদ দ্বারা তাফসীর করতেন। তাঁদের গবেষণা পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ[৬৩]:

১. আরবী ভাষার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য: ভাষার ব্যুৎপত্তিগত ও বাগধারাগত রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া তথা আরবী ভাষায়গভীর জ্ঞান লাভ ও তার অনুধাবন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে। আবূ উবায়দা মুজাহিদ থেকে এবং তিনি ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর বাণী **فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ** (আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা), এর অর্থ আমি বুঝতে পারছিলাম না। অতঃপর আমার কাছে দুজন গ্রাম্য বেদুঈন এসে একটি কূপের

---

৬১ নবী করীম (সা.)-এর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ কোন আয়াতের মর্ম উদ্ধারে জটিলতা অনুভব করলে তাঁর নিকট যেতেন। তখন তিনি সকল সমস্যা, সংশয়, সন্দেহ ও জটিলতা দূর করে দিতেন। যেমন– আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কুরআনে **صلوة الوسطى** বলতে আসরের নামাযকে বুঝিয়েছে।" দ্র.মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইবন হজার, ১৪২৪হি./২০০৪খ্রি.,) স.১, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং ১৮১, পৃ. ৭৫।

৬২ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ* (তা.বি.), খ. ৪১, পৃ. ৪৯, হাদীস নং ২৫৮১৩; https://www.alukah.net/sharia/0/136921/#_ftn1

৬৩ আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন, খ.১, পৃ.৫৮; ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, *তাফসীরুল কুরআন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৭৬-৭৭।

মালিকানা নিয়ে ঝগড়া শুরু করল। তাদের একজন বলল, **انا فطرتها** আমি এ কূপ খনন করেছি। দ্বিতীয়জন বলল, **انا ابتدايتها** আমি এ কূপ প্রথম শুরু করেছি। এ বিবাদ শুনে ইবনে আব্বাস (রা.) **فاطر** শব্দের অর্থ বুঝতে পারলেন।[৬৪]

২. জাহেলী যুগের আরবী কবিতা: কখনো আবার ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের কবিতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমে। যেমন– হযরত উমর ও ইবনে আব্বাস (রা.) করেছেন। হযরত উমর (রা) বলেন,

عليكم بديوانكم قالو وما ديواننا؟ قال شعر الجاهلية فان فيه تفسير كتابكم ومعنى كلامكم

'তোমরা তোমাদের দীওয়ান অধ্যয়ন করো। তারা প্রশ্ন করল, দীওয়ান কী? প্রত্যুত্তরে বললেন, দীওয়ান হচ্ছে জাহেলী যুগের আরবী কবিতা। নিঃসন্দেহে তাতে তোমাদের কিতাবের তাফসীর ও তোমাদের কালামের মর্মার্থ রয়েছে।"[৬৫] ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: আল-কুরআনের অর্থ সমূহ তোমরা প্রাচীন কবিতাসমূহে অনুসন্ধান করো, কেননা কবিতা হলো আরবের জীবনালেখ্য।[৬৬] যেমন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সূরা মায়িদার ৪৮ নং আয়াত **لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً**(তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরী'আত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি।) এ আয়াতে উল্লিখিত **شرعة**ও **منهاجا** শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে **شرعة** শব্দ দ্বারা দ্বীনকে বুঝানো হয়েছে। আর **منهاجا** দ্বারা সরল পথকে বুঝানো হয়েছে। এ মর্মে তিনি আবু সুফিয়ান আল-হারিছ ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের কবিতা উল্লেখ করেন:

لقد نطق المامون بالصدق ** وبين الاسلام دينا ومنهاجا

"মামুন সত্য কথাই বলেছে, ইসলাম হচ্ছে সহজ-সরল জীবন ব্যবস্থা।"[৬৭]

৩.আরববাসীদের জীবন যাত্রার পদ্ধতি: তথা স্বভাব-প্রকৃতি, আচার-আচরণ ও প্রথা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার মাধ্যমে। যেমন আল্লাহর বাণী:

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا

"তোমাদের ঘরের পিছনের দিক দিয়েপ্রবেশ করায়কোন পুণ্য নেই"।[৬৮] এই আয়াতের উদ্দেশ্য কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না, যদি তিনি সে আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়আরবদের প্রথা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত না হন।[৬৯]

---

৬৪ ড. হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৫।

৬৫ *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫৭-৫৮।

৬৬ আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দিন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫খ্রি.), খ.১, পৃ. ৮।

৬৭ *মানাহিজুল মুফাস্সিরীন* (রিয়াদ: দারুল মুসলিম, তা.বি.), ১ম ভাগ, পৃ. ৭৪; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *মুফাসসির পরিচিতি ও তাফসীর পর্যালোচনা* (রাজশাহী,সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৫৬।

৪.শানে নুযূল তথা অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমে: আল্লামা ওয়াহিদী বলেন: আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ জানতে না পারলে কারো জন্য আয়াতের তাফসীর কর সম্ভব নয়।[৭০] ইবনে দাকীক আল ঈদ (র.) বলেন, শানে নুযূল হলো-কুরআনের অর্থ উপলব্ধি করার শক্তিশালী মাধ্যম। ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন, শানে নুযূল জানা থাকলে তা কুরআনের আয়াত অনুধাবনের সহায়ক হবে। কেননা কোন বিষয়েউপলক্ষ জানা থাকলে সে বিষয়টা সম্পর্কে ধারণা জন্ম নেয়। এজন্য সাহবীগণ (রা.) তাফসীরের ক্ষেত্রে শানে নুযূলের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। এর উপর নির্ভর করতেন। আর তাঁরা তো ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী, আল-কুরআন নাযিলের সাথে সাথেই তাদের জীবনযাত্রা পরিবর্তন করছিলেন।

৫. বোধশক্তি ও গভীর উপলব্ধি করার ক্ষমতা: আলী (রা.)-কে যখন প্রশ্ন করা হলো, "কিতাবুল্লাহে যা আছে তাছাড়া আপনার কাছে নবী করীম (সা.)-এর কাছে আসা কোন ওহী আছে কি? তখন তিনি বললেন, না যিনি শস্য দানা সৃষ্টি করেন ও মানুষ তৈরি করেন তাঁর শপথ! কুরআন কারীমে মনোনিবেশকারীকে আল্লাহ তা'আলা যে বোধশক্তি দেন তাছাড়া আর কিছুই আমার কাছে নেই।"[৭১] আর সাহাবীগণের মধ্যে বোধশক্তি ও উপলব্ধি ক্ষমতায়ব্যবধান ছিল।

৬.আহলে কিতাবের বর্ণনা: কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ কিছু কিছু জায়গায় শরীয়াতের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হলে আহলে কিতাবদের (ইহুদী-নাসারা) সহায়তা নিতেন। কেননা আল-কুরআনে সার্বিক বিষয়ে দিক-নির্দেশনা এবং সমসাময়িক সমস্যার সমাধান ছাড়াও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিলের বক্তব্যও রয়েছে। যেমন, নবী-রাসূলগণের মু'জিযা ও ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা পবিত্র কুরআনে সংক্ষেপে এসেছে। সেগুলোর ব্যাখ্যা আহলে কিতাবদের জানা ছিল। তাই কিছু কিছু সাহাবী এসকল ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানার জন্য আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেনযেমন হযরত কাব আল-আহবার, আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.) প্রমুখের নিকট যেতেন।[৭২] নবী কারীম (সা)ও এ

---

৬৮ আল-কুরআন, ২:১৮৯।

৬৯ আরবগণ সফর থেকে ফেরার পথে পিছন দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাকে পুণ্যের কাজ মনে করত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন যে, তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

৭০ আবুল হাসান আল ওয়াহিদী, *আসবানুন নুযূল* (কায়রো: শারিকাতু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৮৭হি./১৯৬৮খ্রি.), পৃ. ৪।

৭১ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, খ.২, পৃ. ৬৯।

৭২ আত্-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন, খ. ১, পৃ.৬৩; ড. ইউসুফ আবদুর রহমান, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, (মুকাদ্দিমা), (তা.বি.), খ.১, পৃ.৫।

ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন: **حدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج** "তোমরা বনী ইসরাঈল হতে বর্ণনা করো, তাতে কোন দোষ নেই।"[৭৩]

তাওরাত ও ইঞ্জিল বিকৃত হওয়ার কারণে মুফাস্সিরগণ উক্ত কিতাবদ্বয়ের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতেন। আহলে কিতাবদের বর্ণনা কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কেবল সেসব বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য, যা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কুরআনের সাথে মিল বা গরমিল হলে সাহাবীগণ এক্ষেত্রে কোনো মন্তব্য না করে নীরব থাকতেন। এক্ষেত্রে তারা রাসূল (সা)-এর একটি হাদীসের উপর আমল করতেন।[৭৪] রাসূল (সা) বলেন, **فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم** "আহলি কিতাবদেরকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না আর বিশ্বাসও করো না।"[৭৫]

আলিমগণের মতে, ইসরাঈলী বর্ণনায় শুদ্ধাশুদ্ধি, গ্রহণীয় ও বর্জনীয় সবধরনের বর্ণনা আছে। এসব বর্ণনা শরী'আতের বিধি-বিধানের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না বলে মুফাস্সিরগণ সেগুলোর কিছু গ্রহণ করেছেন। এসব রিওয়ায়াত থেকে ধর্মীয় নীতি সাব্যস্ত হতে পারে না।[৭৬] কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম আহলে কিতাবের বর্ণনাকে গ্রহণ করলেও কুরআন, হাদীস সুন্নাহ ও ইজতিহাদের মতো এটাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কেননা আহলে কিতাবের ধর্মীয় উৎসগুলোতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। কাজেই তাঁরা শুধু ঐ সকল কথা গ্রহণ করতেন, যা তাদের আকীদার সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং আল-কুরআনের মূলনীতি ও শরীয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আল-কুরআনের সাথে বৈপরিত্য দেখা দিলে, তারাতা প্রত্যাখ্যান করতেন।[৭৭] তবে পরবর্তী বিদগ্ধ মুফাসসিরগণ ইসরাঈলী রিওয়ায়েত প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ এসব বর্ণনা তাফসীরকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

তাবি'ঈ[৭৮] যুগে তাফসীর

এ স্তরে তাফসীর অভিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাবি'ঈগণ তাফসীর বিদ্যায় জ্ঞান লাভের জন্য সাহাবীগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সাহাবীগণের সাথে দীর্ঘ সাহচর্যের কারণে তাঁরা অতি অল্পসময়ে এ বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।[৭৯] উল্লেখ্য যে, এ যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি

---

৭৩ *জামি'উত তিরমিযী ,কিতাবুল ইলম*, *বাবু মাজা ফিল হাদীস* 'আন বানী ইসরাঈল, হাদীস নং ২৬৬৯, পৃ. ৭৪৩; *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন*, খ.১, পৃ. ৫৮।

৭৪ ড. হুসাইন আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৬২।

৭৫ শায়খওয়ালী উদ্দীন আত-তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ* (দিল্লী: দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, তা.বি.), পৃ. ১৬।

৭৬ যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান* (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, তা.বি.), খ.২, পৃ. ২৫।

৭৭ ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, *তাফসীরুল কুরআন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

৭৮ তাবি'উন শব্দের অর্থ- অনুসরণকারী। পরিভাষায় যিনি কোন একজন সাহাবীকে ঈমানের সাথে দেখেছেন এবং মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবি'ঈ বলা হয়। দ্র. আবদুর রহমান জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর-রাবী ফী শারহি ফী তাকরীবুন-নববী* (করাচি: মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, ১৩২৯হি./১৯৭২খ্রি., স.২, পৃ.২৩৪; মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, *কাওয়া'ইদুল ফিক্হ* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ১৩৮১হি./১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ২১৭।

৭৯ মুহাম্মদ আবদুর রহীম মুহাম্মাদ, *তাফসীরুত্-তাবি'ঈন* (মক্কাতুল মুকাররমাহ: আল-মাকতাবাতুত-তিজ্জারিয়্যাহ, ১৪১৩হি./১৯৯৩খ্রি.), স.১, পৃ. ১৭।

বিস্তৃতি লাভ করলে তাবি'ঈগণ সাহাবীগণের সাথে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা যেখানেই পদার্পণ করেছেন সেখানেই আল-কুরআন ও সুন্নাহ প্রচার ও প্রসারে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা মুসলমানদেরকে জ্ঞান দানের জন্য আসর বা মজলিসের ব্যবস্থা করতেন। এ সমস্ত মজলিসে তাবি'ঈগণ উপবেশন করে সাহাবীগণের নিকট থেকে আল কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান আহরণ করতেন এবং অর্জিত এ জ্ঞান তাদের অনুপস্থিত বন্ধু বান্ধবদের নিকট পৌঁছে দিতেন। সাহাবীগণের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ যুগে বহু তাফসীর চর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠে।[৮০] তাঁরা ছিলেন উক্ত কেন্দ্রসমূহের শিক্ষক এবং তাবি'ঈগণ ছিলেন ছাত্র। এ যুগে তাফসীর চর্চার তিনটি কেন্দ্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। নিম্নে এ কেন্দ্র তিনটির বিবরণ প্রদত্ত হলো:

১. মক্কা কেন্দ্র

তাবি'ঈগণের যুগে যে সমস্ত তাফসীর চর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল তন্মধ্যে মক্কা ছিল উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন এ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মসজিদুল হারামে নিয়মিত দারস দিতেন। তাঁর এ দারসে শত শত তাবি'ঈ উপবেশন করে তাফসীর সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করতেন।[৮১] ইবনু আব্বাস (রা.) তাঁদের সামনে আল-কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্ব উপস্থাপন করতেন। আর তাঁরা তা হৃদয়ঙ্গম করতেন।[৮২]

এ কেন্দ্রের ছাত্ররা অন্যান্য কেন্দ্রের ছাত্রদের অপেক্ষা তাফসীরে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। এ জন্যই ইমাম ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) নিয়মিত দারস প্রদানের কারণে মক্কায় বসবাসরত তাবিঈগণ তাফসীর অভিজ্ঞানে অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।[৮৩]

এ কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য ছাত্ররা হলেন, সাঈদ ইবনে জুবায়র (র.) (মৃ.৯৪হি.), মুজাহিদ (র.) (মৃ.১০৩হি.), ইকরামাহ মাওলানা ইবন আব্বাস (র.) (মৃ. ১০৫হি.), তাউস ইবন কায়সান ইয়ামানী (র.) (মৃ. ১০৬হি.), আতা ইবন আবীরাবাহ আল-মাক্কী (র.) (মৃ. ১১৪হি.) প্রমুখ।[৮৪]

২. মদীনা কেন্দ্র

মক্কা কেন্দ্রের পাশাপাশি মদীনাতেও তাফসীর চর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠে।[৮৫] তাফসীর চর্চার জন্য এখানে উর্বর ক্ষেত্র ও সুষম পরিবেশ বিরাজিত ছিল। মদীনা ছিল নবী করীম (সা.) ও

---

৮০ মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮।

৮১ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন* (বৈরূত: ইলমুল কুতুব, ১৪০৫হি./১৯৮৫খ্রি.), স.১, পৃ. ৭৭; ইবন তাইমিয়া, মাজমুআয়ে ফাতওয়া (রিয়াদ: আর-রুআসাতুল আম্মাহ, তা.বি.), খ.১৩, পৃ. ৩৪৭।

৮২ মুহাম্মদ আবু যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসূন* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল আরবী, ১৪০৪হি./১৯৮৪খ্রি.), পৃ. ১০৩।

৮৩ ইবন তাইমিয়া, *ফাতওয়া*, খ.১৩, পৃ. ৩৪৭।

৮৪ মুহাম্মদ আলী আস-সাবূনী, *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

তৎপরবর্তী খলীফাগণের যুগে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের রাজধানী। ফলে এ নগরী জ্ঞানীগুণীদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৮৬]

তাবিঈগণের যুগে সাহাবীগণের প্রচেষ্টায় এ শহরে তাফসীর চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) এ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।[৮৭] তিনি নিয়মিত তাফসিরের দারস দিতেন। বিপুল সংখ্যক তাবিঈ এ দারসে সমবেত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে হযরত আবুল আলিয়া (মৃ.৯৩হি.), যাইদ ইবনে আসলাম আল-আবুদী আল-মাদানী (মৃ.১৩৬হি.),মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল কুরাযী (রা) (মৃ.১১৭হি.), মালিক ইবন আনাস (মৃ.১৭৯হি.), আতা ইবন আবী মুসলিম খুরাসানী (মৃ.১৩৫হি.) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩. ইরাক কেন্দ্র

এ যুগে ইরাকেও তাফসীর চর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। ইরাক বিজয়ের পর এখানে অনেক সাহাবী দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। বিশেষ করে ইরাকের তিনটি শহর কুফা, বসরা ও বাগদাদে অসংখ্য সাহাবীর শুভাগমন ঘটে। নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে কুরআন, সুন্নাহ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তাঁদের অনেকেই এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ঐতিহাসিক ইবনে সাদের মতে, হুদায়বিয়ার সন্ধিতে শপথগ্রহণকারী ৩০০জন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ৭০জন সাহাবী কূফা নগরে আগমন করেন।[৮৮] সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা.)সহ বহু সাহাবীর স্থায়ী আবাসস্থল হওয়ায় এখানে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাদানের কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করে। হিজরী প্রথম শতাব্দীতে এ কেন্দ্রে যে সকল তাবি'ঈ মুফাস্সির তাফসীর শাস্ত্রে অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে আলকামা ইবন কায়স (মৃ. ৭৩হি.), মাসরূক ইবন আল-আযদী (মৃ.৬৩হি.), আসওয়াদ ইবন ইয়াযিদ (মৃ. ৭৫হি.), মুররা আল-হামাদানী (মৃ.৭৬হি.), আমীর আশ-শা'বী (মৃ.১০৯হি.), হাসান আল-বাসরী (মৃ. ১১০হি.) প্রমুখ অন্যতম।

তাবি-তাবি'ঈন যুগে তাফসীর

---

৮৫ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত্-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন* (তা.বি.), খ.১, পৃ.৯০-৯৩; আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ১০২।

৮৬ ইয়াকূত ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-হামুবী, *মু'জামুল বুলদান* (বৈরূত: দারুস্-সাদির, ১৯৫৭খ্রি.), খ.৫, পৃ. ৮৩।

৮৭ মুহাম্মদ আবদুল আযীয, আয-যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৬খ্রি.), খ.২, স.২, পৃ. ১৯।

৮৮ মুহাম্মদ ইবন সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা* (লাইডেন: মাতবা'আতু বিরী, ১৩৩০হি.), পৃ. ৪; আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন, খ.১, পৃ. ১১৮।

তাবি'ঈগণের পথ অনুসরণ করে তাবি-তাবি'ঈনগণ ব্যাপকভাবে তাফসীর চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় বিভিন্ন শহরে স্বতন্ত্রভাবে তাফসীর চর্চা কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[৮৯] এ যুগে তাফসীর গ্রন্থাবদ্ধ হয়। এ যুগের সূচনা ঘটে উমাইয়া যুগের শেষ এবং আব্বাসীয় যুগের প্রথম পর্যায়ে। এর পূর্বে তাফসীর গ্রন্থকারে সংকলিত হয়নি। এ সময়ে তাফসীর হাদীসের অধ্যায় হিসেবে সংকলিত হয়। মুহাদ্দিসগণ নবী করীম (সা.)হাদীস সংগ্রহ করে বিভিন্ন অধ্যায় ও উপাধ্যায়ে বিভক্ত করে হাদীসের সংকলন প্রস্তুত করেন। আর তাফসীর ছিল এ সংকলিত হাদীস গ্রন্থের একটি অধ্যায়। এ যুগে যে সমস্ত মুহাদ্দিস নবী করীম (সা.), সাহাবী (রা.) ও তাবি'ঈগণের (র.) তাফসীর সংক্রান্ত বাণী হাদীস গ্রন্থসমূহে নির্দিষ্ট শিরোনামের অধীনে সংকলন করে তাফসীর অভিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলেন, আবু মুহাম্মদ সুফইয়ান ইবন উয়াইনা (মৃ. ১৯৮হি.), ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (মৃ. ১৯৬হি.), ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ (মৃ. ২৩৮হি.), ইমাম বুখারী(মৃ. ২৫৬ হি.), ইমাম মুসলিম (মৃ.২৬১হি.) এবং সিহাহ সিত্তার সুনান গ্রন্থসমূহের অন্যান্য ইমামগণ।

তাবি-তাবি'ঈ পরবর্তী যুগে তাফসীর

এ যুগে তাফসীর হাদীস গ্রন্থ থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র শাখার রূপ লাভ করে। আলিমগণ আল-কুরআনের সূরা ও আয়াতের ক্রমধারা অনুযায়ী আয়াতের তাফসীর পৃথক গ্রন্থে সংকলন করেন। এ সময় যে সমস্ত মুহাদ্দিসের নিরলস প্রচেষ্টায় আয়াত ও সূরা ভিত্তিক তাফসীর রচিত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযাগ্য হলেন, ইবন মাজাহ, ইমাম ইবন আবী হাতিম প্রমুখ।

এ যুগে সনদ ব্যতিরেকে তাফসীর সংক্রান্ত রিওয়ায়াত একত্রিতকরে গ্রন্থ রচনা করা হয়। সনদ বাদ দিয়ে তফসীর রচনার এ পদ্ধতি ও ধারাকে ইসলামের শত্রুরা মোক্ষম সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে নবী করীম (সা.)-এর মিথ্যা উদ্বৃতি দিয়ে জাল হাদীস বানানোর ফলে তাফসীরের পরিমণ্ডলে ঢুকে পড়ে অনেক জাল হাদীস ও ইসরাঈলী রিওয়ায়াত। যার কারণে বিশুদ্ধ তাফসীরের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

এ যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যেমন– আরবী ভাষা-সাহিত্য, কালাম ও দর্শন প্রসার লাভ করে। এ সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগত নিজস্ব বিষয়ের আঙ্গিকে তাফসীর রচনায় প্রবৃত্ত হন। ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের আলোকে, ভাষাবিদ ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে, দার্শনিক দর্শনের নিরীখে তাফসীর রচনায় আত্মনিয়োগ করতে লাগলেন। ফলে তাফসীর লেখকের

---

[৮৯] মুহাম্মদ আবু যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ১০০; মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত পৃ. ১০০।

প্রভাবে প্রভাবিত হয়।কালক্রমে তাফসীর অভিজ্ঞানে দুটি প্রধান ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তৃতি ঘটে। যার দিগন্ত আব্বাসীয় যুগ থেকে শুরু হয় এবং বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে আছে।[৯০]

তাফসীরের ধারা: তাফসীরের ধারাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১.রিওয়ায়াত ভিত্তিক ধারা।

২.দিরায়াত ভিত্তিক ধারা।

১. রিওয়ায়াতভিত্তিক ধারা

রিওয়ায়াত ভিত্তিক ধারা বলতে তাফসীর বিল মাছূরকে বুঝানো হয়ে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রণীত তাফসীরকে তাফসীর বিল মাছূর (**تفسير بالمأثور**) বলা হয়। এতে চিন্তাপ্রসূত অভিমতের স্থান নেই।[৯১] তাফসীর বিল মাছূর তিন ভাগে বিভক্ত।

ক. তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন (تفسيرالقرآن بالقرآن): এক আয়াতের তাফসীর অন্য আয়াতের মাধ্যমে করা হলে তাকে 'তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন' বলে। আল-কুরআনের একটি আয়াতের তাফসীর এরূপ অন্য আয়াতের মাধ্যমে করা অধিক বিশুদ্ধ তাফসীর হিসাবে বিবেচিত হয় থাকে।[৯২] যেমন সূরা ফাতিহায় এসেছে **يوم الدين** (বিচারের দিন)। এর তাফসীরে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ - ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ - يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ -

"আপনি জানেন, বিচার দিবস কী? অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কী? যেদিন কেউ কোনো উপকার করতে পারবে না এবং সে দিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।"[৯৩]

খ. তাফসীরুল কুরআন বিস্‌সুন্নাহ (تفسير القرآن بالسنة): নবী করিম (সা)-এর সুন্নাহ দ্বারা আয়াতের তাফসীর করাকে তাফসীরুল কুরআন বিস্-সুন্নাহ বলা হয়। আলিমগণ এ পদ্ধতিতে বর্ণিত তাফসীরকে বলিষ্ঠ তাফসীর মনে করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"সালাতকায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রাসূল-এর আনুগত্য করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।"[৯৪]

---

৯০ *মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

৯১ মানাহিলুল ইরফান, খ.২, পৃ. ১৪; *আত্-তিবইয়ান ফি উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৬১; *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৩৪৭; মুহাম্মদ যফযাফ, *আত তা'রীফ বিল কুরআন ওয়াল হাদীস* (কায়রো: আল-মাকতাবাতুল মিসরিয়্যা, ১৩৯৬হি.), পৃ. ১৬৮।

৯২ আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসীরিন, খ.১, পৃ. ৩৭-৩৮।

৯৩ আল-কুরআন, ৬ : ৮২।

৯৪ আল-কুরআন, ২৪: ৫৬।

উক্ত আয়াতে সালাত কায়েমের পদ্ধতি কী হবে তা বলা হয়নি। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত আদায়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে বলেন[৯৫]:

صلوا كما رأيتمونى أصلى

"তোমরা সালাত আদায় করো, যেমনভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ।"

গ. তাফসীরুল কুরআন বি আকওয়ালিস সাহাবাতি ওয়াত তাবি'ঈন (تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين**):**

সাহাবী ও তাবি'ঈগণ থেকে কুরআনের যে সব তাফসীর বর্ণিত হয়েছে তাকে তাফসীর বি আকওয়ালিস সাহাবাতি ওয়াত তাবি'ঈন বলা হয়। এ প্রকারের তাফসীর নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য তাফসীর বলে আলিমগণ মত প্রকাশ করেন।[৯৬] উপর্যুক্ত তিন প্রকারের সমন্বয়ে তাফসীরকে তাফসীর বিল মাছূর বলা হয়। তাফসীর সংকলন যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এ ধারা অবলম্বনে বহু তাফসীর গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। তাফসীর বিল মাছূরের ভিত্তিতে তাফসীর করা কয়েকটি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ হলো- তাফসীরুল মিকয়াস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস (**تفسير المقياس من تفسير ابن عباس**), তাফসীরু মুজাহিদ (**تفسير مجاهد**), তাফসীরুল হাসান আল-বসরী (**تفسير الحسن البصري**), তাফসীরু সুফিয়ান আছ-ছাওরী (**تفسير سفيان الثوري**), তাফসীরু আব্দির রাযযাক (**تفسير عبد الرزاق**), তাফসীরুন নাসাঈ (**تفسير النسائي**) ইত্যাদি।

২. দিরায়াত ভিত্তিক ধারা

তাফসীরের দ্বিতীয় ধারা হলো দিরায়াত ভিত্তিক তাফসীর। কুরআন, সুন্নাহ, আরবী সাহিত্য ও বৈয়াকরণিক তথ্যের ভিত্তিতে উপলব্ধি ভিত্তিক তাফসীর। কেউ কেউ বলেন, কুরআন সুন্নাহর কোন আয়াত বা শব্দের ব্যাখ্যা খুঁজে না পাওয়া গেলে শরঈ প্রমাণের আলোকে গবেষণার ভিত্তিতে যে তাফসীর রচিত হয় তাই তাফসীর বিদ-দিরায়াত বা তা'বীল। তাফসীর বিদ-দিরায়াত তা'বীল রূপে গৃহীত। শরী'আতের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং এ ভাষার রীতিনীতি অনুসারে পরিবেশিত, যা আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বুঝার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফাসসির নিজ খেয়ালখুশি অনুযায়ী বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েতাফসীর করেন না, বরং এতে আরবী ভাষা জ্ঞান, আরবদের বাক্যরীতি, আরবী ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, ফিকহ, শানে-নুযূল ইত্যাদি প্রয়োজনীয়বিষয়বিবৃত করার লক্ষ্যে তাফসীর করা

---

৯৫ ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, খ.১, পৃ. ৬৩১; ইবনে হাজার আসকালানী, *শরহে সহীহ আল-বুখারী*, খ.১৩, পৃ. ২৪৩; https://www.islamweb.net.

৯৬ *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০; *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন*, খ.১, পৃ. ১২৮।

হয়। এ পর্যায়েমুফাসসির পূর্ণ ঈমানদারী ও তাকওয়ার ভিত্তিতে কুরআন হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাফসীর করেন। নবী করীমের (সা.) সুন্নাহ এবং সাহাবীগণের বাণী থেকে কুরআনের কোন আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত না থাকা অবস্থায়এরূপ তাফসীর শুধু জায়েয নয়, বরং প্রশংসনীয়। এক দল আলিমের মতে বর্ণনাভিত্তিক তাফসীর সহজবোধ্য করার সুবিধার্থে কুরআন, সুন্নাহ, আরবী ব্যাকরণ ও অভিধান ভিত্তিক তথ্যের আলোকে শব্দ ও বাক্য বিশ্লেষণসহ গবেষণামূলক তাফসীর করার প্রয়োজন রয়েছে।

এ ধরনের তাফসীর শরী'আতের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ, ভ্রষ্টতা ও মূর্খতামুক্ত, আরবী ভাষার ব্যাকরণের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং এ ভাষার রীতিনীতি অনুসারে পরিবেশিত, যা আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বুঝার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাফসীর সংকলনের যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি দিরায়াহ-তথা ব্যাকরণিক ও অভিধানিক উপলব্ধির ভিত্তিতে বহু তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যা জনসমাজে গৃহীত তাফসীর হিসেবে প্রশংসা পেয়েছে। যেমন–তাফসীরুল জালালাইন, তাফসীরিল বায়দাভী, রুহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম, তাফসীরে কাবীর, তাফসীরুল মাযহারী ইত্যাদি।

তাফসীর বির রায়

আরবী رأي (রায়) শব্দটির বাংলা অর্থ হচ্ছে- অভিমত, মত, চিন্তা, ধারণা, বিবেচনা, সিদ্ধান্ত, প্রস্তাব, উপদেশ, পরামর্শ ইত্যাদি।[৯৭]*তাফসীরবির রায়*বলা হয় এমন তাফসীরকে, যা তাফসীরের প্রকৃত জ্ঞান ব্যতীত, প্রবৃত্তির অনুসরণ করে শরী'আত ও ভাষাগত বোধগম্যতা ছাড়া করা হয়, অথবা ভ্রান্ত বা বিদ'আতী কোন মাযহাবের ভিত্তিতে তাফসীর করা। এ ধরনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাফসীর শব্দটির প্রয়োগও যুক্তি সংগত নয়।[৯৮] ইসলামের বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়যেমন–মুতাযিলা, খারিজী, শীআ, রাফিযীদের খ্যাতনামা আলিমগণও উক্ত তাফসীর রচনায়প্রবৃত্ত হন। তারা নিজেদের ভ্রান্ত আকীদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল-কুরআনের বহু আয়াতের অপব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফলে ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের তাফসীরের মানগত মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। যদিও তারা তাদের রচিত তাফসীর গ্রন্থে আল-কুরআনের ইজায, আরবী ভাষা ও ব্যাকরণতত্ত্বের চমকপ্রদ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।

উপসংহার

মোটকথা হচ্ছে, ইসলামী শরীয়তকে জানতে হলে এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হলে কুরআনের স্পষ্ট জ্ঞান অপরিহার্য। তবে এক্ষেত্রে মনগড়া ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়ার কোন সুযোগ

---

৯৭ ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, *তাফসীরুল কুরআন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮।

৯৮ আত-তিবইয়ান ফী 'উলূমিল কুরআন, পৃ. ১৫৭।

নেই। তাফসীর হচ্ছে কুরআনের ভাষা হতে আল্লাহ তা'আল্লার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা। আর এটা তাওফীকী অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূলের ভাষ্যের উপর নির্ভরশীল। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে কোন আয়াতের ব্যাখ্যা না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ আয়াত সম্পর্কে মনগড়া বা বিবেকপ্রসূত কোন ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না। আরবী বাগধারা ও ইসলামের মৌল আকীদা পরিপন্থি যেকোনো সংযোজন সর্বোতভাবে গর্হিত কাজ বলে সর্বদা বিবেচ্য।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬১ বর্ষ ১ম- ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.

বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ ও প্রতিকার : একটি অনুসন্ধান

আব্দুল্লাহ আল মামুন*

Abstract*: Marriage is a strong family and social bond. Men and women marry when they reach a certain age. The main purpose of marriage is to protect oneself from adultery, to protect the mother race, to have good children, to protect the human race, to gain happiness. People marry for a happy life, but everyone marries. Not happy, extreme reality leads to separation. Divorce is increasing at an alarming rate today, breakup of marriages at very short intervals of marriage is now being observed regularly. Therefore, the main objective of the study is to present the outline of divorce in Bangladesh, highlight the causes of divorce and explain the Islamic view of creating a happy family. In order to complete this research, data has been collected mainly from secondary sources. Notable sources are - Holy Quran, Hadith, various journals, books, Islamic periodicals, daily newspapers etc. Findings from the study show that both families and sons and daughters are delaying marriage, divorce is higher in educated societies, women are interested in living a luxurious life, want to stay away from in-laws and relatives, prefer to delay childbearing and Most couples are not friendly.*

Abstract words: Divorce, Causes of divorce, Islam.

[সারসংক্ষেপ:*পারিবারিক ও সামাজিক মজবুত একটা বন্ধনের নাম বিবাহ। নারী-পুরুষ নির্দিষ্ট একটা বয়সে উপনীত হলে বিবাহ করে। বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা, মাতৃজাতিকে রক্ষা, সুসন্তান লাভ, মানব বংশধারা রক্ষা, সুখ লাভ করা। সুখী জীবনের জন্য মানুষ বিবাহ করে, কিন্তু বিবাহ করে সবাই সুখী হয় না, চরম বাস্তবতা মেনে বিচ্ছেদ ঘটায়। বর্তমানে উদ্বেগজনক হারে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে, বিবাহের খুব সামান্য ব্যবধানে দাম্পত্য জীবনে ভাঙন এখন প্রতিনিয়ত লক্ষ করা যাচ্ছে। অতএব গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো- বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদের রূপরেখা উপস্থাপন পূর্বক বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ তুলে ধরা এবং সুখী পরিবার গঠনের জন্য ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা। এই গবেষণা সম্পন্ন করার জন্য মূলত মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য উৎস হলো-পবিত্র কুরআন, হাদীস, বিভিন্ন জার্নাল, বই-পুস্তক, ইসলামী সাময়িকী, দৈনিক পত্রিকা ইত্যাদি। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে,পরিবার ও ছেলে-মেয়ে উভয়ই বিবাহ করতে বিলম্ব করছে, শিক্ষিত সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ তুলনামূলক বেশী, নারীরা বিলাসী জীবন যাপনে আগ্রহী, শশুর বাড়ীর লোক ও আত্মীয় স্বজন থেকে দূরে থাকতে চায়, সন্তান নিতে বিলম্ব করতে পছন্দ করে এবং অধিকাংশ দম্পতি বন্ধু সুলভ নয়।*

নির্যাস শব্দ: *বিবাহ বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদের কারণ, ইসলাম।]*

* এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা

সামাজিক বন্ধনের একটি অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গের নাম বিবাহ। পৃথিবীতে মানব আগমনের ধারাবাহিকতার একমাত্র চলমান প্রক্রিয়া বিবাহ। শুধু শারীরিক প্রয়োজন পূরণের জন্যই নয়, বরং বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক কাঠামো এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিধান। আবহমান কাল থেকে পৃথিবীতে বিবাহের ধারাবাহিকতা চলে আসছে। পথ ও পদ্ধতি ভিন্ন হলেও মূলত সমাজসিদ্ধ কিংবাধর্মসিদ্ধ পদ্ধতিকেই বিবাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। সৃষ্টিগতভাবেই নারী পুরুষ একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট, তাই ইসলাম বৈবাহিক বিধান দিয়েছে। বিবাহের মাধ্যমে একজন অপরজনের মাঝে শান্তি খুঁজবে। কারণ মানুষ শান্তির পেছনেই অনন্তর ছুটে চলে। গায়ের ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উপার্জন শান্তির জন্য, সুখ-শান্তির প্রকৃত উদাহরণ হলো বৈবাহিক বন্ধন। মানুষ সুখ লাভের জন্যবিবাহকরে, কিন্তু বিবাহ করে সবাই সুখী হয় না, কেউ কেউ সুখ থেকে বঞ্চিত হয়। কারো দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে দ্বন্দ-কলহ, কারো আশানুরূপ সহযোগীর অভাব হয়, কেউ হয় প্রবঞ্চনার শিকার।এরূপ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিলে তখন বিবাহ বিচ্ছেদই হয় একমাত্র সমাধান। দাম্পত্য জীবনে সমস্যা থাকবে তবে বিবাহ বিচ্ছেদই একমাত্র সমাধান নয়, সেদিকে খেয়াল রাখলে সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ রোধ করা সম্ভব হবে। বর্তমান গবেষণায় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে সুখী পারিবারিক জীবনের জন্য ইসলাম কী ব্যবস্থা রেখেছে, আর সেটা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা দ্বারা কীভাবে মানুষের জীবন সমস্যামুক্ত থাকতে পারে।

গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী

১. বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদের রূপরেখা উপস্থাপন করা;
২. বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ তুলে ধরা;
৩. বিবাহ বিচ্ছেদ ও সুখী পরিবার সংক্রান্ত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা এবং
৪. প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কিছু সুপারিশমালা প্রস্তাব করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত মাধ্যমিক তথ্য নির্ভর। মাধ্যমিক তথ্যের উৎসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পবিত্র কুরআন, হাদীস, বিভিন্ন পুস্তক, জার্নাল, দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েব সাইট ইত্যাদি।

বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদেরচিত্র

বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ, যার প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষ মুসলিম। এদেশের মানুষ পারিবারিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত, যার অন্যতম মাধ্যম হলো বিবাহ। বিবাহ ব্যতিরেকে কেউ পারিবারিক জীবন পরিচালনার কথা কল্পনা করে না। এমনকি এটা সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয় এবং দেশীয় ব্যবস্থাপনার প্রকৃতিতে অনুমোদিতও নয়। দেশীয় ব্যবস্থাপনার প্রাচীন ও প্রচলিত রূপ হলো নারী-পুরুষ বিবাহের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন করে। পিতা-মাতা তাদের

উপযুক্ত সন্তানকে বিবাহ দিয়ে সাংসারিক কিংবা পারিবারিক জীবনের সূচনা করে দেয়। সমসাময়িক সময়ে দেখা যাচ্ছে এই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ফাটল ধরছে, কারণ দেশে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে। বিবাহ বিচ্ছেদ শুধু গ্রামাঞ্চলে নয় শহরাঞ্চলেও উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলছে। সরকারী ও বেসরকারী পরিসংখ্যান এবং সামাজিক গবেষণায় এমন চিত্র দেখা যাচ্ছে ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এ খবর প্রায়ই প্রকাশ হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ পরিসংখ্যানে যে তথ্য আমরা দেখতে পাই তা একটি সারণীর মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

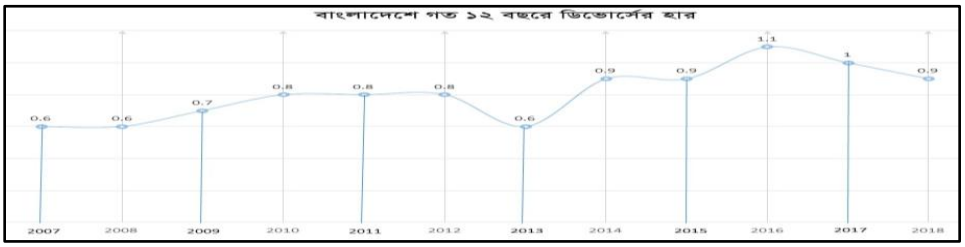

বাংলাদেশে ২০০৭ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদের হার। সূত্র:BBS ২০১৮[২]

২০০৭ সালে যে হারে বিবাহ বিচ্ছেদ ছিল ২০১৭ সালে সেটা বৃদ্ধি পেয়ে দিগুণেরও বেশী হয়েছে। ২০০৬ সালে ডিভোর্সের হার ছিল ০.৬, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ১.১ হয়েছে প্রতি হাজারে। দৈনিক ২৬টি তালাকের আবেদন করা হচ্ছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে এবং তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছর পূর্বের তুলনায় এই হার বাড়ছে। তথ্য ও উপাত্ত মোতাবেক দুই সিটি কর্পোরেশনে তালাকের আবেদন ২০১২ সালে ছিল ৫৩৫৩ সেটা ২০১৭ সালে হয়েছে ৭৪৫৮।[৩]এক্ষেত্রে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনও পিছিয়ে নেই। রাজশাহী অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী বিবাহ বিচ্ছেদ সেখানে প্রতি হাজারে ১.৯ এবং খুলনা অঞ্চল ১.৩ প্রতি হাজার। নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হলো ২০১২ থেকে ২০১৭ সনের ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে (উত্তর ও দক্ষিণ) ডিভোর্স আবেদনের সংখ্যা।

ক্রমিক নং	বছর	ঢাকাউত্তর সিটি কর্পোরেশনে ডিভোর্স আবেদনের সংখ্যা	ঢাকাদক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ডিভোর্স আবেদনের সংখ্যা
১.	২০১২	২৮৮৪	৪৫১৮
২.	২০১৩	৩২৩৮	৪৪৭০
৩.	২০১৪	৪৪৪৫	৪৬০০

[২] BBS (Bangladesh Bureau of Statistics) (2018). Report on Sample Vital RegistrationSystem 2018, Dhaka: Ministry of Planning, Government of People's Republic of Bangladesh.

[৩] 'Divorce doubles, separation triples in one decade', the daily star, August 04, 2017.

৪.	২০১৫	৪০৭৭	৪৭৬১
৫.	২০১৬	৪৮৪৭	৪৮৯৭
৬.	২০১৭	৫০৪৬	৫২৪৫

সূত্র:BBS 2017[৪]

উপরিউক্ত বিবাহ বিচ্ছেদের পরিসংখ্যান মুসলমান এবং মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে কোনভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সম্মানজনক নয়। অতিমাত্রায় বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে দেশ ও সমাজহুমকি ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ইসলাম যে আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার কথা বলে সেটায় ঘাটতি থাকার ফলে এ ধরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ অনুসন্ধান পূর্বক ইসলাম এ বিষয়ে কী সমাধানের কথা বলেছে সে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হবে।

বাংলাদেশেরবিবাহ বিচ্ছেদের বিশেষ কিছু কারণ

বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। সামাজিক গবেষণায় বিবাহ বিচ্ছেদের নানাবিধ কারণ পাওয়া গেছে। যেমন- সম্পদের লোভ ও বিলাসবহুল জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ও পরকীয়া, অহংকার ও ক্রোধ, যৌতুক ও যৌতুকের জন্য শারীরীক ও মানসিক নির্যাতন, ধৈর্যধারণ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা, পারিবারিক সমর্থনের অভাব, দাম্পত্য সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বল্পতা, যৌন অক্ষমতা ও পুরুষত্বহীনতা, বাল্যবিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব, ফেসবুকের আসক্তি, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতার অভাব, অবাস্তব প্রত্যাশা, মাদক গ্রহণ, প্রত্যাশিত কাজের অপ্রাপ্তি, দ্বন্দ ও বিতর্ক প্রবণতা, আর্থিক সচ্ছলতা, অসুস্থতা ও স্বাস্থ্য জনিত সমস্যা, উপযুক্ত সঙ্গী না হওয়া, জোর পূর্বক বিবাহ, স্বামী নিখোঁজ হওয়া, স্বামীর পুনরায় বিবাহ, সন্তান না হওয়া, সংসারের প্রতি উদাসীনতা, আইন-কানুন সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি।[৫] ঘটনা ও প্রেক্ষাপটের আলোকে বিবাহ বিচ্ছেদের কতিপয় কারণ নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. সম্পদের লোভ

পাত্র-পাত্রী একে অপরের সম্পদের খোঁজ-খবর নিয়েবিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এটা বিবাহপূর্ব নিয়ম এবংসমাজ ও ধর্মমতে স্বীকৃত প্রথা। তবে বর্তমানে লোভের বশবর্তী হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ারফলে বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।সংবাদ প্রতিবেদনে দেখা যায়-মিতু

---

৪ Sawkia Afroz. The Rise of Divorce in Bangladesh: A Review in the Change of Marriage Dynamics. *Social Sciences,* Vol. 8, No. 5, 2019, pp. 261-269. doi: 10.11648/j.ss.20190805.17

৫ *Journal of Divorce & Remarriage*, 53:639–651, 2012, Copyright © Taylor & Francis Group, LLC, ISSN: 1050-2556, print/1540-4811 online, DOI: 10.1080/10502556.2012.725364.

নামের জনৈক নারী শুধুমাত্র দেনমোহরের ৩৫ লক্ষ টাকার জন্য স্বামীকে তালাক দেন।[৬]অন্য আরেকটি প্রতিবেদনে দেখা যায়- যশোরের *চৌগাছায় কোটি টাকার সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে স্বামীকে তালাক দিয়েছেন এক নারী*[৭] ।প্রবাসী স্বামীর পাঠানো টাকা হাতিয়ে নিয়ে খুন করেছে স্বামীকে।[৮] স্বামী প্রবাসে থাকায় পরকীয়া অতঃপর তার পাঠানো টাকা নিয়ে স্ত্রী ও প্রেমিকের হাতে খুন হয়েছেন জনৈক ফজলুর রহমান।[৯] দেনমোহরের টাকার জন্য এগার বার বিয়ে করে কারাগারে গিয়েছে জনৈক নারী।[১০]উপর্যুক্ত ঘটনা ও তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় সম্পদের লোভে বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক/পরকীয়া

পরকীয়া সম্পর্ক গুরুতর অপরাধ।[১১] এ অপরাধ সামাজে সংক্রামক ব্যাধির আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। এটা ব্যক্তি ও সামাজিক একটি অপরাধ।[১২] বিভিন্ন কারণে নারী-পুরুষ পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। সামাজিক যোগাযোগ (Socoal Media) মাধ্যমের যথেচ্ছ ব্যবহার, খেয়াল খুশি মতে জীবন যাপন করা, পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী পরিবার অবলম্বন করা, স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যথেষ্ট পরিমাণ সময় না দেয়া, টিভি সিরিয়াল ও নাটক-সিনেমার কুপ্রভাব এবং অন্ধ অনুকরণ; এছাড়াও বেকার যুবকদের মোবাইলের মাধ্যমে সম্পর্ক ও প্রতারণা, কতিপয় নারীর অতি আবেগী মানসিকতা ও উচ্ছৃংখল চলাফেরা পরকীয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ।[১৩] পরকীয়ার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. যৌতুক ও নির্যাতন

যৌতুক ও যৌতুকের জন্য নির্যাতন বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যতম একটি কারণ।[১৪] দৈনিক পত্রিকাগুলোতে যৌতুক বিষয়ক অসংখ্য খবর প্রত্যহ শিরোনাম হয়। 'যৌতুকের জন্য এমন

---

৬ 'দেনমোহরের ৩৫লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়াই ছিল মিতুর উদ্দেশ্য,' দৈনিক যুগান্তর, যুগান্তর ডেক্স, ২ ফেব্রুয়ারী ২০১৯।

৭ *'চৌগাছায় কোটি টাকার সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে স্বামীকে তালাক,'* বাংলা নিউজ২৪, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২।

৮ *'বেনাপোলে জামাল খুনের ঘটনায় স্ত্রীসহ শ্বশুর-শাশুড়ি আটক'* বাংলা নিউজ২৪, ১৫ মে, ২০১৯।

৯ *'পরকীয়ার জের ধরে স্ত্রী ও তার প্রেমিকের হাতে খুন,'* বাংলা নিউজ ২৪, ১৫ এপ্রিল, ২০১৬।

১০ বিডি মর্নিং, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

১১ The doctrine and law of marriage, adultery, and divorce.Hector davies morgan, m.a. vol. 1. Oxford, printed by w.baxter, 1826.

১২ A Comparative Approach to Incest and Adultery, Jack Goody, The British Journal of Sociology, Vol. 7, No. 4 (Dec., 1956), pp. 286-305, Published by: Wiley on behalf of The London School of Economics and Political Science, DOI: 10.2307/586694.

১৩ মিন্নি-রিফাত নিয়ে ২৬শে জুন দেশের সকল দৈনিক পত্রিকার রিপোর্ট।

১৪ *Jack Goody, Production and Reproduction: A Comparative Study of the Domestic Domain* (english language)kembrige: kembrige University press.(1976),pag 8;

নির্যাতন'[১৫], 'পটুয়াখালীতে যৌতুক না দেয়ায় স্ত্রীর মাথা ন্যাড়া করে নির্যাতন,'[১৬] 'যৌতুক না পেয়ে গরম তেলে পোড়াল স্ত্রীকে'[১৭] সাম্প্রতিক কিংবা পূর্বের এমন হাজারো ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে আছে দৈনিক কিংবা অনলাইন পত্রিকাগুলো।[১৮]

৪. বাল্য বিবাহ

বাল্য বিয়ের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে।[১৯] এমনও দেখা যাচ্ছে, পুতুল খেলার বয়স পার হয়নি তাকেও বিয়ে দিচ্ছে পরিবার। যে নিজের যত্ন নেয়া শেখেনি, তাকে স্বামী-সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়, একজন বালিকা মেয়ের জন্য এটা অমানবিক। আমাদের দেশে বিবাহ পরবর্তী একজন নারীকে সাংসারিক প্রায় সব দায়িত্ব বুঝে নিতে হয়।[২০] এমনও দেখা যায় অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত পুত্রবধূকে দিয়ে শাশুড়ী প্রায় সকল কাজ করাচ্ছেন, কিন্তু তার নিজের প্রাপ্তবয়স্ক কন্যাকে কোন কাজ করতে দিচ্ছেন না। একজন 'মা' যে কাজ নিজ কন্যাকে করতে দেয় না শাশুড়ী হয়ে সে কাজ পুত্রবধুর উপর চাপিয়ে দেয়। বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী যাচাই করতে গিয়ে লোভের বশবর্তী হয়ে অতিদ্রুত বিবাহ সম্পন্ন করতে দেখা যায়। যার ফলে বৈবাহিক জীবনে নানা রকম অশান্তি দেখা দেয়। আবার পাত্র/পাত্রী পছন্দ হয়েছে সুতরাং হাত ছাড়া করা যাবে না তাই দ্রুত বিবাহ সম্পন্ন করেন কোন অভিভাবক।[২১] অপরিনামদর্শী এসব কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের মত ঘটনা ঘটে থাকে।

---

*Modern Loves: The Anthropology of Romantic Courtship & Companionate Marriage. Jennifer S. Hirsch, Prof Jennifer Sue Hirsch, PH D, Holly Wardlow. University of Michigan Press, 2006 - 234 pages;*কাজী এবাদুল হক (জানুয়ারি ২০০৩)। "যৌতুক"। সিরাজুল ইসলাম। [বাংলাপিডিয়া]। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ। আইএসবিএন ৯৮৪-৩২-০৫৭৬-৬।

[১৫] বাংলা ইনসাইডার, ১৮ অক্টোবর ২০১৯, চট্টগ্রাম প্রতিদিন, ১৮ অক্টোবর ২০১৯।

[১৬] বিডি মনিং ১৮ অক্টোবর ২০১৯।

[১৭] রাইজিং বিডি, ১৫.১০.১৯।

[১৮] *Modern Loves: The Anthropology of Romantic Courtship & Companionate Marriage. Jennifer S. Hirsch, Prof Jennifer Sue Hirsch, PH D, Holly Wardlow. University of Michigan Press, 2006 - 234 pages"BBC - Ethics - Honour crimes" / bbc.co.uk /*

[১৯] Percentage of women aged 20 to 24 years who were first married or in union before ages 15 and 18,UNICEF.

[২০] শিশুবিবাহ তত্ত্বের ভাষা ও বাস্তব দশা: একটি ঘটনা বিশ্লেষণ, ড. মো. আমিনুল হক, সৈয়দা কুদসিয়া নাহরীন, সাবিলা-ই-রাব্বি, সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা, [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি], খণ্ড৯ম, সংখ্যা৯, পৌষ ১৪২২/ডিসেম্বর২০০১৫, পৃ ৮৭,*"United Nations Statistics Division - Demographic and Social Statistics."*

[২১] শিশুবিবাহ তত্ত্বের ভাষা ও বাস্তব দশা: একটি ঘটনা বিশ্লেষণ, ড. মো. আমিনুল হক, সৈয়দা কুদসিয়া নাহরীন, সাবিলা-ই-রাব্বি, সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা, [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি], খণ্ড৯ম, সংখ্যা৯, পৌষ ১৪২২/ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৯৪।

৫. মাদক

মাদকসেবন একটি অপরাধ, এটি ব্যক্তি ও পরিবার সবার জন্য হুমকি স্বরূপ।[২২] মাদক জীবনকে তিলে তিলে শেষ করে দেয়, জীবন্ত লাশে পরিণত করে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি পরিবারের জন্য অভিশাপ। দেশের যুব সমাজ ধ্বংস ও পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে এই মাদকের কারণে। কারণ মাদকাসক্ত ব্যক্তি উপার্জনে অক্ষম হয়। কোন সুস্থ নারী দেখতে চায় না তার স্বামী রাস্তায় মাতলামী করবে কিংবা মদ্যপ অবস্থায় ঘরে ফিরবে। অধিকাংশ মাতাল স্বামী ঘরে ফিরে যৌতুক দাবী করে অথবা মাদকের অর্থ যোগানে স্ত্রীকে নির্যাতন করে। এসব ঘটনা যাচাই করলে দেখা যায় যে, বিবাহ বিচ্ছেদের মতো ঘটনা মাদকাশক্তির কারণেও হয়ে থাকে।[২৩]

৬. আর্থিক সচ্ছলতা

পারিবারিক আইন ১৯৮৫ অনুযায়ী যেসব কারণে স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক দিতে পারেন তার দ্বিতীয় কারণ হলো*'স্বামী দুই বৎসর যাবৎ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দানে অবহেলা প্রদর্শন করলে অথবা ব্যর্থ হলে;'* উক্ত আইন অনুযায়ী *'স্ত্রী সর্বাবস্থায়স্বামীর কাছে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী। স্বামীর সঙ্গতি থাক বা না থাক স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে স্বামী বাধ্য। স্ত্রী ধনী এবং সম্পদশালী হলেও ভরণপোষণের অধিকার বাতিল হয়না। বিবাহ বিচ্ছেদের পর তিন মাস পর্যন্ত 'ইদ্দতকালীন' সময়েওস্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে স্বামী বাধ্য। আইনে ভরণপোষণকে বলে খোরপোষ'।*[২৪]বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় অনেক সক্ষম পুরুষ কাজ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী ও শশুর বাড়ীর সম্পত্তির দিকে তাকিয়ে থাকে। এরূপ পরিস্থিতি কোন স্বাভাবিক স্ত্রী ও তার পরিবার মেনে নিতে পারে না। যে কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের মতো ঘটনা ঘটে থাকে।

৭. স্বামীর পুনরায় বিবাহ

স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের কারণে স্ত্রী তালাক নেন বা তালাক দিতে আদালতের স্বরণাপন্ন হন অনেক নারী।[২৫] এদেশের নারীগণ পতিভক্তি থেকেই মূলত স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ মনেপ্রাণে অপছন্দ করেন, কোনভাবেই স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ মেনে নেয়না।[২৬] স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করলে

---

২২ Nutt D, King LA, Saulsbury W, Blakemore C (march)।"Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse"।*Lancet*।**369** (9566): 1047–53।

২৪ বাংলাপিডিয়া, পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫।

২৫ Walther, Wiebke (1993 ,(Women in Islam। New York, New York: Marcus Weiner Publishing। Page 57।

২৬ Ahmed, Leila 1992,(Women and Gender in Islam। New Haven: Yale UP। Page 78-64।)

তালাক দিয়ে চলে যায়।[২৭] এমন মানসিতার প্রধান কারণ হলো দ্বিতীয় বিবাহ করে প্রথম স্ত্রীর কোন খোঁজ-খবর না নেয়া এবং সকল চাহিদা ও দেখাশোনায় দ্বিতীয় স্ত্রীকে প্রধান্য দেয়া। তাই অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ মেনে না নেয়া এদেশীয় নারীদের একটি যৌক্তিক কারণ।

৮. জোরপূর্বক বিবাহ

জোরপূর্বক বিবাহ হলো কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছা বা সম্মতির বিরুদ্ধে বিবাহ দেয়া।[২৮] শরীয়ত ও জাতিসংঘ জোরপূর্বক বিবাহকে মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করে। কারণ এটি ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের পরিপন্থি।[২৯] বিবাহ দিতে পাত্র-পাত্রীর মতামত নেয়া জরুরী।[৩০] বিবাহ একটি বন্ধন, বলা হয় 'পবিত্র বন্ধন'। এটা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করলেই 'পবিত্র বন্ধন' বলা যাবে। পরিবারের উচিত পাত্র-পাত্রীদের মতামত মূল্যায়ন করে তাদের উপযুক্ত পাত্রস্থ করা। মনে রাখতে হবে-সংসার যে করবে সেই মুখ্য, যে সংসারের সদস্যই নয় তার মতামত গৌণ।[৩১]

৯. স্বামীর নিখোঁজ হওয়া

গবেষণায় দেখা যায় অনেক নারীর স্বামী নিরুদ্দেশ, কোন খোঁজ-খবর নাই। বছরের পর বছর নিরুদ্দেশ থাকলে দেশীয় সংস্কৃতিতে স্বামীহীনা স্ত্রীর কী অবস্থা হয় তা বলাবাহুল্য। পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ অনুযায়ী যেসব কারণে স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক দিতে পারেন তার প্রথম কারণ হলো*'চার বছর পর্যন্ত স্বামী নিরুদ্দেশ থাকলে' স্ত্রী স্বেচ্ছায় আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া এবং কোন পক্ষ আদালতের আশ্রয় নিয়ে বিবাহ নাকচ করতে পারে।*[৩২]

১০. যৌন অক্ষমতা ও পুরুষত্বহীনতা

যৌন অক্ষমতা একজন পুরুষের দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা।[৩৩] বর্তমানে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। পর্ণগ্রাফি, অতিরিক্ত ইন্টারনেট আসক্তি, অবাধ যৌনতা ও

---

[২৭] Mir-Hosseini, Ziba (*200*" ,(6Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law andFeminism", Critical Inquiry, 32 (4): 641.

[২৮] উইকিপিডিয়া।

[২৯] উইকিপিডিয়া।

[৩০] Kecia Ali. "Consent and Forced Marriage," 19 June 003. http://www.muslimmatrimonial.com/muslimmatrimonials/articles/islamic/marriage/consent-and-forced-marriage.shtml, accessed 8 June 2005.

[৩১] *Sharp, Nicola* /"Forced Marriage in the UK: A scoping study on the experience of women from Middle Eastern and North East African Communities"*(PDF) /London:* Refuge*: 6, 10* /

[৩২] বাংলাপিডিয়া, পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫

[৩৩] Ghai, A. (2001). Marginalisation and disability: experiences from the Third World. Disability and the life course: Global perspectives, pp 26-37.

ব্যভিচার, হস্তমৈথুন, সমকামিকা, মাদক ও এ্যালকোহল সেবন পুরুষত্বহীন করে দেয়,[৩৪] যা বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হয়। এসব আত্মবিধ্বংসী কাজ থেকে নিজে নিরাপদ থাকা ও অধীনস্থদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কাম্য।

১১. পারিবারিক সমর্থনের অভাব

বিবাহ পরবর্তী দাম্পত্য জীবনে সুখের অভাব হয় না। তারপর শ্বশুর বাড়ী বেড়াতে যাওয়া, দেনা-পাওনা, আত্মীয়-স্বজনদের উপহার-উপঢৌকন দেয়া-নেয়া নিয়ে শুরু হয় ঝামেলা। এই ঝামেলার দায় এসে পড়ে বাড়ীর বউ এর উপর। আবার স্বামী-স্ত্রীর মাঝে নিজেদের ছোট-খাট বিষয় নিয়ে বাক-বিতণ্ডা হলে সেটা বাড়ীর অভিভাবক মহল নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। মেয়ের বাড়ীর লোকজন মেয়েকে আটকে রেখে আলাপ-আলোচনা করতে চায়। আমাদের দেশে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে পারিবারিক দায়িত্ব প্রশংসাযোগ্য হলেও বিবাহ বিচ্ছেদে পারিবারিক ভূমিকা বহুলাংশে নিন্দাযোগ্য।[৩৫] অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক চাপে বাধ্য হয়ে তালাক দেয় স্বামী কিংবা স্ত্রী।[৩৬] অভিজ্ঞতায় এমনও দেয়া যায় স্বামী-স্ত্রী মিলতে চাইলেও অভিভাবক মহল তাতে বাঁধ সাধে, যা বিবাহ বিচ্ছেদে গড়ায়।

১২. বৈবাহিক আইন সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব

মনে রাখতে হবে 'বিবাহ একটি চুক্তি' নামা।[৩৭] শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সর্বোপরি ধর্মীয় একটি চুক্তিনামা। একটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হচ্ছি অথচ সে সম্পর্কে ব্যক্তির কোন জ্ঞান থাকবে না, এটা কাম্য নয়। স্ত্রীর অধিকার কী? এটা কতজন পুরুষ জানে। আবার স্বামীর অধিকার কী? এটাই বা কতজন স্ত্রী জানে। এজন্য আইন-কানুন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। খাওয়া-পরাই শুধু অধিকার নয় এর বাইরেও অনেক অধিকার রয়েছে।

কাবিননামায় স্বামী-স্ত্রী না জেনে স্বাক্ষর করে থাকে, এটা একটা বড় দলিল। এখানে প্রায় বিশটি কলাম রয়েছে, প্রতিটি কলাম সরকার কর্তৃক একটি আইন, যা দাম্পত্য জীবনে মেনে

---

[৩৪] Saks BR (april 15,2008)। "Common issues in female sexual dysfunction"। Psychiatric Times। 25 (5)।

[৩৫] "উপেক্ষিত নারী ভাষা সংগ্রামী," অনন্যা ম্যাগাজিন, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৭।

[৩৬] 'স্ত্রীকে তালাক না দেওয়ায় শিকলে বন্দী মিল্টন,' কালের কণ্ঠ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

[৩৭] *Haviland, William A.; Prins, Harald E. L.; McBride, Bunny; Walrath, Dana (2011) / Cultural*

Anthropology: The Human Challenge (13th edition) /Cengage Learning / "A nonethnocentric definition of marriage is a culturally sanctioned union between two or more people that establishes certain rights and obligations between the people, between them and their children, and between them and their in-laws."

চলার জন্য স্বামী-স্ত্রী অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই আইনের কারণেই রেজিস্ট্রিকৃত 'কাবিননামা' আদালতে দায়ের করা মামলার ডকুমেন্ট হিসাবে উপস্থাপন করা হয়।

গবেষণায় বিবাহ বিচ্ছেদের আরো অনেক কারণ জানা গেছে। যেমন- অহংকার ও ক্রোধ, পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঘনিষ্ঠতার অভাব, অবাস্তব প্রত্যাশা, প্রত্যাশিত বিষয়ে অপ্রাপ্তি, দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক প্রবণতা, দীর্ঘ মেয়াদী অসুস্থতা, উপযুক্ত সঙ্গী না হওয়া ইত্যাদি।

বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের সকল সমস্যার সুন্দর সমাধান দিয়েছে ইসলাম। ইসলামী নির্দেশনা মতে জীবন পরিচালনা করলে শুধু পারিবারিক জীবনই নয়, বরং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সকল ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণতা বিরাজ করবে। পরিবার হচ্ছে রাষ্ট্র ও সামাজের একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, এ প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা সমস্যামুক্ত থাকলে আত্মউন্নয়নে সচেষ্ট হলে ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্র উন্নতি করবে। তাই মহান আল্লাহ তা'আলা প্রথম মানব আদম (আ.) কে সম্বোধন করে বলেছিলেন- *'তুমি তোমার পরিবার নিয়ে বসবাস করো।'*[৩৮]অর্থাৎ সুন্দর সমোঝতাপূর্ণ ও সুখ-শান্তির সাথে বসবাস। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- *'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদেরকে যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।'*[৩৯]পরিবারের শান্তি নিশ্চিত করার জোর তাগিদ দিয়েছে ইসলাম।

শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে অন্যতম প্রয়োজনীয় সম্পদ। মানুষ সম্পদ উপার্জন করবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু প্রাচুর্যের মোহ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। পবিত্র কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন *"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।*[৪০]" ইসলামী শরীয়ত সম্পদ উপার্জনকে একটি অন্যতম ফরয ইবাদত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৪১]

স্ত্রীর ভরণপোষণের সক্ষমতা থাকলেই বিবাহের অনুমতি দিয়েছে ইসলাম।[৪২] কারণ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নে সামাজিক ও দৈহিক উভয় বিবেচনাতেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এই প্রয়োজনীয়তা নারী-পুরুষ সকলের জন্য। কারো প্রয়োজন ছোট করে দেখার অবকাশ নাই। লিংগভেদে প্রয়োজনের তারতম্য থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর সহাবস্থান ইসলাম পছন্দ করে। পবিত্র

---

৩৮ আল কুরআন ২:৩৫

৩৯ আল কুরআন ৩০:২১।

৪০ আল কুরআন, ১০২:১-২।

৪১ আল মাকাসিদুল হাসানাহ ফিমা ইশতাহারা আলাল আলসিনাহ্, হাদীস নং ৭৬৫, ইসলাম ওয়েব. নেট।

৪২ সহীহ মুসলিম শরীফ, তৃতীয় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০১০, হাদীস নং ৩২৬৮, পৃ. ৩৩০।

কুরআনের বাণী *"তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন আর তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়।*[৪৩]তাই শান্তির জন্য স্বামী-স্ত্রী একসাথে বসবাস করা জরুরী। স্ত্রীকে ছেড়ে একজন স্বামী অনধিক চারমাস প্রবাস জীবন কাটাতে পারে, দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) নিজ কন্যা হাফসা (রা.) কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে সে সময় মুজাহিদদের জন্য সর্বোচ্চ চারমাস বাইরে থাকার সময়সীমা নির্ধারণ করেছিলেন।[৪৪]

তালাকের ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখায় যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী একে অপর থেকে দূরে থাকার ফলে তারা পরকীয়ায় লিপ্ত হচ্ছেন। জীবনের প্রয়োজনে একে অন্যের থেকে আলাদা থাকতে হলে, সময়টা যেন খুব বেশী না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে সচেষ্ট হলে আমাদের জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে।

মানুষ সামাজিক জীব, পরিবার কিংবা সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাসের ফলে কখনো ক্রোধের শিকার হয়। এই ক্রোধ দমন করা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। অহংকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন- *'নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে বড় হওয়ার গৌরব করে ও অহংকার করে।'*[৪৫]কুরআনে কারীমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,*'মানুষের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে কথা বলো না এবং পৃথিবীতে গর্বের সঙ্গে চলবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বড়াইকারী ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'*[৪৬]অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- *'ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করোনা; তুমি তো কখনোই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিতে পারবেনা এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবেনা'।*[৪৭]হাদীস শরীফে এসেছে *আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তীতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই প্রকৃত বাহাদুর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।*[৪৮]অহংকার ও দাম্ভিক আচরণ ত্যাগ করা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জরুরী। অহংকার একটা ধ্বংসাত্মক ব্যাধি, অহংকারী এবং রাগী মানুষের হিতাহিত জ্ঞান

---

৪৩ আল কুরআন,৭:১৮৯।

৪৪ ইসলামী প্রবন্ধমালা, এ. জেড. এম. শামছুল আলম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ: বৈশাখ ১৪১১, সফর ১৪২৫, এপ্রিল ২০০৪, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন, পৃ২৯৬, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক হাদীস নং-১২৫৯৪।

৪৫ আল কুরআন, ৪:৩৬।

৪৬ আল কুরআন,৩১:১৮।

৪৭ আল কুরআন, ১৭:৩৭।

৪৮ সহীহ বুখারী শরীফ, পরিচ্ছেদ: ক্রোধ থেকে বাঁচা, ৯ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৬৮৪, পৃ. ৪৫৩ তৃতীয় সংস্করণ, জুন ২০০৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

থাকে না ফলে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারে ও করতে পারে। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সহযোগী, প্রতিযোগী নয়। এটা সকলের বুঝতে হবে, হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন-*'দুজনের পারস্পারিক ভালোবাসার জন্য বিবাহের মতো (উত্তম) আর কিছু নাই'।*[৪৯]অথচ সামান্য কারণে এই মধুর সম্পর্কের ভাঙ্গন এখন প্রতি নিয়ত লক্ষ করা যাচ্ছে।

দাম্পত্য জীবন শুরু হয় নারী তথা স্ত্রীর সম্মান ও তার অধিকার দিয়ে, বিবাহ বন্ধনের প্রারম্ভিকতায় পুরুষের জন্য মোহর প্রদান বাধ্যতামূলক করেছে ইসলাম। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা- *'তোমরা নারীদের তাদের পাওনা মোহর প্রদান করো'।*[৫০]

শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়ে পুরুষের তুলনায় নারীকে কিছুটা দুর্বল করে সৃষ্টি করা হলেও সম্মানের দিক দিয়ে তাকে সবার উপরে রাখা হয়েছে। মা হিসাবে নারীর সম্মানে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, স্ত্রীকে সম্মান ও সদাচরণ রাসূল (স.) এর অসিয়ত, বোনের সাথে সুসম্পর্ক ও সদাচরণ রিযিকে বরকত আনে। কন্যা সন্তানকে আদর মহব্বতের সাথে লালন পালনে জান্নাতের গ্যারান্টি। অন্য সকল নারী মুসলিম উম্মাহর কাছে মা অথবা বোন সমতুল্য। পবিত্র কুরআনে নারীর উপর পুরুষের 'বিশেষ মর্যাদা'র অর্থ হলো রক্ষণাবেক্ষণ ও পারিবারিক দায়িত্বের বোঝা থাকবে পুরুষের উপর, সে পরিবারের অভিভাবক, তার সকলের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে ও কর্তব্য পালন করতে হবে। স্বভাবতই অভিভাবকের বিশেষ মর্যাদা থাকে। সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

'নারীদের জন্য ঠিক তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে তাদের উপর, তবে নারীদের উপর পুরুষের (বিশেষ) মর্যাদা রয়েছে'।[৫১]

লক্ষ্যণীয় যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অধিকারের যে শব্দ চয়ন (وَلَهُنَّ) করেছেন তাতে নারীর অধিকারের কথা আগে বলেছেন তারপর পুরুষের অধিকারের (عَلَيْهِنَّ) কথা বলেছেন। নারী কর্তৃক পুরুষকে কোন অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব কিংবা উৎসাহ দেয়নি ইসলাম, বরং পুরুষকে ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের গুরু দায়িত্ব দিয়ে সেটা যথাযথ আদায়ে উদ্বুদ্ধ করেছে, দায়িত্ব পালন না করলে শাস্তির হুমকি দিয়েছে। স্ত্রী থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা বা যৌতুক প্রদানের যে রীতি প্রচলিত আছে সেটা ইসলাম সমর্থন করে না। যৌতুকের জন্য নির্যাতন? সেটা ইসলামে কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছে। যৌতুক নিয়ে কোন পুরুষ বিবাহ করেছে, এমন কোন ঘটনা ইসলামের প্রথম যামানায় পাওয়া যায় না। তবে শর্ত ব্যতীত এবং

---

৪৯ সুনানু ইবনে মাজাহ, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১৮৪৭, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৬২, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০০৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৫০ আল কুরআন, ৪:৪।

৫১ আল কুরআন, ২:২২৮।

মানসিক আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত যদি মেয়ের পিতা তার মেয়েকে কিংবা জামাতাকে কিছু প্রদান করে সেটা গ্রহণে শরীয়তের কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। ইসলাম নারীকে পুরুষের অধীন করেছে এবং সকল কষ্টের কাজ থেকে মুক্ত রেখেছে। উপার্জন করবে পুরুষ, ঘরে বসে নারী রাণীর মতো সাজসজ্জা করবে, সন্তান প্রতিপালনের গুরু দায়িত্ব বহণ করবে। নারীকে আল্লাহ বানিয়েছেন দুনিয়ার জান্নাত। তিনি স্বামীর জন্য প্রশান্তি, সন্তানের জন্য আশ্রয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- *"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদেরকে যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন"।*[৫২] অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- *"তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন।যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়"।*[৫৩] ইরশাদ করা হয়েছে, *"নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে"।*[৫৪]হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-*"দুনিয়া হচ্ছে (ক্ষণিক) উপভোগের বস্তু। আর এর সর্বোত্তম সম্পদ নেককার নারী"।*[৫৫]

একমাত্র ইসলামই নারীকে সর্বোচ্চ সংরক্ষিত রেখেছে। পরপুরুষ তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। নারীদেরকে আল্লাহ আদেশ করেছেন তারা যেন নিজেদেরকে সংরক্ষিত রাখে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "(হে নবী!) *"মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া নিজেদের আবরণ প্রদর্শন না করে। তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। তারা যেন নিজেদের আবরণ প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যারা যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো নিকট, হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"।*[৫৬]

---

[৫২] আল কুরআন,৩০:২১।

[৫৩] আল কুরআন,৭:১৮৯।

[৫৪] আল কুরআন,৩:১৪।

[৫৫] মিশকাত শরীফ, চতুর্থ খণ্ড, হাদিস একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-নভেম্বর ২০১৬, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ৩০৮৩, পৃ. ২০৭; মুসলিম ১৪৬৭, নাসাঈ ৩২৩২; আহমাদ৬৫৬৭; সহীহ আল জামি ৩৪১৩।

[৫৬] আল কুরআন,২৪:৩১।

তাছাড়া সৃষ্টি ও উদ্দেশ্য বিচারেও গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান নারীর অধিকার। নারীকে মুখোমুখি হতে হয় ঋতুচক্রের, ধারণ করতে হয় গর্ভ, সহ্য করতে হয় প্রসব বেদনা, স্তন্যদান ও আনুষাঙ্গিক দায়িত্ব। সর্বোপরি তাকে পালন করতে হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম লালন-পালনের গুরুভার।

ধৈর্যধারণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ একটি মহৎ গুণ। এগুণের অধীকারী ব্যক্তি প্রশংসার যোগ্য। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেন- "*হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত আছেন।*"[৫৭]ধৈর্য ধারণ করা সাধারণ কোন বিষয় নয়, খোদাভীরু ব্যতীত অন্যদের জন্য এটা কঠিন। স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন- "*তোমরা সালাত ও সবরের সাহায্যে মদদ চাও এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ভীরু ছাড়া তা অবশ্যই কঠিনতম কাজ।*"[৫৮]আমরা খেয়াল করে দেখতে পারি, সূরা বাকারার উল্লিখিত দুটি আয়াতেই নামাযের আগে সবরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'সবর না করলে নামাযও ঠিক মত আদায় হবেনা'। সবর ও ধীরস্থিরতা আল্লাহ ও রাসূল (স.) এর পছন্দনীয় একটি গুণ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) আশাজ্জ আব্দুল কায়েসকে বলেছেন, "নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দুটি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন; "*সহনশীলতা ও চিন্তা-ভাবনা করে করে কাজ করা।*"[৫৯] সবরের গুণ অর্জন করা আমাদের সকলের অবশ্য কর্তব্য। আধ্যাত্মিকতার প্রথম ধাপ হলো ক্রোধ দমন ও ধৈর্য ধারণ। আমাদের নবী (স.) কে মানবতার নবী বলা হয়, তার জীবনীর শিক্ষাই হলো উম্মতকে ক্ষমা করতে শেখা। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) একবার নবী (স.) প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি কদরের রজনী প্রাপ্ত হই তবে কী দোয়া করব? তিনি জবাবে বললেন '*বলো হে আল্লাহ্, নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন*'।[৬০]সবর না থাকার ফলে বিবাহের মতো একটি ভালবাসার সম্পর্ক মূহুর্তেই শত্রুতায় পরিণত হয়। 'চুইংগামের মতো সামান্য বিষয় নিয়েও তালাক দিতে পারে মানুষ'।

পারিবারিক জীবনে প্রতিটি ব্যক্তির উচিত ছেলে-মেয়ে প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হলে তাদের বিবাহ দেয়া। এ বিষয়ে জোর তাকিদ দিয়েছে ইসলাম। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত একটি হদিসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, '*হে আলী, তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করবে না- ওয়াক্ত হলে সালাত আদায়ে, মৃত্যু হলে সালাতুল জানাযায়, বিবাহযোগ্য মেয়ের কুফূ (সমতা) অনুযায়ী পাত্র পাওয়া*

---

[৫৭] আল কুরআন, ২: ১৫৩।

[৫৮] আল কুরআন,২:৫৪।

[৫৯] রিয়াদুস সালিহীন, মারকায বুক ডিপো, মিটইয়া মহল জামে মসজিদ, দিল্লী ৬, প্রকাশ: ১৪০০হি মোতাবেক ১৯৭০ইং, আধ্যায়: সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা, হাদীস নং ৬৩০ পৃ. ২৯০।

[৬০] রিয়াদুস সালেহীন, আধ্যায়: কদরের রজনীতে নামাযের ফযিলত, হাদীস নং ১১৮৪ পৃ. ৪৬৮।

গেলে বিবাহ প্রদানে।'[৬১]স্ত্রীর মাঝে অবাধ্যতা দেখা দিলে তার যে ভালো গুণ আছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,*'তাদের (স্ত্রী) সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে; তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ।'*[৬২]স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হতে পারে, প্রাথমিক পর্যায়ে অভিভাবকের কর্তব্য হলো তাদের নিজেদের উপর ছেড়ে দেয়া, জটিলতা দেখা দিলে অভিভাবকগণ সহজে মিটিয়ে দিবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, *'দুনিয়াতে যারা সুবিচার করবে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর সম্মুখে তারা মুক্তা নির্মিত উচ্চ মঞ্চে অবস্থান করবে'*[৬৩] *।'*

হাদীসে আছে যে, *'আল্লাহ বান্দার সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে'।*[৬৪]

প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব কাজ সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরী। যিনি নামায আদায় করবেন তার নামাযের ফরয, ওয়াজিব ছাড়াও তাহারাত তথা পবিত্রতা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকতে হবে। যিনি যাকাত দিবেন তার যাকাত সম্পর্কিত, হজ্জ গমনেচ্ছু ব্যক্তির হজ্জের মাসআলা-মাসায়েলের জ্ঞান থাকতে হবে। তাই বিবাহ পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান না থাকলে পারিবারিক জীবন সুন্দর হবে না। সহীহ হাদীসে এসেছে,*'জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়ীত্বশীল, সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।*[৬৫]

স্বামীর হক্ক রয়েছে, তেমন রয়েছে স্ত্রীর হক্ক, আছে পিতা-মাতা ও অন্যান্যদের হক্ক। শুধু ভরণ-পোষণই হক্ক নয়। এছাড়া শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক ভালো লাগার বিষয়টি সবার খেয়াল করা দরকার। নবী (স.) তার স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। বিনোদনও একটি মানসিক তৃপ্তি, এর দ্বারা উভয়ের সম্পর্ক দৃঢ় হয় এবং একে অন্যের প্রতি যত্নশীল হয়।

যৌন অধিকার বৈবাহিক জীবনের অন্যতম মৌলিক বিষয়। যৌন অক্ষমতা একজন পুরুষের দাম্পত্য জীবনের বড় সমস্যা। যুবকদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন- *"হে যুব সম্প্রদায়,*

---

৬১ তিরমিযী শরীফ, প্রথম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ : জুন ২০০৫, আধ্যায়: নামাযের প্রথম ওয়াক্তের ফযীলত, হাদীস নং ১৭১ পৃ. ১৬৪

৬২ আল কুরআন, ৪:১৯।

৬৩ তাফসীর ইবনে কাসীর, দশম খণ্ড, ইসলামিকফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ৩৮৯

৬৪ রিয়াদুস সালিহীন, মারকায বুক ডিপো, মিটইয়া মহল জামে মসজিদ, দিল্লি৬, প্রকাশ: ১৪০০হি মোতাবেক ১৯৭০ইং, আধ্যায়: মুসলমানদের প্রয়োজন মিটানো, হাদীস নং ২৪৩, পৃ. ১২৬।

৬৫ বুখারী শরীফ, দশম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ : মার্চ ২০০৩, আহকাম অধ্যায়, হাদীস নং ৬৬৫৩, পৃ.৪০৫-৬।

তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়েকরার সামর্থ্য আছে তাদের উচিত বিয়ে করা; এটি দৃষ্টিকে নত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তারা যেন রোযা রাখে, কেননা তা যৌন উত্তেজনাকে প্রশমিত করে।[৬৬]"

পর্ণগ্রাফি ইসলামে হারাম ও সুস্পষ্ট পাপ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "*মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এটিই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের অবরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালীকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আবরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার*"।[৬৭] পর্ণগ্রাফি বা অশ্লীলতা প্রচারের বিষয়ে আল কুরআনের বাণী- *যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাহাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা*"।[৬৮]

রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নয়জন স্ত্রীর মাধ্যে একজন কুমারী অন্য আটজন সায়্যিবা তথা বিবাহিতা ছিলেন। প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে তাঁর প্রথম স্ত্রী বয়সে প্রায় পনের বছরের বড় ছিলেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অকুমারী ও প্রাপ্তবয়স্কা নারী বিবাহ করতে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। আয়েশা (রা.) এর বিবাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বপ্নযোগে ওহী ছিল।[৬৯] অধিকাংশ সাহাবী সায়্যিবা নারী বিয়ে করেছেন। এক্ষেত্রে জাবির (রা.) এর হাদীস উল্লেখযোগ্য।[৭০]স্ত্রী প্রাপ্তবয়স্কা এবং বুদ্ধির পরিপক্কতা থাকলে সে স্বামীকে বিভিন্ন কাজে সহযোগীতা করতে পারে। পরামর্শ ও সঙ্গ দিতে উপযুক্ত বয়স হতে হয়। এক্ষেত্রে হযরত খাদীজা (রা.)-এর উদাহরণ অত্যন্ত

---

৬৬ বুখারী শরীফ, অষ্টম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০০, অনুচ্ছেদ ২৪২৭, হাদীস নং ৪৬৯৫, পৃ.৩৮৩।

৬৭ আল কুরআন, ২৪:৩০-৩১।

৬৮ আল কুরআন, ২৪:১৯।

৬৯ বুখারী শরীফ অষ্টম, খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০০, অনুচ্ছেদ ২৪৩৪, হাদীস নং ৪৭০৭ পৃ. ৩৯০; কোন কোন ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহ ইসলাম অনুমোদন করলেও তৎকালীন আরবের পরিবেশ আর বাংলাদেশের পরিবেশের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ইসলামে বাল্যবিয়ে বৈধ হলেও সবার জন্য সর্বদা প্রযোজ্য নয়।

৭০ বুখারী শরীফ অষ্টম খণ্ড, অনুচ্ছেদ ২৪৩৫, হাদিস নং ৪৭০৮-৯, পৃ. ৩৯১।

উপযুক্ত, কারণ তিনি বয়সের কারণে বুঝমান ছিলেন এবং বুদ্ধিদীপ্ত সকল প্রকার পরামর্শ দিতেন নবীজীকে।

এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। আন্তঃযোগাযোগ মানসিক ব্যাপার, মন বুঝলে মানসিক সাপোর্ট দেয়া যায়, তখন ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। নবী করীম (স.) তার স্ত্রীর সাথে একই পাত্রে গোসল করতেন।[৭১] একই প্লেটে খাবার খেতেন ও একই পানপাত্রে পান করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- *"আমার মুখ লাগানো স্থানে তিনি তাঁর মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আমি হাড় থেকে গোশত কামড়ে খেতাম, তারপর রাসূলুল্লাহ (স.) কে দিতাম তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ লাগাতেন।[৭২] স্ত্রীর উরুতে মাথা রেখে গল্প করতেন এবং স্ত্রী তার চুল আচড়ে দিতেন"।*[৭৩]

স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠতার জন্য এটা একটা উত্তম উদহরণ। স্বামীর কাছে স্ত্রীর প্রত্যাশা হবে বাস্তবভিত্তিক। স্বামী যা দিতে পারে এবং যতটুকু দেয়ার সমার্থ্য আছে তার চেয়ে বেশী কিছু আশা করা অনুচিত। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যে বান্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে অল্প রিযিক পেয়ে খুশি থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তরফ থেকে অল্প আমলে খুশি থাকেন।'[৭৪]

ইসলামে নেশা উদ্রেককারী সকল বস্তু হারাম করা হয়েছে। হারাম যতই উন্নত আর লোভনীয় হোক তার ভেতর কোন কল্যাণ নাই। প্রতিটি ব্যক্তির কাছে উত্তম হতে হবে তাঁর স্ত্রী, আর তাই উত্তম ব্যক্তির কাছে সর্বোত্তম অবস্থায় পরিপাটি হয়ে যাওয়া দরকার সকল পুরুষের। রাসূল (স.) তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন। হযরত ইবনে আব্বস (রাঃ) বলেন, আমি আমার স্ত্রীর কাছে সুগন্ধি মেখে গমন করি। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন- "তিনটি জিনিস আমার কাছে অতি প্রিয় ১. নারী ২. সুগন্ধি ৩. নামাযে রয়েছে আমার চোখের শীতলতা"। স্ত্রীর সামনে পাগলামি বা মাতলামি করা নিকৃষ্ট ব্যক্তির পরিচায়ক, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কখনো এটা করতে পারেনা।

আমাদের প্রত্যাশা থাকবে এমন যাতে 'সহযোগী'র সেটা পূরণে কোন বেগ পেতে না হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন মানুষকে তার সাধ্যাতীত কোন কিছু চাপিয়ে দেন না, ইরশাদ হয়েছে,*'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না।*[৭৫]' পুরুষ তার অবস্থা ভেদে স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করবে, এটা স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা এবং দাম্পত্য জীবনকে

---

৭১ সহীহ মুসলিম শরীফ, প্রথম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১০, হাদীস নং ৬২০, পৃ. ৩২৭।

৭২ সহীহ মুসলিম শরীফ, প্রথম খণ্ড, হাদিস নং ৫৭৭,৫৮০, পৃ. ৩১৪।

৭৩ সহীহ মুসলিম শরীফ, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং ৫৮৫, পৃ. ৩১৬।

৭৪ মুসনাদে আহমদ।

৭৫ আল কুরআন, ২:২৮৬।

গতিশীল করার একটি অন্যতম উপায়। রাসূল (স.) তার স্ত্রী আয়েশা (রা.) এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা খেলতেন, তাকে হাসাতে চেষ্টা করতেন।[৭৬]

ঝগড়া করা ইসলামে পছন্দনীয় কাজ নয়, ঝগড়াটে ব্যক্তি সবার কাছে অপ্রিয়। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২০৪ নং আয়াতাংশে ঝগড়াটে ব্যক্তির নিন্দা করা হয়েছে। ঝগড়া ও গালিগালাজ করার দ্বারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। নবী কারীম (স.) বলেনঃ *"অতি ঝগড়াটে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি"*।[৭৭] রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন, *"আমার পরে হিদায়াতপ্রাপ্ত লোক তখনই পথভ্রষ্ট হবে, যখন তারা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে"*[৭৮]। *"যে ব্যক্তি সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করল তার জন্য জান্নাতের মধ্যখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়"*।[৭৯]উম্মতের বাদানুবাদের কারণেই মহিমান্বিত কদর রজনীর নির্দিষ্ট তারিখ রাসূল (স.) ভুলে গিয়েছিলেন।

আর্থিক সচ্ছলতা যার আছে সে বিবাহ করবে, হাদীস শরীফে স্পষ্ট এই নির্দেশনা রয়েছে। রাসূল (স.) বলেছেন, হে যুবক সম্প্রদায়! "তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে"।[৮০] শরীয়ত ভরণপোষণের দায়িত্ব দিয়েছে স্বামীকে, স্বামী সচ্ছল হলে সে বিবাহের উপযুক্ত, অন্যথায় সে রোজা রাখবে।

বিবাহের জন্য সমতা রক্ষা করা ইসলামী শরীয়তের অন্যতম একটি বিধান, যদি কোন বিবাহ সংগঠিত হয় আর নব দম্পত্যির মাঝে সমতা না পাওয়া যায় তবে অভিভাবক সে বিবাহ বাতিল করতে পারেন।জোরপূর্বক বিবাহ দেয়ার কঠোর সমালোচনা করেছে ইসলাম। এ বিষয়ে সহীহ বুখারীতে ইমাম বুখারী (রঃ) স্বতন্ত্র দুইটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। ২৪৬৭ নং অনুচ্ছেদ:*"পিতা বা অভিভাবক কুমারী অথবা বিবাহিতা মেয়েকে তাদের সম্মতি ব্যতীত শাদী দিতে পারে না"* এবং ২৪৬৮ নং অনুচ্ছেদ: *"যদি কোন ব্যক্তি তার কন্যার অনুমতি ব্যতীত তাকে বিবাহ দেয়, সে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে"*। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, নারীর সম্মতিতে উপযুক্ত পাত্রের সাথে তাঁরবিবাহ দিতে হবে, জোরপূর্বক বিবাহ দেয়া যাবে না। এটা তার ধর্মীয় অধিকার।

ইসলামে জ্ঞান অর্জন ফরয করা হয়েছে, মানুষ যে কাজ করবে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে 'বিবাহ একটি ইবাদত' এটা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক সর্বোপরি ধর্মীয় ইবাদত। ইবাদত সঠিক ও সুন্দর হওয়ার জন্য যথাযথ জ্ঞান থাকা চাই। ইসলাম

---

[৭৬] প্রাগুক্ত।

[৭৭] সিলসিলাতু আহাদীসিস সহীহাহ, ৩৯৭০।

[৭৮] ইবনে মাজাহ, প্রথম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদিস নং ৪৮, পৃ. ৫৮; সিলসিলাতু আহাদিসিস সহীহাহ ৩৯৭০

[৭৯] ইবনে মাজাহ, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং ৫১, পৃ. ৫৯।

[৮০] সহীহ মুসলিম শরীফ, তৃতীয় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্করণ : জুন ২০১০, হাদীস নং ৩২৬৮, পৃ. ৩৩০।

স্ত্রীরকী অধিকার দিয়েছে? এটা কতজন পুরুষ জানেন? আবার স্বামীর অধিকার কী? এটাই বা কতজন স্ত্রী জানেন? কুরআন আমাদের না জানলে জেনে নিতে উৎসাহিত করেছে। 'জানতে চাওয়া' নিয়ে পবিত্র কুরআন মোট একশত তেইশটি আয়াতে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। হাদীস শরীফেও অনেক বর্ণনা রয়েছে যেখানে সাহাবায়ে কিরাম নবীজি (স.) কে প্রশ্ন করেছেন। ইসলামে দুটি হক্ক রয়েছে, হাক্কুল্লাহ এবং হাক্কুল ইবাদ তথা আল্লাহ এবং বান্দার হক্ক। আল্লাহর হক্কের ব্যপারে মাফের আশা করা যায় কিন্তু ব্যক্তির হক্ক ব্যক্তির মাফ করতে হবে। বিবাহের সাথে বান্দার হক্ক জড়িত, তাই প্রতিটি দম্পতির একে অন্যের হক্কের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন- *'তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে'।*[৮১] এর অর্থ হচ্ছে স্ত্রী কখনোই যেন স্বামীরদ্বারা মানসিক কষ্ট না পায়, শারীরিক কষ্ট তো অবশ্যই নয়। মানুষ ফেরেশতা নয় তাই স্বামী যদি কখনো কোন প্রকার কষ্ট দিয়ে থাকেন তবে আগে তার স্ত্রীর কাছে অনুতপ্ত হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বান্দার অনুতপ্ত হওয়া পছন্দ করেন। স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ভুল স্বীকার করার দ্বারা মহব্বত ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। কাবিননামায় স্বামী-স্ত্রী না জেনে স্বাক্ষর করে, অথচ এটা একটা বড় দলিল। এখানে প্রায় পঁচিশটি কলাম রয়েছে, প্রতিটি কলাম সরকার এবং শরীয়তের সাথে সম্পর্কিত একটি আইন, যা দাম্পত্য জীবনে মেনে চলার জন্য উভয়ই অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিবাহিত সকল স্বামী-স্ত্রী এই অঙ্গীকার জেনে জীবন যাপন করা আবশ্যক।

উপসংহার

ইসলাম Complet code of life. জীবনের প্রতিটি সমস্যার সুন্দর সমাধান রয়েছে ইসলামে। কৃষি কাজ থেকে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল বিষয়ে যথার্থ বর্ণনা দেয়া হয়েছে এখানে। ইসলামী নির্দেশনা মেনে চললে আশা করা যায় বৈবাহিক জীবনে সাধারণ সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যাবে। এই গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদের রূপরেখা উপস্থাপন পূর্বক বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ তুলে ধরা। প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- শিক্ষিত সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ বেশী, নারীরা বিলাসী জীবন যাপনে আগ্রহী, স্বামী ও শশুর বাড়ীর লোকজন থেকে দূরে থাকতে চায়, সন্তান নিতে বিলম্ব করতে পছন্দ করে এবংঅধিকাংশ দম্পতি বন্ধুসুলভ নয় ইত্যাদি। ফলাফলগুলো পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা দেয়া যেতে পারে।

১. ছেলে-মেয়ের মতামত নিয়ে পরিবার বিয়ের ব্যবস্থা করবে।
২. পাত্র-পাত্রীর উপযুক্ততা দেখে বিবাহকার্য সম্পন্ন করতে হবে।
৩. পরিবারের পিতা-মাতাকে নিয়ে বসবাস করতে হবে।
৪. স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ভালো লাগার মূল্যায়ন করতে হবে।

---

[৮১] আল কুরআন, ৪:১৯।

৫. স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সময় দিবে এবং সামর্থ ও সুস্থতা সামনে রেখে সন্তান নিতেবিলম্ব করা যাবেনা।

৬. ছোট-খাট সমস্যা নিজেরা সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে।

মানব জীবনে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানে সমস্যা থাকলে জীবন প্রায় অচল হয়ে যায়। সমস্যা হলে তার সমাধানও থাকবে, কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদই একমাত্র সমাধান নয়, একথা মনে রেখে ইসলামী ভাবধারায় জীবন পরিচালনা করলে উদ্ভূত সমস্যার সুন্দর প্রতিকার পাওয়া সম্ভব।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৬১ বর্ষ ১ম সংখ্যা
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সমস্যা ও বঞ্চনা প্রতিরোধে ইসলামের শাশ্বত বিধান: একটি পর্যালোচনা

জহিরুল ইসলাম*

[Abstract :*Aging is a natural consequence of the human life cycle.The relationship between birth and death is the same as the relationship between old age and survival. But the issue of providing care and welfare to the growing elderly population in Bangladesh today has reached a stage of uncertainty and concern. Today, they are helpless, neglected and deprived in their own family and society. In order to increase social awareness in order to understand the rights of the elderly and the realities of their lives, this article has been prepared to highlight the problems of the Aramaic elders and to find ways to get rid of them. Descriptive and analytical methods have been followed in this study. It is evident from this article that as the rate of seniority in Bangladesh has increased, so has the rate of deprivation. Not only are they growing rapidly in numbers, but family, social and national inequalities to meet their legal needs are also facing deeper crises and acute challenges. In this situation, it is appropriate and pleasing for us to give the rights and dignity of the elders recognized by Islam properly and to nurture in them a gentle heart and refined thoughts and consciousness. In this way, on the one hand, the satisfaction of Allah and His Messenger will be achieved by keeping the standard of morality intact, on the other hand, the tradition of our elderly friends, livable family and society will be maintained.*

Keywords: Aging, neglect, parents, care, paradise.]

[সারসংক্ষেপ: *মানব জীবনচক্রের এক স্বাভাবিক পরিণতি হলো প্রবীণত্ব। জন্মের সাথে মৃত্যুর যেমন সম্পর্ক, বেঁচে থাকলে বার্ধক্যের সাথেও তেমনি। কিন্তু বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সেবা-যত্ন প্রদান এবং কল্যাণ বিধানের বিষয়টি আজ এক অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগজনক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা আজ নিজের গড়া পরিবার ও সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়, অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার। এমতাবস্থায় প্রবীণদের অধিকার ও যাপিত জীবনের বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গ্রামীণ প্রবীণদের সমস্যাসমূহ তুলে ধরা এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যেই আলোচ্য প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। এ গবেষণায় বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধ থেকে প্রতীয়মানহয় যে, বাংলাদেশে প্রবীণদের হার যেমন বেড়ে চলেছে, তেমনি বেড়ে চলেছে তাঁদের বঞ্চনার পরিমাণও। শুধু সংখ্যায় তাঁরা দ্রুত বাড়ছে তা-ই নয়; তাঁদের অধিকারগত প্রয়োজন মেটানোর মতো পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমতা ক্রমেই গভীর সংকট ও তীব্র চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় প্রবীণদের ইসলাম স্বীকৃত অধিকার ও মর্যাদাগুলো যথাযথভাবে দেয়া এবং সুকোমল হৃদয়াবেগ ও পরিমার্জিত চিন্তা-চেতনা লালন করা আমাদের জন্য সমীচীন ও সুখকর। এতে একদিকে যেমন নৈতিকতার মান অক্ষুণ্ন থাকার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জিত হবে, অন্যদিকে তেমনি আমাদের প্রবীণবান্ধব বাসযোগ্য পরিবার ও সমাজের ঐতিহ্য বজায় থাকবে।*

মূলশব্দ: প্রবীণত্ব, অবহেলা, পিতা-মাতা, সেবা-যত্ন, জান্নাত।]

*প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস।

ভূমিকা

মানবজীবনের স্বাভাবিক গতি প্রবাহে অলঙ্ঘনীয়, অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য পরিণতি হলো প্রবীণত্ব।শৈশবের সোনালি সকাল শেষ করে, তারুণ্য আর যৌবনের রোদেলা দুপুর পাড়ি দিয়ে, মাঝবয়সের ব্যস্ত বিকালটাও যখন চলে যায়, তখনই জীবনসায়াহ্নের গোধূলিলগ্ন হয়ে আসে বার্ধক্য। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক সমস্যাবলীর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রবীণদের যথাযথ অধিকার ও মর্যাদার প্রাপ্যতা নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সেবা-যত্ন প্রদান এবং কল্যাণ বিধানের বিষয়টি আজ এক অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগজনক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা আজ নিজের গড়া পরিবার ও সমাজে অনেকাংশে অপাঙ্‌ক্তেয়, অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার।শিশু বা যুবকদের জন্য বিনোয়োগ সম্পদের প্রতিদান যতটা, প্রবীণদের বেলায় তা ততই অকিঞ্চিৎকর। প্রবীণ ব্যক্তি কারোর ভবিষ্যতের আশা-স্বপ্ন নয়; কেবলই ক্ষয়ে যাওয়ার প্রতীক্ষার যাত্রী। তাছাড়া মানুষের ধারণা সমাজজীবনে প্রবীণ জনগোষ্ঠী যত না সমস্যা অনুভব করে, তার চেয়ে তারা সমস্যা সৃষ্টি করে বেশি।[১]যে প্রবীণেরা যৌবনে পরিবারের সদস্যদের জন্য তাঁদের জীবনের সুবর্ণ সময়গুলো অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন, বার্ধক্যে পৌঁছে তাঁরাই আজ হয়ে পড়েছেন পরিবারের কিংবা সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ। বিভিন্ন দৈহিক, আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যায় নিপতিত হয়ে তাদেরকে অত্যন্ত নাজুক ও অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করতে হয়। বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর প্রায় সবদেশে বয়স্ক বা প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ফলে দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত লোকদের সমস্যা ক্রমান্বয়ে প্রকট আকার ধারণ করছে।এমতাবস্থায় প্রবীণদের অধিকার ও যাপিত জীবনের বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গ্রামীণ প্রবীণদের সমস্যাসমূহ তুলে ধরা এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যেই আলোচ্য প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে, বার্ধক্য পীড়িত প্রবীণের প্রতি যত্নবান হওয়া ও সহানুভূতিশীল থাকা মহান আল্লাহর বিধান। এ বিধান লঙ্ঘন করলে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। তাই দয়া দাক্ষিণ্য বা করুণার দৃষ্টিতে নয়, মানবাধিকারের ভিত্তিতে এবং প্রাপ্য মর্যাদার যুক্তিতে প্রবীণদের চাওয়া পাওয়া সমাধান করা প্রয়োজন।

প্রবীণের পরিচয়

প্রবীণত্ব বা বার্ধক্য হচ্ছে মানবজীবনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সর্বশেষ অধ্যায়, একটি স্বয়ংক্রিয় গতিশীল জৈবিক প্রক্রিয়া। বয়সের নিরীখে এটা নিরূপিত হয়। তবে বার্ধক্যের সূত্রপাত নিয়ে অঞ্চলভেদে মতানৈক্য রয়েছে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবসর

গ্রহণের গড় বয়স, বিদ্যমান আইন, স্বাস্থ্যগত অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে ৬০ বছর বয়সকে বার্ধক্যের সীমা বলে মনে করা হয়। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বার্ধক্যকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে Help Age Internationalবলেছে : Older people defined old age according to physical characteristics such as wrinkles and grey hair, and physical limitations such as loss of eyesight and limited mobility that affect their ability to participate in daily life in both household and income generating activities[১]

বয়স্কভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) ২০১৩ অনুযায়ী বয়স্ক ব্যক্তি বলতে পুরুষের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ববয়সের এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬২ বা তদূর্ধ্ব বয়সের কিংবা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বয়সেরব্যক্তিকেবুঝাবে।[২]বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের বিবেচনায় ৫৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সীদের বলা হয় প্রবীণ।[৩]কিন্তু দারিদ্র্য, ক্রয় ক্ষমতার অভাব, অপুষ্টি, ক্ষুধা, অসুস্থতা, সেবা পরিচর্যা ও নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি কারণে গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনে পঞ্চাশের দিকেই বার্ধক্য নেমে আসে।[৪] তবেজাতিসংঘ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব এবং অন্যান্য অঞ্চলের জন্য ৬৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের প্রবীণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অর্থাৎ 'প্রবীণ' যাত্রাপথ ষাট বছর থেকে শুরু করে জীবনের সমাপ্তি পর্যন্ত ধরা হয়।

বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যা

প্রবীণ সমস্যা বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান একটি সমস্যা। বিশ্বজুড়ে প্রবীণদের সংখ্যা বিস্ময়করভাবে বাড়ছে, বাড়ছে তাদের অসহায়ত্বও। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৯০ সালে বিশ্বে প্রবীণদের সংখ্যা ছিল ৫০ কোটি। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১০ কোটিতে। ২০৩০ সালে এর সংখ্যা হবে ১৫০ কোটি এবং ২০৫০ সালে প্রবীণদের সংখ্যা ২০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে।[৫] প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধির এ দৌড়ে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও। বাংলাদেশে

---

১ এ এস এম আতীকুর রহমান, বয়স্ক জনসংখ্যা: সমাজকর্মীদের একটি লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৬৮ সংখ্যা, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ১১১।

২ The Age International A Situation Analysis of Older people in Bangladesh, Bangladesh Journal of Geriatrics, vol 37, No 1 & 2, Nov.1999-Oct. 2000, p. 136.

৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রণীত বয়স্কভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) ২০১৩, পৃ. ৩।

৪ ড. অনিমা রাণী নাথ, ড. উত্তম কুমার দাশ ও রেজাউল করিম, মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমাজকর্ম (ঢাকা: র‍্যাডিয়্যান্ট পাবলিকেশন্স, ২০০৫), পৃ. ১৬২।

৫ এ. এস. এম. আতীকুর রহমান, বাংলাদেশে বার্ধক্যের বিভিন্ন দিক", প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৯ - অক্টোবর ২০০১, পৃ. ১৪।

বর্তমানে প্রবীণদের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। ২০২৫ সালে প্রবীণদের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২ কোটিতে। ২০৫০ সালে প্রবীণসংখ্যা হবে প্রায় সাড়ে চার কোটি এবং ২০৬১ সালে এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৬ কোটিতে।[৬]

সময়ের পরিক্রমায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি এবং জনসংখ্যা ও গড় আয়ু বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন হিসেবে বয়োবৃদ্ধের সংখ্যা ৭ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে ৮ দশমিক ১০শতাংশ। ২০৪৭ সাল নাগাদ বাংলাদেশে অপ্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় প্রবীণদের সংখ্যা বেশি থাকবে। ২০৫০ সালে পাঁচজনে একজন ষাটোর্ধ্ব বয়সী থাকবেন অর্থাৎ ২০ শতাংশ নাগরিক হবেন প্রবীণ যখন শিশুসংখ্যা হবে ১৯ শতাংশ। সে সময় পরিচর্যাহীন বার্ধক্যই দেশের একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের দেশে দুই তৃতীয়াংশ প্রবীণই দারিদ্র্য, ৫৮ ভাগ প্রবীণের মৌলিক চাহিদা পূরণের সামর্থ্য নেই। উন্নত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা হ্রাস, প্রসবকালীন মৃত্যুহার হ্রাস প্রভৃতি কারণে মহিলারা গড়ে পুরুষের তুলনায় ৮ বছর বেশি বাঁচে বলে বার্ধক্যপীড়িত মহিলাদের সংখ্যা বাড়ছে। এছাড়া তারা নিজেদের তুলনায় বেশি বয়সের পুরুষদের বিয়ে করায় স্বামী মারা গেলেও অনেক মহিলা আরো বেশ কয়েক বছর নিঃসঙ্গতার মধ্যে বেঁচে থাকেন। এ অবস্থা বিশ্বের প্রায় সব দেশেই বিরাজমান।

প্রবীণদের বিদ্যমান সমস্যা ও বঞ্চনার খণ্ডচিত্র

সমগ্র বিশ্বেই প্রবীণ জনগোষ্ঠী আজ অবহেলিত ও উপেক্ষিত এবং তাদের জীবন নানা সমস্যায় জর্জরিত। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে প্রবীণদের হার যেমন বেড়ে চলেছে, তেমনি বেড়ে চলেছে তাঁদের বঞ্চনার পরিমাণও। বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন, শিল্পায়ন ও শহরায়ন সম্প্রসারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যৌথ পরিবারের ফলে একক পরিবার সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি প্রভৃতি কারণে প্রবীণদের সমস্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ তাঁদের জন্য কিছু ভূমিকা পালন করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত ও যথার্থ নয়। ফলে তাঁরা বিভিন্ন আর্থ-মনো-সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যায় জর্জরিত। এ সমস্যা শহরের তুলনায় গ্রামে আরো প্রকট এবং আরো অধিক প্রকট গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ মূলত গ্রামপ্রধান দেশ হওয়ায় মোট প্রবীণদের প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রামে বাস করে। এক তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৭০ শতাংশ প্রবীণ বেতন বা মজুরিভিত্তিক কোনো না কোনো কাজের সাথে জড়িত। অন্যদিকে প্রবীণ নারীদের অধিকাংশই বেতন বা মজুরিবিহীন কাজের সঙ্গে

৬ এম. এ. কাদের, প্রবীণদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম নয়, দৈনিক ইনকিলাব, ১৪ মার্চ, ২০২০।

সম্পৃক্ত।[৭]আবার দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দেশের ৮০ শতাংশের অধিক প্রবীণ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। এ ব্যাপক দারিদ্র্যের মাঝে অধিকাংশ প্রবীণ স্বাস্থ্য সমস্যাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার শিকার। স্বচ্ছল পরিবারের প্রবীণদের অবস্থা তত না হলেও তাদের অনেকেই পারিবারিক ভাঙন, মানসিক পীড়ন, নিঃসঙ্গতা এবং অযত্ন-অবহেলার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন।[৮]দারিদ্র্য ও নির্ভরশীলতার অন্যতম শিকার হচ্ছেন গ্রামীণ প্রবীণ জনগোষ্ঠী। দরিদ্র পরিবারভুক্ত প্রবীণরা নিরুপায় হয়ে ভরণ-পোষণের তাগিদে কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, এমনকি ভিক্ষাবৃত্তির মতো মানবেতর কাজেও জড়িয়ে পড়েন, যা অমানবিক। গ্রামাঞ্চলে অনেক পরিবারেই সন্তানরা মা-বাবাকে বিষয়-সম্পত্তির মতো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। এতে খাবার জোটলেওচিকিৎসাসহ বহু মৌলিক সেবা থেকে প্রবীণরা বঞ্চিত হন। শহরে বসবাসরত প্রবীণরা স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা কিছুটা ভোগ করলেও গ্রামে তা একেবারেই অনুপস্থিত বলা যায়।প্রবীণদের দুর্দশার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়ার জন্য নিম্নে কয়েকটি ঘটনা বিশ্লেষণ করা হলো।

কেইস-১: কুষ্টিয়ার বাজিতপুর গ্রামের এক কৃষকের চার মেয়ে, এক ছেলে। ছেলের বাড়িতে বৃদ্ধ বাবার ঠাঁই হয়নি। মেয়েরা পালা করে তাকে রাখতেন। ব্যাপারটা জামাইদের পছন্দ হতো না। সেজ মেয়ের বাড়িতে এক রাতে খাবারের জন্য অনেকক্ষণ বসে থেকেও শেষ পর্যন্ত কেউ খাবার না দেওয়ায় ট্রেনে চেপে চলে এলেন ঢাকায়।অবশেষে তিনি স্বেচ্ছায় বেছে নিলেন বৃদ্ধাশ্রম।[৯]

কেইস-২: ঢাকার দোহার উপজেলার উত্তর জয়পাড়া এলাকার ইলামুদ্দিন বেপারি একসময় পরিবারের উপার্জনক্ষম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ফেরি করে লুঙ্গির ব্যবসা করতেন বলে এক হাট থেকে ছুটে যেতেন আরেক হাটে। ব্যবসার উপার্জিত টাকা দিয়েই চলত পুরো পরিবারের ভরণপোষণ। ইলামুদ্দিনের বয়স এখন প্রায় ১০৬ বছর। স্বাভাবিকভাবেই কাজ করার সক্ষমতা হারিয়েছেন। ছেলেরা যে যার মতো ব্যস্ত। ঘরের বারান্দায় এককোণে শুয়ে-বসেই দিন কাটে তার। শরীরে নানা অসুখ-বিসুখ দানা বেঁধেছে। প্রয়োজন সুচিকিৎসার; কিন্তু অর্থের অভাবে সঠিক চিকিৎসা করাতে পারছেন না। বৃদ্ধ বয়সে নিজের মতো করে কিছু করার সাধ্য নেই বলে অনেক কষ্টে জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত হচ্ছে এই প্রবীণ ব্যক্তির।[১০]

---

৭ প্রাগুক্ত।

৮ ড. গোলাম সামদানী ফকির, সচেতনতা বাড়লে প্রবীণদের দুর্ভোগ কমবে, দৈনিক যুগান্তর, ১ অক্টোবর ২০১৮।

৯ M. Enamul Haque, Overview of the position of Elderly People in Bangladesh; উদ্ধৃতঃ মোহাম্মদ মহিউদদীন ও মোঃ নূরুল ইসলাম, বাংলাদেশে বয়স্ক সমস্যা ও এর সমাধান: একটি পর্যালোচনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৭৩, জুন ২০০২, পৃ. ৬-৭।

১০ দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ জুন, ২০১৯।

কেইস-৩: পাবনার চাটমোহর থানার নেংরী গ্রামের মৃত অরিস্টিন কুরাইয়ের স্ত্রী পরসী কুরাই। পঁচাশি বছর বয়সী এই খ্রীস্টান মহিলার পাঁচ ছেলে সবাই শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কেউ তাঁর খোঁজ-খবর রাখেনি। বাড়িতে ফেলে রেখে চলে গেছে সবাই। তার অসহায়ত্ব দেখে এলাকার লোকজন তাঁকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেন[১১]

কেইস-৪: ঢাকার কামরাঙ্গীরচরের বাসিন্দা মালেকা খাতুন। বয়স ৯০-এর ওপরে। জীবনে অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে ছেলেমেয়েদের লালন-পালন করেছেন। বর্তমানে ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা বিয়ে করে যার যার মতো করে আলাদা সংসার সাজিয়েছে আর বৃদ্ধ মা থাকেন ভাড়া বাড়িতে। মেয়ের ঘরের নাতিরাই যতটুকু খোঁজ-খবর রাখছে, সেভাবেই কাটছে তার জীবন। অসুস্থতাকে সঙ্গী করে দিন কাটে তার। ওষুধ এখন নিত্যসঙ্গী। একটা সময় নিজের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে ছেলেমেয়েদের বড় করে তুলেছিলেন। সেই সন্তানেরা যে যার মতো– এ কথা মনে করতেই অঝোরে কাঁদলেন তিনি।[১২]

কেইস-৫: চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার মুখপাড়া এলাকার ৭৭ বছর বয়সী অরুণ ভট্টাচার্য। একমাত্র ছেলের বউয়ের লাথি ঘুষি খেয়ে হাতের আঙ্গুল ভেঙ্গে এখন আমেনা-বশর বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রে মাথা গোঁজার ঠাঁই করেছেন।[১৩]

কেইস-৬: সংসারের বোঝা মনে করে কুমিল্লার দুই কুলাঙ্গার সন্তান মিলে গাড়ীতে করে গৌরনদী উপজেলার টরকী বাস স্ট্যান্ডে পঁচাশি বছর বয়সী বৃদ্ধা মা আরাফাতুন্নেসাকে রাস্তার ধারে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। আট দিন কাটে তার সেখানে। মাঝে মাঝে ছেলেদের নাম ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন বৃদ্ধা। স্থানীয়রা নিতে চাইলে বলে তার ছেলেরা তাকে নিতে আসবেই আসবে।[১৪]

কেইস-৭: বগুড়ার দুপচাচিয়ার অধিবাসী এক ছেলে ও দুই মেয়ের মা ৫৫ বছর বয়সী শ্যামলীকে সিরাজগঞ্জ রেলস্টেশনে ফেলে রেখে যায় ছেলে-মেয়েরা। অবশেষে স্থানীয় লোকজনের নিকট থেকে রাজধানীর মিরপুরের বৃদ্ধাশ্রম 'চাইল্ড ওল্ড' সংস্থা লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তার।[১৫]

---

১১ শওকত আলী রতন, প্রবীণদের আলো আঁধারের জীবন, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৬ অক্টোবর, ২০১৯।

১২ দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ মে, ২০১৭।

১৩ শওকত আলী রতন, প্রাগুক্ত।

১৪ সিটিজিবার্তা ডটকম, ৬ মে, ২০১৯।

১৫ দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।

কেইস-৮: ত্রিশ বছর পূর্বে স্বামীহারা ৮৬ বছর বয়সী হুজলা বেগম নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার কুচিয়াবাড়ির অধিবাসী। তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মা হওয়া সত্ত্বেও তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কেউ না নিয়ে পুত্র ও পুত্রবধূ মিলে বাঁশবাগানের ভিতর ফেলে রাখে। অবশেষে সমাধান হয় প্রসাশনের মাধ্যমে।[১৬]

কেইস-৯: মাদারীপুরের পৌর শহরের শকুনী লেক পাড়ে ৮০ বছর বয়সের যোবেদা খাতুনকে কুড়িয়ে পায় স্থানীয় সরকারি নাজিম উদ্দীন কলেজের দুই ছাত্র। তার ছেলে ও পুত্রবধূ মিলে রাস্তায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। এই সামান্য পরিচয় দিয়েই জ্ঞান হারান বৃদ্ধা। দুই ছাত্র মিলে সদর হাসপাতালে ভর্তি করান বৃদ্ধাকে।[১৭]

এ কয়েকটি ঘটনা দেশের হাজারো ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে। ক্ষেত্রবিশেষে বাস্তবতা এর চেয়েও আরো কঠিন। বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও বাস্তবতার নিরিখেআমাদের দেশের গ্রামীণ হতদরিদ্র প্রবীণেরা কী পরিমাণ অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত হচ্ছেন, এতে তার একটা ধারণা পাওয়া যায়।জীবন সায়াহ্নে এসে সারা জীবন নিজের সামর্থ্যে দাপিয়ে বেড়ানো মানুষটাকে আজ শারীরিক দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে-সংসারে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পর্যাপ্ত খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, পরিধানের বস্ত্র ও স্বাস্থ্য সেবা থেকে অনেকাংশে বঞ্চিতবাংলাদেশের বেশিরভাগ প্রবীণ জনগোষ্ঠীযেসব সমস্যার সম্মুখীন হন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. পরিবার বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা;
২. পারিবারিক অযত্ন ও অবহেলা;
৩. তাদেরকে সংসারের বোঝা মনে করার প্রবণতা;
৪. দুর্ব্যবহার ওনির্যাতন;
৫. বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো বা যেতে বাধ্য করার প্রবণতা;
৬. আর্থিক অসচ্ছলতা এবং
৭. শারীরিক ও মানসিক সমস্যা ইত্যাদি।[১৮]

আসলে আমাদের দেশে প্রবীণরা নানা সমস্যার ভেতর দিয়ে বেঁচে থাকেন। সমাজে মূল্যবোধের বিপর্যয়, নৈতিক শিক্ষার অভাব ও স্বার্থান্বেষী চিন্তা-চেতনার কারণে প্রবীণদের মূল্যায়ন করা হয় না, দেয়া হয় না তাদের প্রাপ্য মর্যাদা। প্রবীণরা তাতে অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যান।

প্রবীণদের প্রতি অযত্ন ও অবহেলা প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ

---

১৬ সময় সংবাদ, সময় টিভি, ২৯ এপ্রিল, ২০১৯।

১৭ দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮।

১৮ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৭ নভেম্বর, ২০১৮।

জীবনের শেষদিকে এসে বিভিন্ন কারণে পরিবার ও সমাজে প্রবীণদের অবহেলা, অযত্ন ও তাচ্ছিল্যের শিকার হতে হয়। প্রবীণদের প্রতি অযত্ন ও অবহেলা প্রবণতা প্রতিদিন যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হলো:

১. ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অভাব;
২. পিতা-মাতা ও বৃদ্ধদের প্রতি সন্তান-সন্ততির দায়িত্বজ্ঞানহীনতা;
৩. মনুষ্যত্ববোধ তথানৈতিক ও মানবিক গুণাবলী লোপ পাওয়া;
৪. পারস্পারিক দয়া-মায়া, মিল-মহব্বত ও খাঁটি ভালোবাসার অভাব;
৫. পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধা ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম না থাকা;
৬. দারিদ্রতা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা;
৭. অশিক্ষা ও কুশিক্ষা;
৮. নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিজনিত কারণে।

প্রবীণ সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজন ইসলামের শাশ্বত বিধানের প্রতিপালন

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সমস্যা মোকাবেলায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে সর্বাগ্রে আমাদের প্রত্যেকের ইসলামের শাশ্বত বিধান প্রতিপালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। এ ব্যাপারে করণীয় হলো:

১. প্রবীণ, বয়োজ্যেষ্ঠ ও বৃদ্ধদের ইসলাম স্বীকৃত গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া: ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সম্পর্কেই আলোকপাত করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রবীণ, বয়োজ্যেষ্ঠ ও বৃদ্ধদের প্রতি সকল প্রকার অমানবিক বৈষম্য ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন এবং তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রবীণরা হলেন ইতিহাসের সূত্র, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার এবং চলমান সমাজের সংযোগ সেতু। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান প্রবীণরা আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আমাদের বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আরব সমাজে সততা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারির জন্য 'আল আমীন' উপাধিপ্রাপ্ত মুহাম্মাদ (সা)-কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কম বয়সে নবুওয়াত প্রদান করেননি কেন? কারণ এ চল্লিশ বছর বয়সই সহ্য-ধৈর্য, অভিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞতা এবং উপযুক্ততার দিক থেকে অত্যন্ত উপযুক্ত ও মোক্ষম সময় হিসেবে বিবেচিত। এটা অনস্বীকার্য যে, মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে ও চিন্তার জগতে আসে শৃংখলা। তখন বড় কিছু অর্জনের যোগ্যতা তৈরি হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় প্রবীণরা সমাজের দর্পণ। মানবজাতির কল্যাণার্থে তাদের গুরুত্ব

অপরিসীম। ইসলামের সর্বজনীন নীতি বৃদ্ধদের কখনো দূরে ঠেলে দেয়নি, বরং তাদের সব ধরনের অধিকারের বিষয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করেছে।

আমাদের সমাজের একটা মন্দ প্রবণতা হলো, বার্ধক্যের কর্ম অক্ষম ও অচল অবস্থায় পৌঁছলেই পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা ও বঞ্চনা শুরু হয়। অথচ মানবজীবনের প্রতিটি পর্যায় যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য এগুলোর পৃথক পৃথক সৌন্দর্য রয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আজকের নবীনই আগামী দিনের প্রবীণ। সময়ের বিবর্তনেই একজন শিশু যৌবন পেরিয়ে বৃদ্ধে পরিণত হয়। এ চির সত্যকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। প্রকৃতির নিয়মে নির্দিষ্ট সময় বেঁচে থাকলে বার্ধক্য আসবেই। আর বার্ধক্য মানেই দুর্বলতা। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ অকর্মন্য, অসহায় ও ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে যায়। দেশ-কাল অবস্থানভেদে সকল স্তরের নারী-পুরুষের জীবনেই এটি ধ্রুব সত্য।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢبَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَیْبَةً ؕ

"তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য"।

অন্যত্র তিনি বলেন:

وَ مِنْكُمْ مَّنْ یُّرَدُّ اِلٰۤی اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْ لَا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْـًٔا ؕ

"তোমাদের মধ্যে কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মন্য বয়সে, বার্ধক্যের ফলে যা কিছু সে জানত, সেই সম্পর্কেও জ্ঞান থাকে না"।

কুরআনে হাকীমের উপরিউক্ত কথার মর্মবাণী হচ্ছে মানুষের জীবনকে শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য– এ তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যৌবনকাল হলো দুপুর বেলার তেজোদীপ্ত সূর্যের মতো। আর শৈশব ও বার্ধক্য হলো সকাল ও বিকেল বেলার সূর্যের তেজহীন আলোর মতো। এ দু সময়ে মানুষ দৈহিক ও মানসিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল থাকে এবং পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে তো মানুষ আদ্যোপ্রান্ত স্মৃতিভ্রমে পতিত হয়ে প্রায় সদ্যপ্রসূত শিশুর মতো হয়ে যায়। কাজেই এ কঠিন সময়ে সন্তানাদি ও পরিবারের লোকজনই পারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সঠিক যত্ন নিতে। পরিবারের চেয়ে নিরাপদ, আরামদায়ক, উপকারী ও স্বস্তিদায়ক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু যৌবনে বহু আশা ও স্বপ্ন নিয়ে তিলে তিলে গড়ে তোলা সংসারে একজন মানুষ বার্ধক্যে পৌঁছে সংসারের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ থেকে সুদূর ও বিচ্ছিন্ন অসহায় জীবনযাপন করবেন, উপযুক্ত খাদ্য, পরিচর্যা, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান প্রায় সব মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত হবেন এবং তাঁকে সংসারের বোঝা মনে করে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসা হবে, আর সেই লোক নিজেদের আপনজন ছেড়ে একাকিত্ব, কষ্ট ও বিষময় জীবনযাপন করবে

তা ইসলামের চেতনা ও শিক্ষা পরিপন্থি। ইসলাম প্রবীণ, বয়োজ্যেষ্ঠ ও চুল-দাঁড়ি পাকা বৃদ্ধদেরকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখার তাগিদ দিয়েছে। হাদীসে অধিক বয়সীদের বিশেষ মর্যাদার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِكُمْ؟ قَالُوْا : نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : خِيَارُ كُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا،

"আমি কি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তির সংবাদ দিব না? তারা (সাহাবায়ে কেরাম) বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে দীর্ঘায়ু লাভ করে এবং সুন্দর আমল করে।"[১৯]

অন্য হাদীসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল,

يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ : مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ، قَالَ : فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ : مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ .

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল (স.)! উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল সুন্দর হয়েছে। সে আবার প্রশ্ন করল, মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট কে? তিনি বললেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল খারাপ হয়েছে।"[২০]

আরেক হাদীসে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) নবী করীম (স.) থেকে বর্ণনা করেন,

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ.

"নিশ্চয়ই শুভ্র চুলবিশিষ্ট বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করাই আল্লাহকে সম্মান করার শামিল।"[২১]

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন,

جَاءَ شَيْخٌ يُرِيْدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوْا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا -

"একজন বয়স্ক লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে দেখা করতে আসলে লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে বিলম্ব করল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[২২]অন্য হাদীসে এসেছে, "ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের হক কী তা জানে না।"[২৩]

---

১৯ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭২১২; ইবনু হিব্বান, হাদীন নং ৩০৪৩ ।সূরা রূমঃ ৫৪।

২০ সুনানে তিরমিযী, কিতাবুয্ যুহ্‌দ, বাবুন মিনহু, হাদীসড নং ২৩৩০। সূরা নাহলঃ ৭০।

২১ সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবুন ফি তানযিলিন নাসি মানাযিলাহুম, হাদীস নং ৪৮৪৩।

২২ সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাবু মা জা'আ ফি রহমাতিস্ সিবইয়ান, হাদীস নং ১৯১৯।

২৩ সুনান আবূ দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবুন ফী রাহমাতি...., হাদীস নং-৪৯৪৩।

কেউ বয়স্ক মানুষকে সম্মান করলে আল্লাহ তা'আলা ও তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে যুবক কোনো বৃদ্ধকে বার্ধক্যের কারণে তাকে সম্মান করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তার বৃদ্ধাবস্থায় এমন লোক নিয়োজিত করবেন যে তাকে সম্মান করবে।"[২৪] অন্য এক হাদীসে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বৃদ্ধ মুসলমানকে সম্মান এবং কুরআন সংরক্ষণকারীকে সম্মান করা এক। কেউ যেন তাকে বাড়াবাড়ি ও তাদের হক আদায়ে ত্রুটি না করে এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা ও আল্লাহকে সম্মান করারই অন্তর্ভুক্ত।"[২৫]

প্রবীণ, বৃদ্ধ অথবা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের পারিবারিক বন্ধন থেকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন করা গ্রহণযোগ্য নয়। পরিবারের ছোট কিংবা বড়দের দেখাশোনা ও দিকনির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব কিন্তু প্রবীণদের। তাদের অভিজ্ঞতা ও সাহচর্য পারিবারিক শান্তি ও সংহতি বজায় রাখে। এমন বৃদ্ধ মানুষ পৃথিবীতে আছে বিধায় এ ধরা কল্যাণ ওবরকতময়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَلْبَرَ كَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمِ.

"প্রবীণদের সাথেই তোমাদের কল্যাণ ও বরকত রয়েছে।"[২৬]

অন্যত্র তিনি বলেন,

ابْغُوْنِي الضَّعِيْفَ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ .

"তোমরা আমাকে দুর্বলদের মাঝে খোঁজ করো। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের অসিলায় তোমরা রিযিক ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাকো।"[২৭]

إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هٰذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে তাদের দুর্বল লোকদের দু'আ, সালাত ও ইখলাসের মাধ্যমে সাহায্য করে থাকেন।"[২৮] কারণ দুর্বলদের ইবাদতে ও দু'আয় একনিষ্ঠতা থাকে, থাকে দুনিয়ার সৌন্দর্য থেকে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা। সেই কারণে তাদের দু'আ কবুল হয়ে থাকে। তাই বৃদ্ধ যেই হোক না কেন তাকে সর্বাবস্থায় সম্মানের চোখে দেখতে হবে।

---

২৪ সুনান আত-তিরমিযী, কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস-সিলাহ, বাবুন মা জা আ ফি ইজলালিল কাবীর, হাদীস নং ২০২২।

২৫ সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবুন ফি তানযিলিন নাসি মানাযিলাহুম, হাদীস নং ৪৮৪৩।

২৬ ইবনু হিব্বান হাদীস নং ৫৫৯; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস নং ২১০।

২৭ সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু মান ইস্তায়ানা বিদদোয়াফা...., হাদীস নং২৮৯৬; সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৩১৭৯; আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৫৯৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২১৭৩১।

২৮ সুনান নাসাঈ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ৩১৭৮।

ঈমান ও আমলের সাথে বার্ধক্যে উপনীত হওয়া পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইসলামের মাঝে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তার বার্ধক্য কিয়ামতের দিন তার জন্য নূর হবে।"[২৯]

বৃদ্ধদের এমন বিশেষ মর্যাদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) দেওয়ার পরও যারা তাদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দিয়ে অবহেলা করবে তারা মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-কেই অমান্য করে।

২. বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা-যত্নের ব্যাপারে ইসলামের বিধান মান্য করা

আমরা যাদের মাধ্যমে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছি, পৃথিবীর আলো-বাতাসে বড় হয়েছি এবং যাদের মাধ্যমে মানব বংশ পরিক্রমা নির্ধারিত হয় তারা হলেন পিতা-মাতা। পিতা-মাতা আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এবং সন্তান ও পিতা-মাতার সম্পর্ক স্বর্গীয়, যা খুবই আন্তরিক, মধুর ও গভীর। আমাদের জীবনে পিতা-মাতার অবদান অতুলনীয়, অনস্বীকার্য। মানব সন্তানের অস্তিত্ব, জন্ম ও লালন-পালন ইত্যাকার বিষয়ে আল্লাহর পরেই পিতা-মাতার অবদান সবচেয়ে বেশি। এজন্যই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায়, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং পরম যত্নের সাথে সেবা ও খেদমত করতে বলেছেন। আল্লাহর পরই পিতা-মাতার হক আদায়ের তাকীদ দিয়ে ইসলাম পিতা-মাতাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। মহান আল্লাহ বলেন :

لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللهَ ۙ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো"।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর ইবাদাতের পরপরই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার পরেই পিতা-মাতার স্থান বা মর্যাদা। আল্লাহ তা'আলার হক আদায়ের পর মানুষের উপর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করা। মহান আল্লাহ পিতা-মাতার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দানের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا -

"আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের একজন অথবা উভয়ে যদি

---

২৯ সুনানেতিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ, বাবুন মা জাআ ফি ফাদলি মান শাবা শাইবাতা ফি সাবীলিল্লাহি, হাদীস নং ১৬৩৪।সূরা বাকারা: ৮৩

তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তুমি তাদের প্রতি 'উহ' শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো। আর তাদের প্রতি দয়া দেখাও এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তারা শৈশবকালে দয়াবশে লালন-পালন করেছেন"

আলোচ্য আয়াতে সদাচরণের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ অবস্থাকে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং মহান আল্লাহ স্বীয় ইবাদতের সাথে পিতা-মাতার সেবাকে একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন, এটিকে তাওহীদ বিশ্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বুঝানোর জন্য। এর কারণ সৃষ্টিকর্তা হিসেবে যেমন আল্লাহর কোন শরীক নেই, তেমনি জন্মদাতা হিসেবে পিতা-মাতার সাথেও অন্য কারো শরীক নেই। আল্লাহর ইবাদত যেমন বান্দার উপর অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি সন্তানের উপর অপরিহার্য। অথচ আল্লাহ তা'আলার এ বিধান অমান্য করে অনেক সন্তান বৃদ্ধ পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণ করে থাকে। এমনকি মারধর পর্যন্ত করে। স্ত্রীকে খুশী করার জন্য বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অচেনা জায়গায় ফেলে আসা, দূরপাল্লার গাড়ীতে তুলে দিয়ে পালিয়ে আসা, জোর-জবরদস্তি করে জায়গা-জমি নিজ নামে নিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দেয়া, হাসপাতালে ভর্তির কথা বলে বৃদ্ধাশ্রম নামক কারাগারে বন্দি করে রাখার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার কথা মাঝেমধ্যে পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। অথচ মহান আল্লাহ তাদের সাথে এমন আচরণ তো দূরের কথা কষ্টদায়ক 'উহ' শব্দও করতে নিষেধ করেছেন, বরং শ্রদ্ধাভরে নম্রভাবে তাদের সাথে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করার এরূপ নির্দেশের কারণ হলো সন্তান গর্ভে ধারণ থেকে শুরু করে লালন-পালন করে বড় করা পর্যন্ত পিতা-মাতা যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্ট করে থাকেন তা যেন মানুষ সদাচরণের মাধ্যমে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ -

"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখো) তোমার প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই"

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَ حَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করেছে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পান ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস"

সুতরাং কেউ আল্লাহর এরূপ নির্দেশ অমান্য করে পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণ করার অর্থই হলো পিতা-মাতার সকল অবদানকে অস্বীকার করে কৃতঘ্নতার পরিচয় দেয়া। এছাড়া পিতা-মাতা সর্বাধিক সদাচরণ পাওয়ার যোগ্য এ কারণে যে, মানুষ পিতা-মাতার মাধ্যমেই দুনিয়াতে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

بَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْ كُوْرًا 0اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا 0

"নিশ্চয়ই মানুষের উপর যুগের এমন একটি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি (পিতা-মাতার) মিশ্রিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন"।

পবিত্র কুরআনের এ সকল আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি অবিচল থাকার পাশাপাশি পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার বা সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এ সদাচরণের অর্থ হলো পিতা-মাতার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, তাদের সাথে সুন্দর ও কোমল ব্যবহার করা, তাদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখে সেবা-যত্ন করা ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা। শুধু তাই নয়, সূরা নিসার ৩৬ এবং সূরা নাহলের ৭৮ নং আয়াতে পিতা-মাতার হকসমূহকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে বান্দা তার জীবদ্দশায় সার্বিক সতর্কতা বজায় রেখে অকৃত্রিমভাবে পিতা-মাতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়। এরূপপিতা-মাতার প্রতি এরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করলেই আল্লাহর নির্দেশ পালিত হবে।

৩. সম্পদে পিতা-মাতার মালিকানা ও ভোগের অধিকার দেওয়া

ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা-মাতা কেবল সন্তানের অভিভাবকই নন, তাদের সম্পদের মালিকও বটে। সন্তানের উপার্জিত সম্পদের বা তাদের মালিকানায় রক্ষিত যেকোনো জিনিস নির্দ্বিধায় ভোগ করার অধিকার পিতা-মাতার রয়েছে। হাদীসে এসেছে,

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِيْ يَحْتَاجُ مَالِيْ قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَ كُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ -

"একজন লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমার সম্পদ ও সন্তান আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বললেন, তুমি ও তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানের উপার্জন থেকে খাও (ভোগ-ব্যয় করো)।"[৩০]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, যারা উপার্জন করতে শিখে পিতা-মাতাকে গালি দেয় বা খোঁটা দেয়, ভরণপোষণ করতে চায় না তাদের জানা উচিত সে ও তার মাল সবই তার পিতা-মাতার। এখানে অহংকার করার কিছুই নেই। এমনকি পিতা-মাতার পূর্বে সন্তান-সন্ততি মারা গেলে তার বা তাদের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে সর্বপ্রথম তার পিতা-মাতার নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ অন্যান্য ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করতে হয়। এটা ইসলামের এক অনন্য বিধান।[৩১]

৪. ইসলামে পিতা-মাতার সেবা-যত্নের গুরুত্ব

পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রূষা ও দেখভাল করা তথা তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া সন্তানের উপর ফরয। আল্লাহর ইবাদত যেমন বান্দার জন্য অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি সন্তানের ওপর অপরিহার্য। আল্লাহর ইবাদতের ফায়সালা যেমন চূড়ান্ত, পিতা-মাতার সেবা করার ফয়সালাও তেমনি চূড়ান্ত। এছাড়া হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) পিতা-মাতার সেবা করাকে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল বলে বর্ণনা করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوْكَ -

"এক লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।"[৩২]

এ হাদীসে তিনবার মায়ের হক আদায়ের কথা বলে পিতার চেয়ে সন্তান লালন-পালনে একজন মা যে অধিক কষ্ট স্বীকার করে থাকেন তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আর একবার বাবার কথা বলে উভয়ের হক আদায়ের জন্য সন্তানের প্রতি তাগিদ দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু পিতা-

---

৩০ সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল ইজারাহ, বাবু ফির রাজুলি ইয়া'কুলু মিন মালি অলাদিহি, হাদিস নং ৩৫৩০; সুনানে ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ২২৯২।সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪।

৩১ বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, সূরা আন-নিসা: ১১।সূরা লুকমান:১৪।

৩২ সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবু মান আহাক্কান নাসি বিহুসনিস সুহবাতি, হাদিস নং ৫৪৩৩; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৪৮।সূরা আহ্‌কাফ: ১৫।

মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ রয়েছে ইসলামে এবং বৃদ্ধাবস্থায় পিতা-মাতাকে নিজের কাছে পেয়ে তাদের সেবাযত্নের মাধ্যমে যারা জান্নাত লাভ করতে পারবে না, তাদের ধ্বংস অনিবার্য বলে মহানবী (সা) মানবজাতিকে সাবধান করে দিয়েছেন।

হাদীসে নববীতেপিতা-মাতার সেবা-যত্নের প্রতিদান বা পুরস্কারের ব্যাপারে যে সব বর্ণনা এসেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

ক. পিতা-মাতা সন্তানের জান্নাত লাভের মাধ্যম

ইসলাম পিতা-মাতার সেবা-যত্নের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করেছে এবং ঘোষণা করেছে পিতা-মাতা হলো সন্তানের জান্নাতে যাওয়ার অসিলা।যে সন্তানের প্রতি পিতামাতা অসন্তুষ্ট থাকে,তার জান্নাত সুদূর পরাহত। এ সম্পর্কে হাদীসের ভাষ্য হলো:

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ.

"আবূ উমামা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! সন্তানের উপর পিতামাতার হক কী? তিনি বললেন, পিতা-মাতা হলো তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম।"[৩৩]

এ হাদীসের মর্ম হলো, যদি সন্তান পিতা-মাতার খেদমত করে, তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদের হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, তাহলে এর বিনিময়ে তাকে জান্নাত দেয়া হবে। পক্ষান্তরে সন্তানের আচরণে যদি পিতা-মাতা নাখোশ হন, তাহলে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একজন সাহাবী ছিলেন হযরত জাহিমাহ আস-সুলামী (রা)। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসলেন জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করার জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন :

اَلْزِمْهُمَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ اَرْجُلِهِمَا

"তুমি তাদের নিকটে থাকো। কেননা তাদের পায়ের নীচে রয়েছে জান্নাত।"[৩৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, হযরত জাহিমাহ আস-সুলামী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দুবার এসে বললেন, আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমার মা

---

৩৩ সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদাব, বাবু বির্‌রুল ওয়ালিদাইন, হাদিস নং ৩৬৬২।সূরা দাহ্‌র: ১-২।

৩৪ ত্বাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ২২০২।

কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, فَبَرَّهَا اِرْجِعْ তুমি ফিরে যাও, তার সাথে সদাচরণ করো। অবশেষে তৃতীয় বার সম্মুখ থেকে এসে একই আবেদন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, اِلْزَمْ وَيْحَكَ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةَ "তোমার ধ্বংস হোক! তার পায়ের কাছে থাকো। সেখানেই জান্নাত।"[৩৫]

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, তুমি তোমার মায়ের সেবা করো। فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا "কেননা জান্নাত তার দু পায়ের নীচে।"[৩৬]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ

"তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! কার? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বার্ধক্যে পেল অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করল না ।"[৩৭]

খ. পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

"পিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি রয়েছে।[৩৮]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

اَلْوَالِدُ اَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَحَافِظْ إِنْ شِئْتَ أَوْ ضَيِّعْ

"পিতা হলেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি চাইলে তা রেখে দিতে পারো অথবা বিনষ্ট করতে পারো।"[৩৯]

---

৩৫ সুনানে ইবনু মাজাহ, কিতাবুল জিহাদ, বাবুর রাজুলি ইয়াগযু অলাহু আবওয়ানে, হাদিস নং ২৭৮১।

৩৬ সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ৩১০৪।

৩৭ সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৬২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৮৫৫৭, শু'আবুল ঈমান, হাদিস নং ৭৫০০।

৩৮ সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাবুল ফাজরি ফি রিজাল ওয়ালিদাইন, হাদিস নং ১৮৯৯; বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, খ. ৬, হাদীস নং ৭৮২৯।

৩৯ সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস-সিলাহ, বাবুন মা জাআ মিনাল ফাদলি ফি রিদাল ওয়ালিদাইনে, হাদিস নং ১৯০০; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৭৫৫১; সুনানে ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ২০৮৯।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালোবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি তাকে তালাক দিতে বলেন। আমি তাতে অস্বীকার করি। তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলা হলে তিনি বলেন,

أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا، فَطَلَّقْتُهَا

"তুমি তোমার পিতার আনুগত্য করো এবং তাকে তালাক দাও। অতঃপর আমি তাকে তালাক দিয়ে দেই।"[৪০]

হাদীসের মর্মানুযায়ী ঈমানদার ও দূরদর্শী পিতার আদেশ মান্য করা ঈমানদার সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কারণ কারো জান্নাতে যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করে পিতা-মাতার আনুগত্যের উপর। তবে পুত্র ও তার স্ত্রী উভয়ে ধার্মিক ও আনুগত্যশীল হলে ফাসিক পিতা-মাতার অন্যায্য নির্দেশ এক্ষেত্রে মানা যাবে না।

গ. পিতা-মাতার সেবা জিহাদে গমনের চেয়ে উত্তম

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে এসে বলল, আমি আপনার নিকটে হিজরত ও জিহাদের উপরে বায়আত গ্রহণ করতে চাই, যার দ্বারা আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, তোমার পিতা-মাতার কেউ কি জীবিত আছেন? লোকটি বলল, হ্যাঁ, দুজনেই বেঁচে আছেন। আমি তাদের উভয়কে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এরপরও তুমি আল্লাহর নিকট পুরস্কার আশা করো? তারপর তিনি বললেন,

فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ

"তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও ও সর্বোত্তম সাহচর্য দান করো এবং তাদের কাছেই জিহাদ করো।"[৪১]

তিনি আরো বলেন,

فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا ، وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ

"তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে হাসাও, যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ। অতঃপর তিনি তার বায়আত নিতে অস্বীকার করলেন।"[৪২]

এতে বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা কখনো কখনো জিহাদের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। কারণ পিতা-মাতার সেবা করা সন্তানের জন্য 'ফরযে আইন' আর জিহাদ করা 'ফরযে কিফায়াহ'।

---

৪০ মুসতাদরাক আল-হাকিম, হাদিস নং ২৭৯৮; সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদিস নং ৪২৬।

৪১ সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৪৯।

৪২ সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাবুন ফির রাজুলি ইয়াগযু আবওয়াহু কারিহানে, হাদিস নং ২৫২৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ৬৮৩৩।

রাসূলুল্লাহ (সা) পিতা-মাতার আনুগত্যকে সর্বোত্তম এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় আমলের মধ্যে গণ্য করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা) নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন,

أيّ العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، قال ثم أيّ؟ قال بر الوالدين قال ثم أيّ؟ قال الجهاد في سبيل الله.

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি? তিনি বললেন, ওয়াক্ত মতো নামায আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সেবা করা। আবার বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"[৪৩]

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা করা জিহাদে গমন করার চেয়ে অধিক সাওয়াবের কাজ।

ঘ. পিতা-মাতার সেবা বিপদমুক্তির অসিলা

পিতা-মাতার সেবা-যত্ন করলে আল্লাহ তাআলা সেই মহৎ কাজকে নানা বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির অসিলা বানিয়ে দেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অনেকদিন পূর্বে তিন ব্যক্তি সফরে বের হয়ে পথিমধ্যে মুষলধারে বৃষ্টির কবলে পড়ে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ গুহা মুখে একটি বড় পাথর ধসে পড়লে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তিনজনে সাধ্যমত চেষ্টা করেও তা সরাতে ব্যর্থ হয়। তখন তারা পরস্পরে বলতে থাকে যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এই বিপদ থেকে রক্ষার কেউ নেই। অতএব যদি আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে জীবনে কোন সৎকর্ম করে থাকো, তাহলে তার দোহাই দিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো। আশা করি তিনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তখন তাদের একজন বলল, আমার সংসারে বৃদ্ধ পিতা-মাতা এবং আমার ছোট ছোট কয়েকটি শিশু সন্তান ছিল, যাদেরকে আমি প্রতিপালন করতাম। আমি প্রতিদিন মেষপাল চরিয়ে যখন ফিরে আসতাম, তখন সন্তানদের পূর্বে পিতা-মাতাকে দুধ পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে রাত হয়ে যায়। অতঃপর আমি দুগ্ধ দোহন করি। ইতোমধ্যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে যান। তখন আমি তাদের মাথার নিকট দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যতক্ষণ না তারা জেগে ওঠেন। এ সময় ক্ষুধায় আমার বাচ্চারা আমার পায়ের নিকট কেঁদে গড়াগড়ি খেয়েছিল। কিন্তু আমি পিতা-মাতার পূর্বে তাদেরকে পান করাতে চাইনি। এভাবে ফজর হয়ে যায়। অতঃপর তারা ঘুম থেকে উঠেন ও দুধ পান করেন। তারপরে আমি বাচ্চাদের পান করাই।

---

৪৩ সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাবু ওয়া সাম্মান নাবিয়্যু (সা) আস-সলাতা 'আমালান, হাদিস নং ৫৫১৩, ৭০৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৮৫।

اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ

"হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।... (এ রকম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তিও তাদের জীবনের ভালো কাজের দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলে আল্লাহ তাদের দু'আ কবুল করেন এবং গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দেন)।"[৪৪]

এতে বুঝা যায়, পিতা-মাতার সেবা-যত্ন করলে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।

ঙ. পিতা-মাতার দু'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়

সন্তানের জন্য বা সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা-মাতার যেকোনো নেক দু'আ বা বদ দু'আ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে যায়।এ মর্মে হাদীসে এসেছে,রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

ثَلَاثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيْهِنَّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ

"তিনটি দু'আ কবুল হয়, যাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই। পিতার দু'আ, মুসাফিরের দু'আ ও মাযলুমের দু'আ।"[৪৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে دَعْوَةُ الْوَالِدَيْنِ "পিতা-মাতার দু'আ।"[৪৬]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, دَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ "পিতার বদ দু'আ তার সন্তানের বিরুদ্ধে।"[৪৭]

অতএব এ ব্যাপারে সন্তানদের সর্বদা সাবধান থাকতে হবে যেন সন্তানের কোনো আচরণে পিতা-মাতার অন্তর থেকে 'উহ্' শব্দ বেরিয়ে না আসে অথবা সন্তানের প্রতি রুষ্ট হয়ে পিতা-মাতা যেন মনে বা মুখে কোন বদ দু'আ করতে বাধ্য না হন। এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সন্তানেরই।

পিতা-মাতার অবাধ্যতার পরিণাম

১. পিতা-মাতার অবাধ্যতা শিরকের পরে মহাপাপ

---

৪৪ সুনানে সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবু ইজাবাতি দু'আ-ই মান বার্‌রা ওয়ালিদাইহি, হাদিস নং ৫৪৩৬।

৪৫ সুনানেআবূ দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবুদ দু'আ-ই বিযাহরিল গাইবি, হাদিস নং ১৫৩৬।

৪৬ ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, কিতাবুল আদাব, বাবু দু'আইল ওয়ালিদাইন, হাদিস নং ৩২।

৪৭ সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বির্‌রি ওয়াসসিলাতি আন রাসূলিল্লাহি (সা), বাবু মা জাআ ফি দা'আতিল ওয়ালিদাইন, হাদিস নং ১৯০৫।

সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হলে তারা খুব কষ্ট পান। আর তাদেরকে কষ্ট দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। এজন্য পিতা-মাতার সাথে বেয়াদবী করা, তাদের অবাধ্য হওয়া, তাদেরকে গালাগালি দেয়া এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) মাতা-পিতার অবাধ্য হতে বারণ করেছেন এবং তা হারাম করে দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে,

اَلْكَبَائِرُ : اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوْسِ.

"কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যাকরা এবং মিথ্যা কসম করা।"[৪৮]

আবু বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ،وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ : أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ...

"আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে সংবাদ দেব না? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। রাসূলুল্লাহ (স.) এতক্ষণ হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। অতঃপর সোজা হয়ে বসে বললেন, সাবধান! আর মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।"[৪৯]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, শিরকের পরেই সবচেয়ে জঘন্য, কঠিন ও মারাত্মক অন্যায় হলো পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এরপরে মহাপাপ হলো মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। পিতা-মাতার অবাধ্যতা বলতে তাদের উপর রাগ করা, তাদের আনুগত্য না করা, তাদের কথায় মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, তাদেরকে ধমক দেওয়া, তাদের প্রয়োজন প্রকাশ করলে এবং কোনো কথা বললে উফ বলে বিরক্তি প্রকাশ করা ইত্যাদিকে বোঝায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের দুনিয়া আখিরাত দুটিই বরবাদ হয়ে যায়। এছাড়াও

১. মাতা-পিতার অবাধ্যতা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ।

২. এতে দুনিয়া এবং আখেরাতের জীবন সংকটাপন্ন হয়ে যায়।

৩. নিজ সন্তানও অনুরূপ অবাধ্য হয়।

৪. সমস্ত কাজে ও নিজ বয়সের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকাবেন না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না মর্মে নবী করীম (সা) ঘোষণা করেন :

---

৪৮ সহীহ বুখারী, কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযূর, বাবু আল-ইয়ামীনুল গুমুস, ১০ম খণ্ড, ইফাবা, হাদিস নং ৬২১৯, পৃ. ১৫৪।

৪৯ সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবু উকুকুল ওয়ালিদাইনে মিনাল কাবাইরি, হাদিস নং ৫৪৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৮৭।

ثَلَاثَةٌ لَايَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوْثُ وَثَلَاثَةٌ لَايَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اَلْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمَرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطٰى.

"আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির লোকের দিকে তাকাবেন না : ১. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, ২. পুরুষের বেশধারী নারী ৩. পাপাচারের কারণে স্বামী কর্তৃক ঘৃণিত স্ত্রী। আর তিন শ্রেণির লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না : ১. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, ২. মদপানকারী ব্যক্তি এবং ৩. কাউকে কিছু দান করে খোটা দানকারী।[৫০]

এমনকি পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণ করলে বা তাদের অবাধ্য হলে দুনিয়াতেই আল্লাহ ঐসব সন্তানদের শাস্তি দেন মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

كُلُّ الذُّنُوْبِ يُؤَخِّرُ اللهُ تَعَالٰى مَا شَاءَ مِنْهَا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَمَاتِ.

"সকল গুনাহের শাস্তিই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বিলম্বিত করেন শুধু পিতামাতার অবাধ্য সন্তানের শাস্তি ছাড়া। এই গুনাহ যে করবে আল্লাহ তার শাস্তি এই দুনিয়াতেই তার মৃত্যুর পূর্বে দিয়ে দেন।"[৫১]

সুতরাং পিতা-মাতার অবাধ্যতা প্রকারান্তরে আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনেরই নামান্তর।

২. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের কোনো সৎকর্ম কবুল হয় না

আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَايُقْبَلُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَاعَدْلٌ: عَاقٌّ وَمَنَّانٌ وَمُكَذِّبٌ بِقَدْرٍ

"তিন ব্যক্তির কোনো দান বা সৎকর্ম আল্লাহ কবুল করেন না। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, খোটা দানকারী এবং তাকদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তির।"[৫২]

৩. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিতহযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বরে আরোহণ করার সময় প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে বললেন, আমীন। অতঃপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রেখে বললেন, আমীন। এরপর তৃতীয় সিঁড়িতে পা রেখে বললেন, আমীন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিন বার আমীন বলতে শুনলাম, এর কারণ কী? তিনি বললেন, আমি যখন প্রথম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিবরাঈল (আ.) আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমযান মাস পেল অথচ গুনাহ মাফ করাতে পারল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয়

---

৫০ সুনানে নাসাঈ, কিতাবুয যাকাত, বাবু আল মান্নানু বিমা আ'তা, হাদিস নং ২৫৬৪।

৫১ মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস নং ৭২৬৩।

৫২ ত্বাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ৭৫৪৭।

রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আপনি বলুন, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন। দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠলে জিবরাঈল (আ.) বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল অতঃপর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার না করার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আপনি বলুন, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন। অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার কথা বর্ণনা করা হলো, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করল না। অতঃপর মারা গেল ও জাহান্নামে প্রবেশ করল আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আপনি বলুন, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন।"[৫৩]

অতএব, প্রত্যেক সন্তানের উচিত স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে পিতা-মাতার প্রাপ্য অধিকার আদায় করা।

উপসংহার

একজন মানুষের জীবনচক্রের (নবজাতককাল, শৈশবকাল, কিশোরকাল, যৌবনকাল এবং বার্ধক্যকাল) সর্বশেষ ধাপ হলো বার্ধক্যকাল। বৃদ্ধাবস্থায় প্রবীণদের সমস্যার অন্ত থাকে না। তাই এ সময়ে প্রবীণদের শারীরিকও মনস্তাত্ত্বিক শক্তি যোগাতে পরিবারের প্রভাব সবচেয়ে জোরালো ও কার্যকর। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রবীণরা যাতে অবহেলা, অবজ্ঞা, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার না হন- এর প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। প্রবীণেরা সাধারণত কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে, সেগুলো শনাক্ত করে সমাধানের জন্য পরিবার ও সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। তবে প্রবীণদের জীবনযাপনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং তাদের অধিকার, মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন ও নীতিমালা কোনো কাজে আসবে না; যদি না পারিবারিক বলয়ে প্রবীণদের জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ ও মূল্যবোধ জাগ্রত না হয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রবীণদের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে পারলেই প্রবীণদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব হবে। বৃদ্ধ পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের প্রতি দায়িত্বশীল ও অনুগ্রহশীল হতে এবং তাদের সেবা-যত্নের ব্যাপারে আন্তরিক ও নিবেদিত প্রাণ হতে ইসলাম যেভাবেগুরুত্বারোপ করেছে, নির্দেশ দিয়েছে এবং এ কর্তব্য পালন না করার যে ভয়ানক পরিণতির কথা বলেছে, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম, রাষ্ট্র বা সমাজের বিধি-নিষেধের সাথে এর কোন তুলনা হয় না। এ এক অন্য বিধান, এ বিধানের অনুসরণেই দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে। তাই আমাদের উচিত বৃদ্ধ ও বয়স্ক পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সেবা-যত্নের ব্যাপারে অধিকতর আন্তরিক হওয়া, তাদের প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার ও ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং পারিবারিক বলয়ে রেখে

---

৫৩ সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদিস নং ৪০৯; আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৬৪৬।

তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা। তারা খুশি থাকলেই মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং আমাদের হায়াত ও দৌলতে বরকত দান করবেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬১ বর্ষ ১ম- ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক : জীবন-দর্শন ও ইসলামী জ্ঞানসাধনা

ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম*

[**Abstract:***Professor Muhammad Abdul Malek was a renowned academician, a prominent Muhaddis, a famous Mufassir and an ideal teacher of thousands of Islamic scholars. He has taught for over half a century in the Department of Arabic and Islamic Studies, known as the Corner Stone of Dhaka University, the Oxford in the East.He was born on 1st January 1943 in the village of Magura in the present Nesarabad Upazila of Pirojpur district.* Even after his retirement, he was involved in the academic activities of the department till the death. During this long career, he has made outstanding contributions to the creation and distribution of knowledge. He has published many basic research articles and books. He has translated and edited many original and rare books published by the Islamic Foundation, This great Islamic academician left the world on April 9, 2021, but left some immortal contributions in the arena of Islamic knowledge.*This article attempts to learn from the colorful life of this great seeker of knowledge and to immortalize the immortal works left by him in the field of Islamic research in the hearts of future generations and inquisitive researchers.]

*[**সারসংক্ষেপ:** অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, প্রথিতযশা মুহাদ্দিস, খ্যাতিমান মুফাসসির ও হাজারো ইসলামী শিক্ষাবিদের আদর্শ শিক্ষক। সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল ব্যাপি অধ্যাপনা করেছেন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্নার স্টোন হিসেবে পরিচিত আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে। ১৯৪৩ সালের ১ জানুয়ারি বর্তমান পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলার মাগুরা গ্রামে তাঁর জন্ম। অবসরের পরও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি অনারারি অধ্যাপক হিসেবে বিভাগের একাডেমিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কর্মময় সময়ে তিনি জ্ঞান আহরণ, জ্ঞানসৃষ্টি ও বিতরণে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর বহু মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত মৌলিক ও দুর্লভ বইয়ের অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন তিনি। এই মহান শিক্ষাবিদ ২০২১ সালের ৯ এপ্রিল মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন কিন্তু জ্ঞানের জগতে রেখে গেছেন কিছু অমর কীর্তি। এই মহান জ্ঞানসাধকের বর্ণাঢ্য জীবন*

*সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

থেকে শিক্ষাগ্রহণ ও জ্ঞানগবেষণায় রেখে যাওয়া তাঁর অমর কীর্তিসমূহ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের হৃদয়ে চিরজাগরূক করে রাখার মানসে আলোচ্য নিবন্ধের অবতারণা।]

ভূমিকা

মানবজাতিকে মহান রাব্বুলআলামীন আশরাফুল মাখলুকাত ও তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণেই মানুষ এই অনন্য শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। মানুষ পৃথিবীতে আগমন করে আবার প্রাকৃতিক নিয়মে একসময় পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। আসা ও যাওয়ার মাঝে কিছু মানুষ চরিত্র-মাধুর্য, অসাধারণ প্রজ্ঞা এবং অমর কীর্তির কারণে মানুষের মনের মনিকোঠায় স্থায়ীভাবে জায়গা করে নেন। মানুষ তাঁদেরকে শ্রদ্ধা,ভক্তি ও ভালোবাসায় স্মরণ করেন। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে তাঁদের নাম। এমনই একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, উলূমুল কুরআনের অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী অসংখ্য আলিমের উসতায ও প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক। তিনি ছিলেন কুরআন, হাদীস তথা ইসলামী জ্ঞানের একজন কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব। ছাত্রজীবনে তিনি যেমন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তেমনি কর্মজীবনেও অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন সুবিজ্ঞ আলিম, বিখ্যাত মুহাদ্দিস, খ্যাতিমান মুফাসসির, আদর্শ শিক্ষক ও আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রের একজন অসামান্য পণ্ডিত। বাংলা, ইংরেজি,আরবি,উর্দু ও ফার্সি ভাষায় তাঁর ছিল সমান দখল। প্রাচীন আরবি কবিতার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। তিনি বিখ্যাত আরব কবিদের কবিতা অবলীলায় মুখস্থ শোনাতে পারতেন। ছাত্রজীবনে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেন দেশ ও জাতির কল্যাণে তা উজাড় করে দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়ে শিক্ষকতা তার প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ। এই সুদীর্ঘ সময়ে অধ্যাপনাকালে তিনি দেশ ও জাতিকে উপহার দিয়েছেন অগণিত দেশবরেণ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব, বিদগ্ধ পণ্ডিত, খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও গবেষক। তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে এই মহান জ্ঞান সাধকের জীবন-দর্শন আলোচনা করে ইসলামী জ্ঞানচর্চায় তাঁর অবদান তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মুহাম্মদ আবদুল মালেক তৎকালীন বাকেরগঞ্জ বর্তমান বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার স্বরুপকাঠী উপজেলার মাগুরা গ্রামে ১৯৪৩ সনের ১ জানুয়ারি এক ধর্মপ্রাণ মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] বর্তমানে পিরোজপুর একটি স্বতন্ত্র জেলা এবং পরবর্তীকালে

---

[১] অধ্যাপক মুহাম্দ আবদুল মালেক ১৯৬১ সালে ইস্ট পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অধীনে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এই ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে তাঁর জন্ম তারিখ ০১-০১-১৯৪৩। ইস্ট পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৫৪ সালের দাখিল পরীক্ষার সার্টিফিকেটে তার বয়স সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে - His age on the 1st March

স্বরুপকাঠী উপজেলাকে নেছারাবাদ নামে নামকরণ করা হয়েছে।[২] তাই বলা যায় বর্তমান পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলার স্বরুপকাঠী পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের মাগুরা গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মোসলেম উদ্দিন মিয়া এবং মাতার নাম সবুরা খাতুন। তাঁর পিতা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও শর্ষিনার পীর মাওলানা নেছারউদ্দিন (র)-এর একজন মুরিদ ছিলেন। পেশায় তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর মাতা অত্যন্ত পরহেযগার ও আবিদা ছিলেন। তাঁর দাদা ইসলাম মিয়াও একজন ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি কাঠের ব্যবসা করতেন।[৩] আট ভাই বোনের মধ্যে মুহাম্মদ আবদুল মালেক (র) ছিলেন তৃতীয়। শৈশবে তিনি কিছুটা অসুস্থ ও রোগা ছিলেন। তাঁর বড় একভাই ও এক বোন অতি অল্পবয়সে ইন্তিকাল করেন। যে কারণে তাঁর পরিবার পরিজন তাঁকে নিয়েও উৎকণ্ঠায় ছিলেন। তাঁর আট ভাই বোনের মধ্যে ছয়জনই অল্পবয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি এবং ছোট ভাই মো: আবদুল খালেক দীর্ঘায়ু পেয়েছেন।[৪]

শিক্ষাজীবন

চিরাচরিত প্রথানুযায়ী অন্যান্যদের মতো শিশু আবদুল মালেকের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় নিজ পরিবার থেকে। তিনি নিজেই বলেছেন গ্রামের হরিপদ মাস্টার বাবুর কাছে তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়েছিল। বাড়ির একজন ধার্মিক মহিলার নিকট তিনি কিছু দিন আরবি বর্ণমালা শিখেছিলেন। একটু বড় হবার পর তাকে শর্ষিনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করে দেয়া হয়। এ বিদ্যালয়ে তিনি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এ সময় মাওলানা আবদুল কুদ্দুস যিনি বাড়ির হুজুর নামে খ্যাতছিলেন তার মাধ্যমে পীরে কামিল মাওলানা শাহ সূফি নেছার উদ্দিন (র)-এর হাতে পবিত্র কুরআন শিক্ষার সবক গ্রহণ করার বিরল গৌরব অর্জন করেন। সে সময় চতুর্থ শ্রেণিতে বৃত্তির প্রচলন ছিল। মুহাম্মদ আবদুল মালেক চতুর্থ শ্রেণিতে

1954 was stated to be 10 years, 0 months. একই শিক্ষা বোর্ডের ১৯৫৮ সালের আলিম পরীক্ষার সার্টিফিকেটে তাঁর বয়স সম্পর্কে বলা হয়েছে- His age on the 1st March, 1958 was 15 years, 03 months. তিনি ১৯৫৬ সালে আল জামি'আতুল আরাবিয়্যাতু লি এহইয়া আল সুন্নাহ, ছারছীনা, বাকেরগঞ্জ এর অধীনে মৌলভী পরীক্ষায় (জামাতে পাঞ্জম) অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উক্ত সার্টিফিকেটে তার বয়স সম্পর্কে লেখা আছে -His age on the 31st March, 1956 was fourteen years 00 months. তাঁর এসকল সার্টিফিকেটের অনুলিপি আমার সংগ্রহে রয়েছে। এগুলোর বর্ণনাতে তাঁর বয়স সম্পর্কে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনি নিজেও তাঁর প্রকৃত জন্মসাল জানতেন না। তবে তিনি বিভিন্ন আলাপচারিতায় জন্ম ১৯৩৮ বা ১৯৩৯ সাল হবে ধারণা প্রকাশ করেন।

২ স্বরূপকাঠি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি ছোট শহর। এটি বরিশাল বিভাগের অন্তর্গত পিরোজপুর জেলায় অবস্থিত নেছারাবাদ উপজেলার প্রধান শহর। ১৯৮৫ সালে শর্ষিনার পীর নেছার উদ্দিনের নামানুসারে স্বরূপকাঠি উপজেলার নতুন নামকরণ করা হয় নেছারাবাদ।

৩ প্রবন্ধকারের সাথে (১৫.৯.২০২০) সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক আবদুল মালেক (র.) এ তথ্য জানিয়েছিলেন।

৪ অধ্যাপক আবদুল মালেক (র) এর জ্যেষ্ঠ পুত্র সিরাজুম মুনীরের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী।

বৃত্তি পেয়েছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর বিশিষ্ট শিক্ষকগণের মধ্যে আকলম নিবাসী জনাব হোসেন মাস্টার ও সেহাংগল নিবাসী জনাব সিরাজুল ইসলাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫]

প্রাথমিক শিক্ষার পর তাঁর ধর্মভীরু বাবা সন্তানকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ও আলিমেদ্বীন হিসেবে গড়ে তোলার মানসে ১৯৫০ সালে প্রখ্যাত পীর মাওলানা শাহ সূফি নেছার উদ্দিন (র) প্রতিষ্ঠিত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইলমেদ্বীন শিক্ষকেন্দ্র ও বাংলাদেশের প্রথম কামিল মাদ্রাসা ছারছীনা দারুসসুন্নাত কামিল মাদ্রাসায়[৬] পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন।[৭] এ মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার পর অল্পসময়ের মধ্যে তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। ফলে সকল শিক্ষকের কাছে তিনি অতি প্রিয় ছাত্র হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেন। এ মাদ্রাসা থেকেই তিনি ১৯৫৪ সালে দাখিল, ১৯৫৮ সালে আলিম, ১৯৬০ সালে ফযিলপরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি বোর্ড বৃত্তি অর্জন করেন। এরপর তিনি ১৯৬২ সালে একই মাদ্রাসা থেকে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত হয়ে উত্তীর্ণ হন।

ছারছীনা আলিয়া মাদ্রসায় তিনি যুগশ্রেষ্ঠ কতিপয় শিক্ষকের নিকট ইলম অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর অসংখ্য শিক্ষকেরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, যিনি সকলের কাছে বাড়ির হুজুর বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর কাছে তিনি হেদায়াতুন নাহু কিতাবটি পড়েছিলেন, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ তাজাম্মুল হোসাইন খান, মাওলানা আবুল খায়ের, মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন (তিমিরকাঠী হুজুর), মাওলানা নিয়াজ মাখদুম খোতানী (চীনা হুজুর), মাওলানা আজিজুল হক (কায়েদসাহেব হুজুর), মাওলানা সুলতান আহমাদ (ভবানীপুরী হুজুর) যিনি পীরে কামিল মাওলানা নেছার উদ্দিন এর জামাতা ছিলেন, মাওলানা হেমায়েত উদ্দিন, মাওলানা আব্দুস সাত্তার (বিহারি হুজুর), মাওলানা আব্দুল মজিদ (ডামুড্যা হুজুর), মাওলানা মুফতি আহমাদুল্লাহ (মাদারীপুরী হুজুর), মাওলানা যশ মোহাম্মদ মুর্শিদী (মুর্শিদাবাদী হুজুর), মাওলানা মুফতি আব্দুল করিম (রুপসার হুজুর), মাওলানা মো: ইউনুস (চাঁদপুরী হুজুর), মাওলানা আব্দুল হক, জনাব মো: বশিরুল্লাহ (ইংরেজি শিক্ষক) এবং জনাব নূর মোহাম্মদ (ভারনাকুলার বা ভাষা শিক্ষার শিক্ষক) প্রমুখ।[৮]

---

[৫] প্রবন্ধকারের সাথে সাক্ষাৎকারে (১৫/৯/২০২০) অধ্যাপক আবদুল মালেক এ সব তথ্য জানিয়েছিলেন।

[৬] মাদ্রাসাটি বাংলাদেশের বরিশাল বিভাগের পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলার ছারছীনা গ্রামে অবস্থিত একটি বিখ্যাত আলিয়া মাদরাসা। ১৯১৫সালে বিখ্যাত পীর নেছারউদ্দীন আহমদ এই মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বাংলাদেশের প্রথম স্বীকৃত টাইটেল (কামিল) মাদ্রাসা।
(http://bn.banglapedia.org/)

[৭] প্রবন্ধকারের সাথে (১৫.৯.২০২০) সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক আবদুল মালেক (র) এ তথ্য জানিয়েছিলেন।

[৮] প্রাগুক্ত।

সে সময় মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সরকারি স্বীকৃতি ছিলনা। দাখিল পাশকে অষ্টম শ্রেণি বিবেচনা করা হতো। তাই অনেকেই মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি প্রাইভেটভাবে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মুহাম্মদ আবদুল মালেকের জ্ঞান অর্জনের প্রতি ছিল অদম্য আগ্রহ। তিনিও সাধারণ শিক্ষা অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অধীনে প্রাইভেট (বহিরাগত) পরীক্ষার্থী হিসেবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য যে, সেবছর পিরোজপুর সাবডিভিশন থেকে তিনজন ছাত্র বহিরাগত প্রার্থী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে একমাত্র আবদুল মালেক উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৯] ১৯৬২ সালে কামিল পাশের পর তিনি শের-ই-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ বাংলার তৎকালীন বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাখার ফজলুল হক কলেজ ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৬৪ সালে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অধীনে দ্বিতীয় বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। চাখার কলেজে তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে অধ্যাপক এনায়েত করিম,অধ্যাপক আখতার হোসাইন ও বর্ধমান নিবাসী ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের প্রভাষক জনাব মো: সাইফুল ইসলামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১০]

এরপর তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ১৯৬৪ সালে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৬৭ সালে বি.এ (অনার্স) পরীক্ষায় কলা ও বাণিজ্য অনুষদের মধ্য সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেন। তাঁর এই বিরল কৃতিত্বের জন্য তৎকালে প্রচলিত কালি নারায়ন স্বর্ণপদক ও বাহরুল উলূম উবায়দী-সারোওয়ার্দী স্বর্ণপদক লাভ করেন।[১১] অতঃপর ১৯৬৮ সালে এম.এ পরীক্ষায়ও তিনি অনুষদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। এম.এ পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তিনি টিউশন ফি ফ্রিসহ সাকুল্যে পঁচাত্তর টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন।[১২] ফার্সি ভাষার প্রতি তাঁর খুব আকর্ষণ ছিল। তিনি এ ভাষায় রচিত সাহিত্য পাঠে আনন্দ পেতেন। অসংখ্য ফার্সি কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিল। জ্ঞানের আলোচনাকালে তিনি এগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের শোনাতেন। সকলে মন্ত্র মুগ্ধেরমতো শোনতেন। ফার্সি ভাষার প্রতি তাঁর এ অনুরাগের কারণেই তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি বিভাগ থেকে এম.এ (প্রিলিমিনারি) ডিগ্রি অর্জন

---

৯ প্রাগুক্ত।

১০ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক (রহ.) এর জ্যেষ্ঠ ছেলে জনাব সিরাজুম মুনীর এর সরবরাহকৃত বায়োডাটা।

১১ প্রবন্ধকারের সাথে (১৫.৯.২০২০) সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক আবদুল মালেক (র) এ তথ্য জানিয়েছিলেন।

১২ প্রাগুক্ত।

করেন। তিনি এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। বিভাগীয় অফিসে রক্ষিত তাঁর ব্যক্তিগত নথিতে সনদ সংরক্ষিত আছে।[১৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বেশকিছু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপকের একান্ত সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন এবং তাঁদের জ্ঞান-গরিমা ও প্রজ্ঞা থেকে শিক্ষা অর্জন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক ড. শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। তিনি আবদুল মালেককে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন এবং খোকা বলে ডাকতেন। মরহুম অধ্যাপক আবদুল মালেক তাঁর জীবদ্দশায় অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে শায়খ আবদুর রহীমের কথা স্মরণ করতেন। তাঁর পরিবারের সদস্যদের খোঁজ খবর নিতেন। তাঁর কন্যা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক আয়েশা খাতুন ইন্তিকাল করলে অধ্যাপক আবদুল মালেক নিজের শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করে তাঁর বাসায় যান এবং জানাযা ও দাফনে অংশ নেন।[১৪] শায়খ আব্দুর রহীম ছাড়া তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- শামসুল উলামা বেলায়েত হোসেন, অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদএছহাক, অধ্যাপক ড. সৈয়দা ফাতিমা সাদিক, অধ্যাপক ড.খন্দকার আব্দুর রহমান, অধ্যাপক ড. আফতাব আহমাদ, অধ্যাপক ড. জিয়াউদ্দিন, অধ্যাপক ড. মেসবাহ উদ্দীন ইকবালী, অধ্যাপক ড. সগীর হোসেন মাসূমী, অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। [১৫]

পারিবারিক জীবন

মুহাম্মদ আবদুল মালেক একটি সুখী ও শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। একটু অল্পবয়সে বিয়ে করে সংসারী হওয়া ও পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করা তৎকালে প্রচলিত একটি স্বাভাবিক সামাজিক রীতি ছিল। মুহাম্মদ আবদুল মালেকের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর পিতামাতার একান্ত আগ্রহ ও পছন্দের কারণে তিনি নিজ গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট সমাজসেবক হাজী মো: মোতাহার হোসেনের জ্যেষ্ঠ কন্যা মোসাম্মৎ খায়রুন্নেছার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এসময় তিনি আলিম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছিলেন। ছাত্রজীবনে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াটা তাঁর অনেক শিক্ষক অপছন্দ করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন এতে করে একজন মেধাবী ছাত্রের শিক্ষাজীবন বিপন্ন হবে। কিন্তু আবদুল মালেকের পড়ালেখার প্রতি ভালোবাসা ও ইলম হাসিলের অদম্য বাসনা এবং প্রচেষ্টার কারণে ব্যাপারটি তাঁর শিক্ষাজীনে নেতিবাচক কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি বা কোন প্রতিবন্ধকতাও তৈরি

---

[১৩] প্রাগুক্ত।

[১৪] প্রাগুক্ত।

[১৫] প্রাগুক্ত।

করেনি। মাদ্রাসার শিক্ষাজীবনে প্রতিটি পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে তিনি নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন। তাঁর সহধর্মিণী একজন পতিপরায়ণা মহীয়সী নারী। তিনি তাঁকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে এবং কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন,সাহস যুগিয়েছেন, ছায়ারমতো আগলে রেখেছেন। সংসার পরিচালনায় সাহায্য করেছেন, সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চরম ধৈর্যধারণ করে কঠিন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি চার ছেলে ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। সন্তানদের প্রত্যেককেই প্রাথমিকভাবে ইসলামের মৌলিক বিধানাবলি শিক্ষা দিয়েছেন। সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিখিয়েছেন। তারা সকলেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর সাতজন সন্তানই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেছেন।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবন

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক একটি বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী ছিলেন। অর্ধশতাব্দীরও বেশিকাল ছিল তাঁর গৌরবময় কর্মজীবন। জ্ঞানঅর্জন,নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও জ্ঞান বিতরণের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। তাই তিনি শিক্ষকতাকে গ্রহণ করেছিলেন একটি মহান ব্রত হিসেবে। তিনি ১৯৬২ সালে কামিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার পর ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার আলিমাবাদ ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রসার সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর পূর্ববর্তী সুপারের বেতন ছিল নব্বই টাকা, কিন্তু মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি তাঁর বেতন নির্ধারণ করেন একশত পাঁচ টাকা। তাঁদের কথা মুহাম্মদ আবদুল মালেকের মতো একজন ভালো ছাত্র ও পরহেযগার আলিমকে সুপার হিসেবে রাখতে হলে তাঁর সম্মানজনক বেতন-ভাতাদি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অথচ অধ্যাপক আবদুল মালেক নিজ থেকে কোন পারিশ্রমিক দাবি করেননি। এখানে তিনি ছয় মাসের মতো চাকুরি করেন। উচ্চশিক্ষা অর্জনের পথ সুগম করার লক্ষ্যে চাকুরি ছেড়ে তিনি সেই বছরই চাখার ফজলুল হক কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন।[১৬] এই কলেজ থেকে আই.এ পাশ করার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৬৮ সালে এম.এ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে বি.এ অনার্সের ফলাফলের ভিত্তিতে তিনি কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া কলেজে যোগদানের নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন, কিন্তুসেখানে যোগদান করেননি।[১৭]ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এম.এ ফাইনাল পরীক্ষা শেষে ফলাফল প্রকাশিত হবার পূর্বে তিনি ১৯৬৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর ফজলুল হক কলেজ, চাখার[১৮]-এ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন।

---

১৬ প্রাগুক্ত।

১৭ প্রাগুক্ত।

১৮ প্রাগুক্ত।

এখানে তিনি ১৩ আগস্ট ১৯৭০ পর্যন্ত প্রায় দুই বছর অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সুনামের সাথে চাকুরি করেন। কলেজের তৎকালীন স্বনামধন্য অধ্যক্ষ ছিলেন প্রফেসর এনায়েত করিম এবং উপাধ্যক্ষ ছিলেন সৈয়দ আখতার হোসাইন।

১৯৭০ সালের ১৯ আগস্ট তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন।[১৯] তখন হেডস অবদি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড.সিরাজুল হক। যথারীতি তিনি বিভাগে পাঠদানসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তিনি নিজেই স্মৃতিচারণে বলেছিলেন, নিয়োগ পাওয়ার পরেই তাঁকে এম.এ শ্রেণিতে ক্লাস দেওয়া হয় এবং এম.এ পরীক্ষা কমিটির সদস্য করা হয়। তিনি বলেন, বিভাগে কর্মরত তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী তার প্রতি আস্থা রেখেছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে ড. মোহাম্মদ এছহাক তার প্রতি অগাধ আস্থা রাখতেন। এভাবে ভালোই চলছিল তার চাকুরি জীবন। কয়েক মাস চাকুরি করার পর তিনি জানতে পারলেন একটি প্রশাসনিক ত্রুটি হয়েছে তাঁর নিয়োগ প্রক্রিয়ায়। তিনি বিশ্বদ্যিালয়ে চাকরির আবেদন করেছিলেন এবং যথাসময় সিলেকশন বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি ডাকযোগে প্রেরিত নিয়োগপত্র পেয়ে বিভাগে যোগদান করেন। কিন্তু ভুলটি হলো সিলেকশন বোর্ড নাকি নিয়োগ দিয়েছেন এ.কে.এম আব্দুল মালেক নামক প্রার্থীকে। আর ভুলক্রমে রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র ইস্যু হয়েছে মুহাম্মদ আবদুল মালেক এর নামে। অধ্যাপক আবদুল মালেক বিষয়টি জানলেন তাঁর প্রিয় শিক্ষক ড. মোহাম্মদ এছহাক স্যারের কাছে। এছাড়া সাবেক হেডস অব দি ডিপার্টমেন্ট ড. সিরাজুল হক বিষয়টি তদন্তের জন্য অনুরোধ জানিয়ে রেজিস্ট্রার রবাবর একটি পত্রও প্রেরণ করেছিলেন।[২০] এখন কীভাবে এই প্রশাসনিক ভুল সংশোধন করা যায় তা নিয়ে কয়েক মাস কেটে যায়। ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল হেডস অবদি ডিপার্টমেন্ট ড. মোহাম্মদ এছহাক স্যারের পরামর্শে তাঁকে সাথে নিয়ে তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি আবু সাঈদ চোধুরীর কাছে রিজাইন লেটার প্রদান করেন। ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর রিজাইন লেটার গ্রহণ করে বলেছিলেন,"মি. আবদুল মালেক! আপনি আমাকে একটি

---

[১৯] প্রাগুক্ত।

[২০] ৪-৯-১৯৭০ ঢাবি রেজিস্ট্রার বরাবর ড. সিরাজুল হক প্রেরিত পত্রের ভাষা ছিল এরকম - In June last, in a meeting of the selection committee which I attend as the Head of the Department of Arabic and Islamic studies, we selected one temporary senior lecturer from among the candidates of the Department and, in the consequent vacancy, we selected one Mr. A.K.M. Abdul Malek from outside. But now I understand from the present Head of the Department that instead of Mr. A. K.M. Abdul Malek one Mr. Md. Abdul Malek has recently joined the Department as a temporary lecturer. I would, therefore request you to kindly investigate into the matter and take necessary steps.

জটিল ও বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করলেন। আমি আপনাকে আজকেই নিয়োগদিতে পারতাম, কিন্তু সমালোচনা হবে যে সিন্ডিকেটে পদত্যাগ কার্যকর আবার সেই সিন্ডিকেটেই পুনঃনিয়োগ। আপনাকে আমি আগামী সিন্ডিকেটে নিয়োগ দিয়ে দিব।"[২১] দেশে তখন মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছিল। ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগদানের জন্য জেনেভা সফরে গমন করেন। সেখানে একটি পত্রিকায় পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্রের মৃত্যু সংবাদ দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক শিক্ষা সচিবকে পাকিস্তান দূতাবাসের মাধ্যমে প্রেরিত এক পত্রে লেখেন, "আমার নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর পর আমার ভাইস চ্যান্সেলর থাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তাই আমি পদত্যাগ করলাম।" নতুন ভিসি হয়ে আসলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন।[২২] মুহাম্মদ আবদুল মালেকের নিয়োগ তখন আর হলোনা।

এসময় তিনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেও মহান আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল ছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি ঢাকার কবি নজরুল কলেজে (সাবেক ইসলামিয়া কলেজ) চাকুরি পেয়ে যান। ৮ আগস্ট ১৯৭১ সালে তিনি কবি নজরুল কলেজের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৭২ সালের ১৩ মার্চ পর্যন্ত তিনি সেখানে চাকুরি করেন।[২৩]

মুহাম্মদ আবদুল মালেক ১৯৭২ সালের ৩ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আররি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে আবার যোগদান করেন। এরপর তিনি যথাক্রমে ১৯৭৮ সালের ২৮ আগস্ট সহকারী অধ্যাপক, ১৯৮৬ সালের ৪ এপ্রিল সহযোগী অধ্যাপক এবং ১১ জানুয়ারি ১৯৯৯ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন।[২৪] তিনি ১৯৯২ সালের ৫ জুলাই থেকে ১৯৯৫ সালের ৪ জুলাই পর্যন্ত তিন বছর অত্যন্ত সফলতার সাথে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।[২৫] সুদীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর অধ্যাপনা শেষে ২০০৮ সালের ৩০ জুন তিনি অবসরোত্তর ছুটিতে গমন করেন এবং ৩০ জুন ২০০৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন।[২৬] আনুষ্ঠানিক অবসর গ্রহণ করলেও জ্ঞান সাধনা থেকে অবসর নেওয়ার লোক তিনি ছিলেন না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণ অব্যাহত রেখেছিলেন। তাইতো

---

২১ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেকের ব্যক্তিগত নথি, রেকর্ড সেকশন, প্রশাসনিক ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২২ অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশি বছর (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশন, ২০০৩), পৃ. ২০০।

২৩ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক (র.) এর পরিবার থেকে সংগ্রহকৃত জীবন বৃত্তান্ত ।

২৪ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেকের ব্যক্তিগত নথি, রেকর্ড সেকশন, প্রশাসনিক ভবন, ঢাকা বিশ্ববিধ্যালয়।

২৫ প্রাগুক্ত।

২৬ প্রাগুক্ত।

তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আরো সমৃদ্ধ করার জন্য বিভাগীয় উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির (সিএন্ডডি) সুপারিশক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের ২৫/১০/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁকে সুপারনিউমারারী অধ্যাপক (সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক) হিসেবে নিয়োগদান কর হয়।[২৭] তিনি ২৭/১০/২০০৯ তারিখে এ পদে যোগদান করেন এবং ২৬/১০/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত পাঁচ বছর উক্ত পদে বহাল ছিলেন। এরপরও তিনি ২৭/১০/২০১৪ তারিখ থেকে ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত অনারারি অধ্যাপক হিসেবে বিভাগের সাথে যুক্ত ছিলেন। ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্বেও তিনি জ্ঞান গবেষণার কাজে বিভাগে এসেছিলেন। আমৃত্যু ইলমেদ্বীন বিতরণের এরকম মহান সুযোগ লাভ করা সত্যিই একটি বিরল ভাগ্যের ব্যাপার। মহান আল্লাহ তাঁকে এ বিরল সুযোগ দান করেছেন। এজন্য তিনি সর্বদা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।

সুদীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে তিনি কুরআন, হাদীস ও তাফসীরের দারস দিয়েছেন একনিষ্ঠভাবে। অগণিত শিক্ষার্থীকে পরম যত্নে গড়ে তুলেছেন। অসংখ্য জ্ঞানী গুণী,পণ্ডিত, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ তাঁর জ্ঞানের মশাল নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বর্তমানে ইসলামী শিক্ষার পঠন পাঠনের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় অধিকাংশই তাঁর ছাত্র বা ছাত্রের ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বর্তমানে কর্মরত সকল শিক্ষক তাঁর সরাসরি ছাত্র। বিভাগের সাবেক শিক্ষকদের মধ্যে মরহুম অধ্যাপক ড. এ.এইচ.এম মুজতবা হোছাইন, মরহুম অধ্যাপক ড. রুহুল আমীন, মরহুম অধ্যাপক ড. মো: আনসারউদ্দিন, ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী প্রমুখ তাঁর ছাত্র ছিলেন। এছাড়াও তাঁর অসংখ্য শিক্ষার্থী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- অধ্যাপক ড.এফ.এম.এ.এইচ. তাকী, অধ্যাপক ড. আবুল কালাম পাটোয়ারি, অধ্যাপক ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. এবিএম সিদ্দিকুর রহমান, জনাব মোফাজ্জল হোসাইন খান, অধ্যাপক ড. মো: সোলায়মান, অধ্যাপক এবিএম আবদুল মান্নান মিয়া,অধ্যাপক ড. আবু জাফর খান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক, ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, অধ্যক্ষ মাওলানা আ.খ.ম আবু বকর সিদ্দিক প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রশাসনে দায়িত্ব পালন

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রশাসনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠারসাথে পালন করেন। নিচে তার বিবরণ দেয়া হলো:

---

[২৭] ঢাবি রেজিস্ট্রারের পত্র নং প্র-১০১৫৬৯৭, তারিখ ২৭/১০/২০০৯।

(১) চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি ১৯৯২ সালের ৫ জুলাই থেকে ১৯৯৫ সালের ৪ জুলাই পর্যন্ত তিন বছর এ দায়িত্ব পালন করেন।

(২) সহকারী আবাসিক শিক্ষক, শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি ১-৯-১৯৮২ তারিখ থেকে ৩১/৮/১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন করেন।[২৮]

(৩) আবাসিক শিক্ষক, শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি ১-৯-১৯৮৮তারিখ থেকে ২৯/১০/১৯৯২ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন।[২৯]

(৪) সদস্য, সিলেকশন বোর্ড, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সিলেকশন বোর্ডের সদস্য ছিলেন।[৩০]

(৫) তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের আরবি বিভাগের শিক্ষক সিলেকশন বোর্ডের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

(৫) উপদেষ্টা, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৭) সদস্য, সিলেকশন বোর্ড, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

(৮) সদস্য, সিলেকশন বোর্ড, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

(৯) সদস্য, সিলেকশন বোর্ড, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

(১০) সদস্য, সিলেকশন বোর্ড, দাওয়াহ এন্ড আল-কুরআন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

(১১) সদস্য, গভর্নিং বডি, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা,পিরোজপুর। তিনি এ মাদ্রাসার পরিচালনা পর্ষদে একটানা নয় বছর সদস্য হিসেবে কাজ করেন।[৩১]

(১২) সদস্য, বোর্ডসভা কমিটি, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।

(১৩) তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়,গাজীপুর এর অধীনে বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক নিয়োগ বোর্ডে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

---

[২৮] ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রেরিত নিয়োগপত্র নং সংস্থাপন/২৭৯০৮, তারিখ: ২০/১২/১৯৮২ ও অফিস নথি, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[২৯] অফিস নথি, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[৩০] অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেকের ব্যক্তিগত নথি, রেকর্ড সেকশন, প্রশাসনিক ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[৩১] অফিস নথি, ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা, পিরোজপুর।

(১৪)সভাপতি, সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি,ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়,গাজীপুর।

(১৫) সদস্য, পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

বিভিন্ন গবেষণা সংস্থায় দায়িত্ব পালন

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক একজন জ্ঞানসাধক ছিলেন। সারা জীবন জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার সাথে সংযুক্ত ছিলেন। দেশের বিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি কাজ করেছেন। কখনও তিনি সম্পাদনা করেছেন আবার কখনও গবেষণা রিভিউ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

(১) সভাপতি, সম্পাদনা পরিষদ, তাফসীরে মাযহারী (১৩ খণ্ডে সমাপ্ত),ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

(২) সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ, সুনানে নাসায়ী শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

(৩) সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ, সীরাতুন্নবী (সা) লি ইবন হিশাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

(৪) সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ, আল-হিদায়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

(৫) সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ, দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ।

(৬) সদস্য, বোর্ডস অব এডিটরস, দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ [জার্নাল অবদি ফ্যাকাল্টি অব আর্টস], ভলিউম-৬০ নং-২, ডিসেম্বর,২০০৩ ও ভলিউম-৬১ নং ১, জুন ২০০৪।

(৭) সদস্য, পাঠ্যসূচি পরিমার্জন ও নবায়ন কমিটি, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

(৭) সদস্য, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ।

এছাড়াও তিনি তার কর্মময় জীবনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব ইসলামিক স্টডিজ, দি চিটাগং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল সহ দেশি বিদেশি অসংখ্য গবেষণা জার্নালের প্রবন্ধ রিভিউ করে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করে জ্ঞান গবেষণায় অবদান রেখেছেন।

একক সম্পাদনা

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বেশ কয়েকটি দুর্লভ পুস্তক সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ আটটি। তিনি তাফসীরে রুহুল মা'আনী

২য় ও ৩য় খণ্ড, তাফসীরে কাবীর ১ম খণ্ড, ই'লাউস সুনান ৭ম খণ্ড এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬ষ্ঠ খণ্ড এককভাবে সম্পাদনা করেন।

জাতীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ এর বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক পর্যায়ের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের একজন অন্যতম লেখক ছিলেন। ২০১২ সাল থেকে নতুন কারিকুলামের আওতায় এ পাঠ্যপুস্তক প্রচলিত আছে। এর আগে ১৯৯৫ সাল থেকে প্রবর্তিত মাধ্যমিক স্তরের ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ইসলাম ধর্ম শিক্ষার তিনি একজন লেখক ছিলেন। তাঁর লেখা পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বইগুলো হলো:

(১) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ষষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

(২) ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, সপ্তম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১২।

(৩) ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা,অষ্টম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১২।

(৪) ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১২।

গবেষণা প্রবন্ধ রচনা

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক একজন বিদগ্ধ গবেষক ছিলেন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স ফাইনাল ইয়ারে অধ্যয়নকালীন সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার তৎকালীন খ্যাতনামা অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ ড. আলাউদ্দিন আল আযহারীর তত্ত্বাবধানে "বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্পে কাজ করেন। বিখ্যাত মুফতী আল্লামা আমীমুল ইহসান ও আল্লামা কাশগরী (র) এ প্রকল্পের গবেষক নির্বাচনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।[৩২] তিনি গ্রন্থ সম্পাদনা, অনুবাদ ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের পাশাপশি বেশকিছু গবেষণা প্রবন্ধ দেশি ও বিদেশি স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা আঠারটি। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধের তালিকা পেশ করা হলো:

(১) শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হুসাইন (১ম পর্ব), ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই- সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

---

[৩২] প্রবন্ধকারের সাথে (১৫.৯.২০২০) সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক আবদুল মালেক (র) এ তথ্য জানিয়েছিলেন।

(দুই) শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হুসাইন (২য় পর্ব), ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮০।

(২) The Mutazilite Thesis of The Freedom of Will, The Dhaka University Studies, Journal of the Faculty of arts, University of Dhaka, Part A, Vol. 48, No. 1, June1991.

(৩) The Treatment of Slaves in The Ancient and Medieval Ages, The Dhaka University Studies, Journal of the Faculty of arts, University of Dhaka, Part 1, Vol. 53, No. 1, pp. pp.77-92, June 1996.

(৪) ধর্ম, বিজ্ঞান ও ইসলাম: বাংলাদেশ দর্শন সমিতি পত্রিকা, দর্শন, ভলিউম-১৩, নং ১-২. জুন - ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়।

(৫) ইসলামে সুফি দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ভলিউম-৩, জানুয়ারি- মার্চ, ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়।

(৬) হাজী শরীয়াতুল্লাহ ও তাঁর ফরায়েজি দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ভলিউম-৩, অক্টোবর–ডিসেম্বর, ২০০০।

(৭) ভারতীয় ও সেমেটিক ধর্মে মরণোত্তর জীবন : একটি তুলনামূলক আলোচনা, দর্শন ও প্রগতি; বর্ষ ১৬, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৯, গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৮) The Methodology and Role of Hadith in Explaining the Holy Quran, Journal of the Asiatic society of Bangladesh, Humanities, Asiatic Society of Bangladesh" Vol. 45, No.1pp. pp 25-30, June 2000.

(৯)সূরা আল ফাতিহার দার্শনিক তাৎপর্য, দর্শন ও প্রগতি; ভলিউম: ১৫, সংখ্যা ১ ও ২, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৭, গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১০) নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা ও আমাদের দায়িত্ব, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রথম পুনর্মিলনী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, সেপ্টেম্বর, ২০০৫।

(১১)Scientific Methodology for the Authentication of Hadith Materials,The Dhaka University Studies, Journal of the Faculty of Arts, University of Dhaka, Part 1, Vol. 55, No. 2, pp. pp.107-127, Dcember 1998.

(১২) Al-Zamakhshari and his al-Kashashaf (Read out in the Departmental Research Forum on 10th August,1972)[৩৩]

[৩৩] অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেকের ব্যক্তিগত নথি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্কাইভ।

(১৩) Al-Tabari and his Jami`al-Bayan (Read out in the Departmental Research Forum)[৩৪]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ছাব্বিশ খণ্ডে প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পে অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক ২১টি নিবন্ধ রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে ৯টি অনূদিত এবং ১২টি মৌলিক রচনা। ইসলামী বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ৬টি অনূদিত ও ১২টি মৌলিক প্রবন্ধ। দ্বিতীয় খণ্ডে ১টি অনূদিত এবং চতুর্থ খণ্ডে ২টি অনূদিত নিবন্ধ স্থান পেয়েছে।[৩৫] তাঁর কয়েকটি অনূদিত নিবন্ধের শিরোনাম নিম্নরূপ:

আল আফতাস,[৩৬] আফলাহ বিন আবু আল কায়েস,[৩৭] আফলাহ মাওলা আল-নবী (সা), আফলাহ মাওলা উম্মু সালামা (রা.), আনিআরা আল-শায়বানী, আনামা আল-জুহাইনী,আওস ইবন জুবায়র,[৩৮] আনজাশা আল আসওয়াদ,[৩৯] আনাপা,[৪০] আনাস ইবন আওস,[৪১] আনাস ইবন আরকাম,[৪২] আনাস ইবন হারিছ,[৪৩] আনাস ইবন জুনাইম,আফসূস,[৪৪] আবদুল-ওয়াদ,[৪৫] মওলবী আবদুল করিম,[৪৬] ওয়াসওয়াসা,[৪৭] ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ,[৪৮] আব্দুস সামাদ ইবন আব্দিল্লাহ আল পালিম্বানি,[৪৯] আব্দুস সালাম ইবন মাশীশ[৫০] ইত্যাদি।

এম.ফিল ও পিএইচ.ডি তত্ত্বাবধান

গবেষণায় অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক (র)-এর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি ছাত্র জীবনেই ড. আলাউদ্দিন আল আযহারীর তত্ত্বাবধানে একটি গবেষণা প্রকল্পে কাজ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মজীবনে তিনি তাঁর প্রিয় শিক্ষক ড. মোহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমানের তত্ত্বাবধানে

---

৩৪ প্রাগুক্ত।

৩৫ প্রত্যয়ন পত্র, পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তারিখ: ২৯/১২/১৯৮৪।

৩৬ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪, খ. ১, পৃ. ৫৯৩।

৩৭ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬০৬-৬০৭।

৩৮ প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১০৭।

৩৯ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯৯।

৪০ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪৪।

৪১ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪৬-৫৪৭।

৪২ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪৭।

৪৩ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪৯।

৪৪ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬১২-৬১৩।

৪৫ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭৮-৬৮০।

৪৬ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮৮।

৪৭ প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫১৪-৫১৭।

৪৮ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৬, খ. ৪, পৃ. ১০৯-১১০।

৪৯ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৮।

৫০ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৯-৭০।

পিএইচ.ডি গবেষক হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও পারিবারিক নানা প্রতিকূলতার কারণে গবেষণাকর্মটি চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করতে পারেননি। নিজে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি তত্ত্বাবধান করতে তিনি বেশি আগ্রহী হতেন না। তবে কখনও কখনও গবেষণার বিষয় পছন্দনীয় হলে তিনি তত্ত্বাবধান করতেন। যে কারণে তাঁর এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষকের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। তাঁর তত্ত্বাবধানে তিনজন গবেষক পিএইচ.ডি ও চারজন এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

পবিত্র হজ্জব্রত পালন

অধাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক জীবনে একবার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি ২০০৫ সালে পবিত্র মক্কা মদীনা জিয়ারত ও হজ্জ পালন করেন। ১৬ জানুয়ারি ২০০৫ সালে হজ্জের সফর শুরু করেন এবং মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে হজ্জ পালন শেষে ১৫ ফেব্রুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

চারিত্রিক গুণাবলি

চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। জীবনে চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ, তার মনে গ্রোথিত মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও গুণাবলির আলোকেই সম্পাদিত হয়। মানব মনে যেসব গুণ জাগরিত হয় বাহ্যিক কাজকর্মে তারই প্রতিফলন ঘটে। চরিত্রবান লোককে সমাজের সবাই শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। চারিত্রিক গুণাবলির মাধ্যমেই মানুষ মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নেয়। মরে গিয়েও লাভ করেন অমরত্ব। একজন আদর্শ মানুষের মধ্যে যেসব চারিত্রিক গুণাবলি থাকা প্রয়োজন তার সমাহার ঘটেছিল অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক এর জীবনে। ভালো মন্দ নিয়েই মানুষ। কোন মানুষই মন্দের ঊর্ধ্বে নয়। তাই তাঁরও দোষ-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক এবং তা ছিলও। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁর চরিত্রের সুন্দর ও ভালো দিকই বেশি পরিস্ফুটিত হয়েছে।

বিনয় ও নম্রতা ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধানতম একটি দিক। তাঁর আচার-আচরণ, কথা-বার্তা ও কাজ-কর্মে সর্বদা বিনীতভাব ও নম্রতা প্রকাশ পেত। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা কর্মচারী কারো সাথে তিনি কর্কশভাষায় কথা বলতেন না। সকলকে তিনি আপনি বলে সম্বোধন করতেন। শিক্ষার্থীদের তিনি বলতেন, 'আপনারা হলেন জুনিয়র স্কলার। আপনারাও কিছুদিন পরে শিক্ষক হবেন।' কথা-বার্তা চলনে-বলনে তিনি এত বিনয়ী ছিলেন সকলে তাকে শ্রদ্ধা করতেন।

তিনি ছিলেন সততা ও দায়িত্বপরায়ণতার প্রতীক। নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতেন। কখনও দায়িত্বে অবহেলা করতেন না। নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করতেন। কখনও তিনি বিভাগের অফিস সহায়কের দ্বারা ব্যক্তিগত কাজ করাতেন না। তিনি কখনও পরীক্ষার উত্তরপত্র, প্রশ্নপত্র সম্বলিতখাম বা কোন চিঠি পত্রের খাম অফিস সহায়কের

দ্বারা সীলগালা করাতেন না। এগুলো তিনি নিজেই বাসা থেকে করে নিয়ে আসতেন। পরীক্ষার হলে তিনি সততা ও আমানতদারিতার সাথে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি পরীক্ষা শুরুর অনেক আগেই কেন্দ্রে হাজির হতেন। কখনও দেরি করতে না। কোনো কারণে কদাচিৎ যদি তাঁর আসতে দেরি হতো তাহলে তিনি সে সময়টুকুর পারিশ্রমিক বাদদিয়ে বিল করতেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গেলে কখনও তাকে প্রকৃত পথ খরচের বেশি দেয়া যেতনা। তাঁর ইন্তিকালের পর এক স্মরণসভায় অংশগ্রহণকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. এ এইচ এম ইয়াহইয়ার রহমান এ কথা প্রকাশ করেন।[৫১]

তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও নেক আমলদার ছিলেন। নীরবে নিভৃতে নেক আমল করতেন। অকাতরে দান সাদকা করার চেষ্টা করতেন। পেনশনের প্রাপ্ত অর্থ আর সারা জীবনের সঞ্চয়ের সিংহভাগ দিয়ে নিজ গ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের নামকরণ করেন বায়তুল আমান জামে মসজিদ। যদিও নিজের নামে নামকরণ করার জন্য সকলে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। তাঁর একান্ত কাছের কয়েকজন মানুষ ছাড়া একথা কেউ জানত না। সবসময় জামাআতের সাথে নামায আদায় করতেন। বৃদ্ধ বয়সেও পাঁচ তলা থেকে নেমে ছেলেকে সাথে নিয়ে মসজিদে জামাআতে শরিক হতেন।

আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিলেন। তাঁর সাথে যারাই কাজ করেছেন, তাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাব বুঝিয়ে দিতেন। অর্থের পরিমাণ যতই সামান্য হোক, তিনি তা পরিশোধ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। অন্যের হকের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত হুশিয়ার ও যত্নশীল ছিলেন। তিনি অনেক আগে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরি থেকে একটি দুষ্প্রাপ্য কিতাব ধার এনেছিলেন, কিন্তু কোন কারণে সেটি হারিয়ে যায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে বইটি খুঁজে পেয়ে সেটির একটি কপি করে নিজে রিকসা যোগে আলিয়া মাদ্রাসায় গিয়ে ফেরত দিয়ে আসেন।

অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যাওয়া, তাদের সেবা শুশ্রূষা করা, তাদের জন্য ফলফলাদি ও খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যাওয়া এবং তাদের খোঁজ খবর নেওয়া ছিল অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক এর চরিত্রের একটি মহান দিক। নবী করীম(সা) বলেন- যে ব্যক্তি সকালে কোন মুসলিম রোগীকে দেখতে যায়, সত্তর হাজার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকেন। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় কোন রোগীকে দেখতে যায় পরদিন সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার

---

[৫১] সোসাইটি ফর লার্নিং এন্ড এনালাইসিস কর্তৃক আয়োজিত "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক (র.) এর অনলাইন স্মরণসভা"- তে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এইচ এম ইয়াহইয়ার রহমানের বক্তব্য; তারিখ: ১৫ এপ্রিল, ২০২১, সময়: ২:০০-৪:০০ (https://www.facebook.com/watch/live/?v=1374638732888971&ref=watch_permalink)

ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকেন। আর ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের একটি বাগান দান করা হয়।[৫২] অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক এ দায়িত্বটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করতে সচেষ্ট ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী ও ছাত্র-শিক্ষক যে কারো অসুস্থতার কথা শুনলে তিনি তার কাছে ছুটে যেতেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, চিকিৎসার খোঁজ-খবর নিতেন এবং দু'আ করতেন। নিজের শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি একাজ করতেন।

মূলত একজন আদর্শ মানুষ ও আদর্শ শিক্ষকের মধ্যে যত ভালো গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তার প্রায় সবই অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক (র) এর মধ্যে ছিল। তবে তিনি সবসময় নীরবে নিভৃতে থাকতেই পছন্দ করতেন। কোন মানুষই ভুল ভ্রান্তি বা দোষের ঊর্ধ্বে নয়। মানুষ হিসেবে হয়তো তাঁর কোন চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। তবে সবকিছু ছাপিয়ে তিনি ছাত্রশিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সর্বমহলের মনের মণিকোঠায় একজন সজ্জন ও আদর্শ মানুষ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছিলেন, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ইন্তিকাল ও সমাহিতকরণ

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক সারা জীবন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করেছেন। তবে জ্ঞান অন্বেষণ, জ্ঞান বিতরণ, গবেষণা, পেশাগত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন ইত্যাদি কারণে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তিনি ৭/৪/২০২১ তারিখে জ্বরে আক্রান্ত হন। একদিন পরে তিনি কিছুটা শ্বাস কষ্ট অনুভব করেন। করোনা মহামারির মধ্যে তাঁর সন্তানেরা বাসায় ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু ৯ এপ্রিল শুক্রবার তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। তখন তাঁকে সকাল দশটায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং রাত দশটার সময় ৭৮ বছর বয়সে তিনি মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। এভাবেই ইসলামী জ্ঞান রাজ্যের এক মহান সাধকের চির বিদায় সূচিত হলো। পারিবারিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন ১০ এপ্রিল ২০২১ বাদ জোহর নিজ জন্মস্থান পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলার মাগুরা গ্রামে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বায়তুল আমান জামে মসজিদের পাশে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর নামাযে জানাযায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণসহ অসংখ্য মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন। ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত জামেয়া দ্বীনিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা মামুনুল হক তাঁর জানাযার ইমামতি করেন।

উপসংহার

---

[৫২] ইমাম আবু ঈসা আত তিরমিযী, *আস সুনান*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যাহ, বাব: মা জাআ ফি ইয়াদাতিল মারিদ, হাদীস নং ৯৬৯।

সত্যিই অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক ছিলেন একজন জ্ঞানতাপস,খ্যাতিমান তাফসিরকারক, অতুলনীয় বিনয়ী আচরণের আদর্শ শিক্ষক। তাঁর ইন্তিকালের ফলে বাংলাদেশের ইসলামী জ্ঞানচর্চার আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের অবসান হলো। কিন্তু তিনি সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীব্যাপি শিক্ষকতা জীবনে জ্ঞানের জগতে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, বিদ্বান ও আলোকিত মানুষ তৈরি করে যে প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছেন, যারা তাঁর জ্ঞানের উত্তরাধিকারী। তাদের মাধ্যমেই তিনি পৃথিবীতে মানুষের মনে চিরজাগরূক হয়ে থাকবেন। আর কবরে শুয়ে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে নেকী হাসিল করবেন। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের সকলের প্রত্যাশা মহান আল্লাহ যেন অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক (র.)-এর সকল ইলমীখিদমত কবুল করেন এবং তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদের আন্তর্ভুক্ত করে নেন। আমীন!

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৬১ বর্ষ ১ম সংখ্যা
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.

الإمام البوصيرى ودوره فى شعر المديح النبوى (ﷺ)

Al-Imam Al-Busiri Wa Daurohu Fi Shiril Madih Al-Nababi (SM)

الأستاذ د. محمد يونس*

[Abstract: Imam Sharafuddin al-Busiri (608-698 AD) was a famous Egyptian Sufi saint, linguist, poet, muhaddith and skilled scribe. He has depicted various contemporary events and various aspects of his personal life in his poems. Apart from this, he composed several Qashidahs in praise of the Holy Prophet (SM). Al-Kawaqib al-Durriyyah fi Madhi Khair al-Bariyyah (The Bright Star- Garland in Praise of the Greatest Man) published in praise of the Holy Prophet (SM) is the most famous work of Qasidai Imam al-Bushiri. After composing it, his fame spread worldwide. Translations of this book have been published in English, French, German, Turkish, Persian, Urdu and Bengali languages. Many commentators have written commentaries on this verse in different languages. So far the number of its commentaries is about one hundred. It is believed that no other human-written book has been written so many commentaries except Al-Burdah. Apart from Burdah, he also composed another Qasidah "Al-Qasidatul Hamaziyyah" with the ending 'Hamza' in praise of the Holy Prophet (SM). Apart from that, the 206-line poem "Zukhrul Ma'ad Fi Wazne Banat Su'ad" composed in the rhythm of the poem called "Banat Su'ad" written by the poet Ka'b Ibn Zuhair (R.A.) is one of his works. Apart from these, he composed two other Qasidahs named “Al Qasidah al Mudariyyah fi Madhi Khair al-Baria” with the ending “lam” and “Al Makhraj wa al Mardud ala al-Nasara wa al-Yahud” with the ending “la”. Al-Qasidah al-Madhiyyah or his eulogy of the Holy Prophet (SM) is an expression of genuine love, compassion and religious sentiment towards him. This study aims at explore the glorious and excellent character of the holy prophet (SM) to make readers attractive and lover to the holy prophet (SM) The combination of analytical, descriptive and library based methods of research has been applied in the study.]

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آل بيته الأطهار، وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فقد عرفت مصر التصوف قديما، وكان المديح النبوي مقترنا بشعر التصوف من قديم، منذ عهد شاعر الرسول[1] حسان بن ثابت (ت ٦٧٤م) وكعب بن مالك (ت ٦٧٠م) وعبد الله بن رواحة (ت ٦٢٩م) وكعب بن زهير (ت ٦٥٩م) والنابغة الجعدي (ت ٦٨٥م)- رضي الله عنهم- وما زال الشعراء المصريون — يتغنون بمديح الرسول – ﷺ- وأكبر مادح مصري للرسول- ﷺ – هو "البوصيري"، فله أشعار يصور فيها بعض ميوله الصوفية وسؤاله الرسول الشفاعة له يوم القيامة، فأردت في هذه المقالة المحاضرة أن أبحث فن المديح النبوي عند البوصيري تحت عنوان **"الإمام البوصيري ودوره ف شعر المديح النبوي"** سائلا المولى- سبحانه- أن ينتفع بهذا المقال كلُّ من قرأه، إنه نعم المولى ونعم النصير، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

التعريف بـ "الإمام البوصيري"

الإمام البوصيري هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله بن صنهاج بن ملاك، ولقبه: شرف الدين، وكنيته: أبو عبد الله ، ولد ف قرية "دلاص" بمحافظة بني سويف ف صعيد مصر ف أول شوال ٦٠٨هـ[2].

تلقى العلم منذ نعومة أظفاره؛ فحفظ القرآن في طفولته، ثم انتقل إلى القاهرة؛ فأخذ علوم الشريعة واللغة على عدد من عاما ء عصره، كان من أشهرهم: أبو الحسن الشاذلي وأبو العباس المرسي، ويبدو أن ميوله الأدبية اتضحت فيه مبكرة وتفتحت ف نفسه ملكاته الشعرية، فكان من عجائب الدهر في النظم والنثر ، وقد أظله عهد الدولة الأيوبية، وعاش أيام الملك العادل، وقد عاصر البوصيري مجموعة من الشعراء منهم: البهاء زهير (٥٨١ -٦٥٦هـ) وعمر بن الفارض (٥٧٦- ٦٣٢هـ) وغيرهم ممن كانت تموج بهم مصر والشام.[3]

وفاته

---

١. "شاعر الرسول" - وفي لسان الموسوعة الإسلامية الإنجليزية:
"Hassan bin Thabit traditionally known as the poet of prophet is more Correctly the most prominent of Several poets" - Brill`s E.J., Encyclopedia of Islam, London: 1979, p. 27.

٢. وقد رجح الدكتور "شوقي ضيف" أنه ولد سنة ٦٠٨هـ، وتوفي سنة 698هـ، وهو الصحيح عندي- عصر الدول والإمارات مصر، مرجع سابق، ص361.

٣. د. ماهر حسن فهمى، شوقي شعره الإسلامي (القاهرة: دار المعارف بمصر، ١٩٥٩م)، ص٢٨؛ عصر الدول والإمارات مصر، مرجع سابق، ص٢٧١- ٢٨٦؛ ٣٥٧-٣٦٧.

تُوفِّي الإمام البوصيري بالإسكندرية سنة ٦٩٥هـ عن عمر بلغ ٨٧ عامًا، وله قبر مشهور يزار في الإسكندرية. [4] وله ديوان مطبوع. يصورفيه بعض ما كان يدور في عصره، وبعض ما كان بحياته الخاصة.[5]

دور البوصيري في شعر المديح النبوي

ترك البوصيري آثارا شعرية جليلة، ومن أشهر هذه الآثار قصائده المدحية، ومن أهمها:

١-"الكواكب الدرية في مدح خير البرية " المعروفة بـ " القصيدة البردة". ولقد قام كثير من العلماء بشرحها وترجمتها إلى كثير من اللغات، [6] حتى البنغالية، ولكن الحق يقال: إن الشاعر دائما يبالغ فى مدحة للحبيب، وهو أمر ليس فيه شيء.

٢- القصيد "المرية في مدح خير البرية"، واستهلها بقوله:

محمد أشرف الأعراب والعجم * محمد خير من يمشي على قدم
محمد باسط المعروف جامعة * محمد صاحب الإحسان والكرم[7]

وآخرها:

محمد قائم الله ذو همم * محمد خاتم للرسل كلهم[8]

٣- ذخر المعاد في وزن "بانت سعاد".

وكان شعراء المديح النبوي من قبله قد عكفوا على لامية كعب بن زهير في مديح الرسول عليه السلام يحاكونها ويعارضونها وسموها "بانت سعاد" باسم عبارة في مطلعها التي أولها:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول * متيم إثرها لم يفد مكبول[9]

طمحت نفس البوصيري إلى المعارضة فنظم قصيدة طويلة في نحو مائتى بيت على وزنها وقافيتها وسماها" ذخر المعاد في وزن بانت سعاد"، فكانت أطول من قصيدة كعب بن زهير[10] وفيها يقول:

إلى متى وأنت باللذات مشغول؟ ** وأنت عن كل ما قدمت مسؤول
في كل يومٍ تُرجِّي أن تتوب غداً ** وعقد عزمك بالتسويف محلول [11]

---

٤. زكي مبارك الموازنة بين الشعراء (بيروت: منشورات المكتبة الفكرية ط ٢، ١٩٣٦م)، ص١٤٦.
٥. د. طه وادى، شعر شوقي الغنائي المسرحي (القاهرة : دار المعارف ، ط ٣ ، ١٩٨٥م)، ص٤٦.
٦. قصيدة البردة، ترجمها بالشعر البنغالي: محمد فضل الرحمن (داكا: رياض بروكاشني، ٢٠٠١م)، ص٩.
٧. مهمد بن صالح الحثيمين- القول المفيد على كتاب التوحيد، ت- سليمان بن عبد الله بن حمود (الرياض: دار العاصمة، ط١، ١٤١٥ ه)، ص١٢٣
٨. ديوان البوصيري، مرجع سابق، ص٢٤٧- ٢٤٨
٩. ديوان كعب بن زهير، قرأه الدكتور محمد يوسف نجم (بيروت: دار صادر، ط ٢، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م) ص٨٤.
١٠. د. شوقي ضيف، فصول في الشعر ونقده (القاهرة: دار المعارف، ط ٢، ١٩٧١م) ص٢٣٧.
١١. ديوان البوصيري، مرجع سابق، ص ١٩٥.

٤- **"المخرج والمردود على النصارى واليهود"** وهي لامية في الرد على النصارى واليهود، نظمها ليحث الشباب على قتال الصليبيين، وتدل على تعمقه ف دراسة التوراة والإنجيل، ومطلعها:

جاء المسيح من الإله رسولا * فأبى أقل العالمين عقولا

قوم رأوا بشرا كريما فادعوا * من جهلهم لله فيه حلولا[12]

٥- "القصيدة **الهمزية"** في مدح النبي - ﷺ- وقد سماها "أم القرى في مدح خير الورى" وفيها فصّل الشاعر ولادة الرسول ومعجزاته وغزواته، ألهب حماس الشباب المحاربين ضد الصليبيين، وافتتحها ببيان الحقيقة المحمدية، وأن الرسول سر الوجود الذي يفيض على الكون وعلى الأنبياء من قديم، وهي في نحو ٤٥٠ بيتا، وهي لا تقل فصاحة عن بردته الشهيرة، ومطلعها:

كيف ترقـى رُقيَّك الأنبيـاءُ * يا سماء مـا طاولتـها سمــاءُ؟

لم يساووك في عُلاك وقد * حال سني منك دونهم وسناءُ [13]

سبب إنشاده لـ"البردة"

ويقول الإمام البوصيري عن سبب إنشادها ": كنت قد نظمت قصائد فى مدح رسول الله- ﷺ - ثم اتفق بعد ذلك أنه أصابني فالج أبطل نصفي، ففكرت في عمل قصيد تى هذه "البردة"، فعملتها واستشفعت بها إلى الله- عز وجل - فى أن يعافينى، وكررت إنشادها، وبكيت ودعوت وتوسلت به ونمت، فرأيت النبى - ﷺ - فمسح على وجهي بيده الكريمة، وألقى على بردة ، فانتبهت ووجدت فى نهضة، فخرجت من بيتى ولم أكن أعلمت بذلك أحداً فلقينى بعض الفقراء [14] فقال لى: "أريد أن تعطينى القصيدة التى مدحت بها رسول الله - ﷺ-"، فقلت:" أيها؟" فقال:" التى أنشأتها فى مرضك،" وذكر أولها وقال: "والله لقد سمعناها البارحة وهى تنشد بين يدى رسول الله- ﷺ- ورأيته - ﷺ – يتمايل وأعجبته، وألقى على من أنشدها بردة ، ومن ثَم سميت البردة "[15]

تعريف المدح لغة واصطلاحا

قال ابن منظور في معجمة المعروف لسان العرب: "المَدْح نقيض الهجاءِ، وهو حُسْنُ الثناءِ، يقال: مَدَحْتُه مِدْحَةً واحدة ومَدَحَه يَمْدَحُه مَدْحاً ومِدْحَةً.[16]

---

١٢. ديوان البوصيري، مرجع سابق، ص١٥٨.

١٣. ديوان البوصيري، مرجع سابق، ص35.

١٤. اسمه" الشيخ "أبو رجاء"، صديق الإمام البوصيري - قصيدة البردة، ترجمها بالشعرالبنغالي الدكتور محمد فضل الرحمن (داكا: رياض بروكاشني،٢٠٠١م)، ص٩.

١٥. الوافي بالوفيات، مرجع سابق، ج 1، ص ٣٤٤.

١٦. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط (القاهرة: مؤسسة الرسالة، ط٨ ،١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م) ١/ ٢٣٤.

وفي الاصطلاح هو تعداد لجميل المزايا، ووصف للشمائل الكريمة، وإظهار للتقدير العظيم الذي يكنه الشاعر لمن توافرت فيهم تلك المزايا [17]. والمدح من الأغراض الشعرية الأساسة التي تناولتها القصيدة العربية.

نبذة تاريخية موجزة عن شعر المديح

والمدائح النبوية من فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فه لون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع؛ لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص،[18] ولا نعرف بالضبط متى وكيف نشأت المدائح النبوية في الشعر العربي، ويوجد بعض القطعات المدحية في كتب السيرة النبوية قبل عهد النبوة. [19] ومن أقدم ما مدح به الرسول- ﷺ- قصيدة الشاعر الجاهلي الشهير " الأعشى الكبير" [20] التي يقول في مطلعها:

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا * وعادك ما عاد السّليم المسهّدا[21]

وآخرها:

فآليتت لا أرثي لها من كلالة * ولا من حفى حتى تزور محمدا

نبي يرى ما لا ترون وذكره * أغار لعمري في البلاد وأنجدا[22]

ومنذ العهد النبوي، فقد كان لشاعر الرسول حسان بن ثابت الأنصاري (ت ٦٧٤م) وكعب بن مالك الخزرجي الأنصاري (ت ٦٧٠م) وعبد الله بن رواحة الخزرجي الأنصاري (ت ٦٢٩م) وكعب بن زهير (ت ٦٥٩م) والنابغة الجعدي (ت ٦٨٥م)- رضي الله عنهم- اليد الطولى في هذا الغرض، [23] والشعراء الآخرون يمدحون الرسول - ﷺ- والصحابة الكرام الذين ليس لهم المواهب الشعرية وهم ينظمون القطعات المدحية في بعض الأوقات العاطفية في غاية الحب للنبي- ﷺ- وأخذت هذه المدائح تتكاثر منذ القرن الرابع الهجري.[24] وأخذ هذا المديح يزدهر في الحروب الصليبية، وأكبر مادح مصري للرسول البوصيري، فشهرته جاءت من قبيل قصائده في مدح الرسول، وهذه المدائح

---

١٧. جبور عبد النور، المعجم الأدبي (بيروت: دار العلم للملايين، ط ٢-١٩٨٤م)، ص ٢٤٥.

١٨. زكي مبارك، المدائح النبوية في الأدب العربي (القاهرة: دار الكتاب العربي، ط ١، ١٩٣٥م)، ص١٧.

١٩. محمد يونس، المديح النبوي في شعر شوقي، (البنجالة) مجلة كلية الآداب لجامعة شيتاغونغ، مج ١٧، ٢٠٠١م، ص٢٢٩-٢٣٠.

٢٠. أحمد الهاشمي بك، جواهر الأدب، ج٢، (مصر: ١٩٣٧م)، ص ٩٠؛ المدائح النبوية في الأدب العربي، مرجع سابق، ص١٩.

٢١. شرح ديوان الأعشى الكبير، قدّم له/ د: حنا نصر الحتي (بيروت: دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م)، ص١٠٠.

٢٢. شرح ديوان الأعشى الكبير، المرجع السابق، ص١٠٢.

٢٣. أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب، شرح: علي فور (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٦-١٩٨٦م)، ص٤٥-٥٤.

٢٤. عصر الدول والإمارات مصر، مرجع سابق، ص٣٥١-٣٥٢.

ذاعت شهرتها ف الآفاق، وتميزت بروحها العذبة وعاطفتها الصادقة، وروعة معانيها، وجمال تصويرها، ودقة ألفاظها، وحسن سبكها، وبراعة نظمها؛ فكانت بحق مدرسة لشعراء المدائح النبوية من بعده، ومثالا يحتذيه الشعراء لينسجوا على منواله، ويسيروا على نهجه؛ فظهرت قصائد عديدة ف فن المدائح النبوية، أمتعت عقل ووجدان ملايين المسلمين على مرّ العصور، ولكنها كانت دائمًا تشهد بريادة الإمام البوصيري وأستاذيته لهذا الفن بلا منازع، وقدعُني البوصيري بقراءة السيرة النبوية، ومعرفة دقائق أخبار نبي الإسلام وجامع سيرته، وأفرغ طاقته وأوقف شعره وفنه على مدح الرسول، وكان من ثمار مدائحه النبوية (بائياته الثلاث) التي بدأ إحداها بلمحات تفيض عذوبة ورقة استهلها بقوله:

وافاكَ بالذنب العظيم المذنبُ * خجلا يُعنفُ نفسَه ويُؤنِّبُ
لو لا يشوب دموعه بدمائه * ذوشيبة عوراتها ما تخضب[25]

ويستهل الثانية بقوله:

بمدح المصطفى تحيا القلوبُ * وتُغتفرُ الخطايا والذنوبُ
وأرجو أن أعيش به سعيدا * وألقاه وليس عل حوب[26]

أما الثالثة- وه أجودها جميعًا- فيبدؤها بقوله:

أزمعوا البين وشدوا الركابا * فاطلب الصبر وخلِّ العتابا
ودنا التوديع ممن وددنا * أنهم داموا لدينا غضابا[27]

وله – أيضا- عدد آخر من المدائح النبوية الجيدة، من أروعها قصيدته "الحائية"، التي يقول فيها - مناجيا الله عز وجل:

يا من خزائن جوده مملوءة * كرمًا وبابُ عطائه مفتوح
ندعوك عن فقر إليك وحاجة * ومجال فضلك للعفاة فسيح
فاصفحْ عن العبد المسيء تكرُّمًا * إن الكريم عن المسيء صفوح[28]

وقصيدته "الدالية" التي يبدؤها بقوله:

إلهي على كل الأمور لك الحمد * فليس لما أوليتَ من نعمٍ حدُّ
لك الأمر من قبل الزمان وبعده * وما لك قبل كالزمان ولا بعدُ
وحكمُك ماضٍ في الخلائق نافذ * إذا شئتَ أمرًا ليس من كونه بُدُّ[29]

والهمزة الت بدأها بقوله:

كيف ترقى رُقيَك الأنبياءُ * يا سماءً ما طاولتْها سماءُ

---

٢٥. ديوان البوصيري، مرجع سابق، ص٧٤.
٢٦. ديوان البوصيري، مرجع سابق، ص٦٨،
٢٧. ديوان البوصيري، مرجع سابق، ص٦٣.
٢٨. ديوان البوصيري، مرجع سابق، ص٩٠.
٢٩. ديوان البوصيري، مرجع سابق، ص٩٧.

لم يساووك في علاك وقد حا * ل سنا منك دونهم وسناء[30]

والتي قال عنها ابن حجر الهيتمي- رحمه الله تعالى- "وإن أبلغ ما مُدح به النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من النظم الرائق البديع، وأحسن ما كشف عن شمائله من الوزن الفائق المنيع، وأجمع ما حوته قصيدةٌ من مآثره وخصائصه ومعجزاته، وأفصح ما أشارت إليه منظومة من بدائع كمالاته، ما صاغه صوغ التبر الأحمر ونظمه نظم الدر والجوهو، الشيخُ الإمام العارف الهمام الكامل المفنن المحقق، والبليغ الأديب المدقق، إمام الشعراء وأشهر العلماء، وبليغ الفصحاء، وأفصح البلغاء الحكماء، الشيخ شرف الدين البوصيري.[31]

بردة البوصيري

وتُعد قصيدته الشهيرة "الكواكب الدرية في مدح خير البرية"- والمعروفة باسم "القصيدة البردة" – فهي من القصائد الطوال ومن عيون الشعر العربي، ومن أروع قصائد المدائح النبوية، ودرة ديوان شعر المديح في الإسلام، الذي جادت به قرائح الشعراء عبر العصور، ومطلعها من أبرع مطالع القصائد العربية، يقول فيها:

أَمِنْ تذكّر جيرانٍ بذي سلم * مزجتَ دمعًا جرى من مقلـة بـدم؟
أم هبت الريحُ من تلقاء كاظمةٍ * وأومضَ البرقُ في الظلماء من إضَم؟
فما لعينيك إن قلت اكففا همتا؟ * وما لقلبك إن قلت استفـق يهم؟[32]

وهي قصيدة طويلة تقع في ١٨٢ بيتا، عشرة منها ف المطلع اى فى النسيب الروحى الذي ظاهره الغزل الإنساني العادي، و ١٦ فى النفس وهواها، و ٣٠ فى مدح الرسول، و١٩ فى مولده، و ١٠ فى دعائه،و ١٠ فى مدح القرآن، و ٣ فى المعراج، و ٢٢ فى جهاده، و١٤ فى الاستغفار، وباقى القصيدة فى المناجاة،[33] يقول فى نهايتها:

يا نفسُ لا تقنطي من زلةٍ عظُمتْ * إن الكبائرَ فى الغفران كاللمَم[34]

ويعد أشهر بيت في هذه القصيدة هو:

فمبلغ العلم فيه أنه بشر * وأنه خيرخلق الله كلهم[35]

وقد ظلت تلك القصيدة مصدر إلهام للشعراء على مر العصور، وقد اتخذ شعراء المدائح النبوية نموذجا يحذون حذوها وينهجون نهجها وينسجون على منوالها من المدائح

---

٣٠. ديوان البوصيري، مرجع سابق، ص ٣٥.
٣١. شهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر، المنح المكية، ت- أحمد جاسم المحمد القاهرة: المطبعة الأميرية، ط ٣، ١٤٣٢هـ/٢٠٠١م)، ص٢٥.
٣٢. ديوان البوصيري، مرجع سابق، ص ٢١٢.
٣٣. جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج٣ (بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٦٧م)، ص١٢٧.
٣٤. ديوان البوصيري، مرجع سابق، ص٢٢١.
٣٥. ديوان البوصيري، مرجع سابق، ص٢١٥.

النبوية،[36] وجدير بالذكر أن جميع المدائح النبوية التي قيلت بعد البوصيري على الوزن والقافية كان أصحابها مسوقين بالروح البوصيرية، ولم يمض عصر إلا وللبردة فيه طراز،[37] وأشهر من عارضوها أخيرا محمود سامي البارودي الذى سمى قصيدته " كشف الغمة في مدح سيد الأمة" وعدد أبيات هذه القصيدة ٤٧٧، ومطلعها :

يا رائد البرق يمّم دارة العلم * وأحد الغمامَ إلى حىّ بذي سلم[38]

وعارضها أيضا أمير الشعراء فى العصر الحديث أحمد شوقى بك فى قصيدته "نهج البردة " وقد نظمها فى سنة ١٣٢٧هـ التى قال فى أولها :

ريم على القاع بين البان والعلم * أحلّ سفك دمى في الأشهر الحرم[39]

شاعرية البوصيرى ومميزات شعره

نظم البوصيرى الشعر منذ حداثة سنه، وله قصائد كثيرة، ونستطيع تقسيم شعره إلى قسمين: شعره الاجتماعى، في المديح والهجاء وشكوى الحال. والثانى: شعره في مديح الرسول. والأول بسيط فى معانيه وأسلوبه، قريب إلى روح العامة لغة وتعبيرا، وقد جارى فيه شعراء زمانه، حتى في استعمال بعض الألفاظ المولدة والأهاجي المقذعة، والثانى: قوى رصين ويميل فيه إلى تقليد القدماء في تعبيراتهم وصورهم المشتقة من حياة البداوة، وتكثر فيه أسماء بقاع الجزيرة التي تداول ذكرها شعراء الحجاز وشعراء المدائح النبوية،[40] وجميع القصائد من القسم الثاني تدور في الفلك الشعر الإسلامى... فى السيرة النبوية، وآل بيت النبوة والصحابة رضوان الله عليهم، وفي منازل الوحى... مكة المكرمة ومقدساتها، ومدينة الطيبة وآثارها، وفي عظمة الإسلام وأركانه، وفي الثناء على الله - عز وجلّ- وإجلاله، خاصة في مدح النبي وتبجيله، وفي التضرع بالدعاء إلى الله- سبحانه وتعالى- لنفسه ولأهله وللمسلمين والمسلمات بالسلامة والاستقامة في الدنيا، والفوز في الأخرة.

واشتهر الإمام البوصيري باستعمال البديع في مدائحه، كما برع في استخدام البيان، ولكن غلبت عليه المحسنات البديعية في غير تكلف؛ وهو ما أكسب شعره ومدائحه قوة ورصانة وشاعرية متميزة لم تتوفر لكثير ممن خاضوا غمار المدائح النبوية والشعر الصوفي، وتعد قصيدته "البردة" من أعظم مدائحه بعد قصيدة "كعب بن زهير" الشهيرة

---

٣٦. د. جودت الركابي، الأدب العربى من الانحدار إلى الازدهار (معر: دار المعارف،: ١٩٨٩م)، ص١٨٣.

٣٧. المدائح النبوية في الأدب العربي، مرجع سابق، ص٢٠٣-٢٠٤.

٣٨. سامي البارودي، كشف الغمة في مدح سيد الأمة (مصر: مطبعة الجريدة، ١٣٢٧هـ)، ص٣.

٣٩. ديوان أحمد شوقي، الشوقيات، شرحه وضبطه "علي العسيلي" ج ١ (بيروت: مؤسسة الأعلمي، ١٩٩٨م)، ص١٦٢.

٤٠. د. جودت الركابي، مرجع سابق، ص ١٧٥-١٧٦.

"بانت سعاد". وإن الإخلاص هو الذى مكن البوصيرى من ناصية المجد الأدبى، وهو الذى رفعه إلى منزلة الخلود، وساد سلطانه بين العوام والخواص.

الخاتمة

بعد العرض السابق لحياة البوصيرى ودوره فى شعر المديح النبوى يتبين لنا أن قصائد البوصيرى كانت عالية الجودة، وكان أكبر مادح للنبي- ﷺ- وأحد أقطاب الصوفية فى العالم الإسلامى، مال منذ صغره إلى الزهد والتصوف، واتجه في مدائحه النبوية إلى الثناء على الرسول- ﷺ- واتخذ من هذه المدائح وسيلة لشفاعة النبى- ﷺ- فهو يرى أن الرسول سر الوجود، ونوره الذي يفيض على الكون وعلى الأنبياء من قديم. فرحم الله الإمام شرف الدين البوصيرى رحمة واسعة على ما ترك للمكتبة العربية والإسلامية من آثار أدبية جليلة، انتفع بها طلاب العلم ومحبوا الأدب العربي فى كل العصور.

ইসলামিকফাউণ্ডেশনপত্রিকা
৬১ বর্ষ ১ম সংখ্যা
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.

عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم:حياته ومساهمته فىالحديث

الدكتور أ. م. قاضى محمدهارون الرشيد*

[Abstract: Hazrat Abdullah Ibn Masood (RA) was one of the famous companions of Prophet (PBUH). He is one of the learned scholars and was one of those who migrated from Makkah to Abyssinia then Madina. He was one of those who have got two aiblas. He was the first person to recite the Qur'an aloud in Makkah and completed the memorization of the Qur'an during the lifetime of the Prophet (PBUH). He served as the judge and in the finance department of the city of Kufa during the reign of HazratUmar (RA). He was famous as a depositor since Jahili era. His role in spreading the preaching of Islam is undeniable. He was well versed in numerous scriptures including Tafseer, Fiqh and Hadith. That is why he is more known to everyone as a famous Faqih and Mufassir. He narrated about 848 hadiths from Nabi Karim (PBUH). The number of hadiths narrated by him in MuttafaqunAlaihi (in Bukhari and Muslim) is 64. Prophet (PBUH) testified about his deep faith and fear of God. Moreover, he is one of the famous four companions of Prophet (PBUH) from whom the Prophet (PBUH) instructed to learn the Qur'an. The Prophet (PBUH) was more interested in listening to his recitation of the Qur'an. He was one of the Companions who witnessed the Battle of Badr. Finally, he passed away in 32 Hijri at the age of about 60 years.]

Keywords: characteristics, contribution, Islamic Fiqh,Hadith.

[الخلاصة: إن أصحاب النبي ص هداة مهتدون أشداء على الكفار رحماء بينهم وكلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وعددهم يبلغ مئة ألف وأربعة عشر ألفا ومنهم عبد الله بن مسعود وهو الصحابي الجليل وهو حافظ القرآن ومسلم سادس في مكة وهاجر إلى المدينة هو من أجود الناس ثوبا وريحا ويكنى عبد الرحمن ولم يكذب بعد الإسلام ويسكن باب النبي صـ حتى يظن بعض أنه من أهل بيته وكان قارئ القرآن يتعلم منه الناس تلاوة القرآن كما يعلم الناس الفقه والحديث وهو أول من أفشى القرآن بمكة من في رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويعظ الناس في كل أسبوع مرة بعد وفاة النبي صـ وشارك ابن مسعود ف الفتح الإسلامي للشام، وشهد فيها معركة اليرموك،وتولى يومها قسمة الغنائم ويقال إنه

*প্রফেসর, আরবীবিভাগ, চট্টগ্রামবিশ্ববিদ্যালয়,চট্টগ্রাম।

زرع الفقه الحنفي وهو مؤسس مدرسة الكوفة في الفقه وقد كان لهذه المدرسة قيمة فقهيّة كبيرة وشهرة رائعة وكذلك ساهم ف الحديث وأسند نيفا وثلاث مئة وأصح أسانيد عبد الله بن مسعود: سفيان بن سعيد الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود ومن تلاميذه ومن حدثه الأسود بْن يزيد، وعلقمة بْن قيس، وزيد بْن وهب، والحارث بْن قيس، وأبو وائل شقيق بْن

سلمة، وزر بْن حبيش، وعبد الرَّحْمَن بْن يزيد، وأبو معمر عَبْدالله بْن سخبرة، وأبو عمرو الشيباني، وأبو الأحوص الجشمي، وغيرهم ومات سنة إثنتين وثلاثين للهجر]ة.

التقديم

يبلغ عدد أصحاب رسول الله حولمائة وأربعة عشر ألف صحاب، ومن أشهرهم عبد الله بن مسعود رضـ الذي أسلم سادسا وهو يأتي باب النبي صـ كثرة حتى يظن بعض أنه من أهل البيت، وكان خادما للنبي صـ وإن عُمَر بْن الخطاب بعث عمار بْن ياسر في زمانه على صلاة أهل الكوفة؛ وبعث عَبْد اللهِ بْن مسعود على بيت المال والقضاء والفتيا ولما وجه عُمَر بن مسعود على الكوفة قال: "إني وجهتك معلما ليس لك سوط ولا عصا، فاقتصر على كتاب الله فإنه كفاك وإياهم، ولا تقبل الهدية وليست بحرام، ولكن أخاف عليك القال".

وكان أحد حفاظ القرآن وقراءه ويكنى أبا عبد الرحمن وأمه أم عبد وقد تقدم إسلام عَبْد الله بمكة قبل دخول النبي ﷺ دار الأرقم وهاجر إلى الحبشة الهجرتين وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا والمشاهد كلها وكان صاحب رسول الله ﷺ ووساده وسواكه ونعليه وطهوره فالسفر، وكان يشبه بالنب ﷺ فهديه ودله وسمته، وكان من أجود الناس ثوبا، ومن أطيب الناس ريحا فإذا خرج من بيته عرف جيران الطريق أنه مر، من طيب رائحته وكان يحب الإكثار من التطيب وول قضاء الكوفة وبيت المال لعمررضي الله عنهوصدرا من خلافة عثمانرض الله عنهثم صار إلى المدينة وهو من أكابر الصحابة فضلا وعقلا. ومن السابقين إلى الإسلام، ومن العبادلة وهم عند الفقهاء ثلاثة أ عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعند المحدثين كذلك غير أن عندهم عبد الله بن الزبير بدل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.

تعارفه

هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة. واسم مدركة عمرو بن إلياس بن مضر، وحالف مسعود بن غافل عبد بن الحارث بن زهرة فالجاهلية، وأم عبد الله بن مسعود أم عبد بنت عبد ود بن سواء بن قريم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل، وأمها هند بنت عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب. [1]

كنيته

---

১. ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي (المتوفى: ٢٣٠هـ)، *الطبقات الكبرى* (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م)، ج٣، ص١١١.

ويكنى عبد الله بن مسعود أبا عبد الرحمن وقد لقبه النبي صـ ويقال أيضا ابن أم عبد.[2]

ولادته ونشأته

ولد أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قبل النبوة بثمانية عشر سنة ونشأ في مكة، حيث استقر بها أبوه مسعود بن غافل قبل الإسلام.

صفاته

وله صفات حميدة مشهورة بين الصحابة بعضها كما يل:

١. «كان عبد الله من أَجود النّاس ثوبا أَبيض، ومن أَطيب النّاس ريحا»[3]
٢. كان آدم له ضفيرتان، عليه مسحة أهل البادية، دقيق الساقين.[4]
٣. وكان صادقا لم يكذب بعد الإسلام إلا مرة كما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما كذبت منذ أسلمت إلا كذبة واحدة. قيل: وما ه يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كنت أرحل لرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمر برجل من الطائف ليرحل له فقال الرجل: من كان يرحل لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم؟ فقيل: ابن أم عبد. قال: فأتاني فقال: أ الراحلة كان أحب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟ فقلت: الطائفية المنكبة. قال: فرحل بها لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فركب بها وكانت من أبغض الراحلة إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: من رحل هذه؟ فقالوا: الرجل الطائف. فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مروان ابن أم عبد فليرحل لنا، فردت الراحلة إل.[5]

ملاقاته مع النبي ﷺ وسبب إسلامه

قد بين سبب إسلامه بنفسه عن ابن مسعود، قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمرّ ب رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وأَبو بكر، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ قال: قلت: نعم، ولكنّي مؤتمن، قال: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ فأَتيته بشاة، فمسح ضرعها، فنزل لبن، فحلبه ف إناء، فشرب، وسقى أبا بكر، ثمّ قال للضّرع: اقْلصْ فقلص، قال: ثمّ أَتيته بعد هَذَا، فقلْت: يا رسول الله، علّمني من هذا القول، قال: فمسح رأْسي، وقال: يرحمك اللَّه، فإِنَّك غليم معلَّم.[6] وبعد هذه الواقعة أسلم.

---

٢. ابن سعد، المرجع السابق، ج٣، ص١١١.
٣. الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، *المعجم الكبير* (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية)، رقم الحديث: ٩١٧٦.
٤. ابن عساكر، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ)، *مختصر تاريخ دمشق* (سوريا: دار الفكر للطباعة والتوزيع، ١٤٠٢هـ ١٩٨٤م)، ج١٤، ص٤٥.
٥. ابن عساكر، المرجع السابق، ج١٤، ص٥٠.
٦. أحمد بن حنبل أسد الشيباني، *مسند أحمد بن حنبل* (بيروت: عالم الكتب، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م)، رقم الحديث: ٣٥٩٨.

قربه مع النبي ﷺ

كان عبد الله يلبس رسول الله ﷺ نعليه ثم يمش أمامه بالعصا حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه العصا فاذا أراد رسول الله ﷺ أن يقوم ألبسه نعليه ثم مشى بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة قبل رسول الله ﷺ.[7]

وكان يوقظ رسول الله ﷺ إذا نام ويستره إذا اغتسل ويمشي معه في الأرض وحشا.[8]

كان يخدم كما تخدم أمه كما روي عن عبد الله بن مسعود قال: كانت أم تكون مع نساء النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم بالليل، وكنت ألزمه بالنهار.[9]

وكان يلاصق مجلس النب صـ وبعض الكفار لا يحب ذلك فشكوا إلى النب صـ لطرده فنزلت الآية كئ لا يطرده كما رو عن سعد بن أب وقاص قال: كنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ونحن ستة نفر، فقال المشركون: اطرد هؤلاء عنك فلا يجترئون علينا. فكنت أنا وعبد الله بن مسعود ورجل من هذيل ورجلان قد نسيت اسمهما، فوقع ف نفس النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ما شاء الله، وحدث به نفسه، فأنزل الله تعالى: "وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي" "الآية" وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْا أَهؤُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ".[10]

نسبته إلى أمه

قد مات أبوه في الجاهلية وأسلمت أمه فلذا ينسب إلى أمه أحيانا وكانت أمه تكنى أم عبد كما جاء ف الحديث روى البخار: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْنَا حُذَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَرِيبِ السَّمْتِ وَالهَدْيِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَأْخُذَ عَنْهُ، فَقَالَ: «مَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ»[11]

بعد وفاة النبي محمد ﷺ

بعد وفاة النب صـ شارك ابن مسعود في الفتح الإسلامي للشام، وشهد فيها معركة اليرموك، وتولى يومها قسمة الغنائم واختار عبد الله بن مسعود بعد انتهاء الفتح الإقامة في حمص، إلى أن أمره الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بالانتقال إلى الكوفة، ليعلّم أهلها أمور دينهم، وليعاون أميرها الجديد عمار بن ياسر، وكتب عمر إلى أهل الكوفة، فقال إني قد بعثت عمار بن ياسر أميرا، وعبد الله بن مسعود معلما، ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله ﷺ من أهل بدر، فاقتدوا بهما، وأطيعوا واسمعوا قولهما، وقد

---

৭. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧هـ) *صفة الصفوة* (بيروت: دار المعرفة، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م)، ج1، ص٣٩٧.

৮. جمال الدين أبو الفرج، المرجع السابق، ج ١، ص٣٩٧.

৯. ابن عساكر، المرجع السابق، ج ١٤، ص٤٩.

১০. ابن عساكر، المرجع السابق، ج ١٤، ص٤٧.

১১. البخاري، المرجع السابق، رقم الحديث: ٣٧٦٢.

آثرتكم بعبد الله على نفسي .«وقد بق عبد الله بن مسعود بالكوفة مدة خلافة عمر، وبداية خلافة عثمان بن عفان، إلى أن عزله عثمان، وبعث إليه يأمره بالعودة إلى المدينة.
واجتمع أهل الكوفة، وقالوا لعبد الله » :أقم، ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه « فقال عبد الله» :إن له عل حق الطاعة، وإنها ستكون أمور وفتن، فلا أحب أن أكون أول من فتحها، وردّ الناس، وخرج إلى المدينة، وسكن فيها حتى أن مات سنة اثنتين وثلاثين.[12]

ثناء الناس عليه

وقد أثنى عليه كثير من النقباء والفضلاء وبعض ذلك فيما يل:

١. عن أب البختر قال سئلزعل رضـ عن أصحاب محمد ﷺ فقال عن أيهم تسألون قالوا أخبرنا عن عبد الله ابن مسعود قال علم القرآن وعلم السنة ثم انتهى وكفى به علما.[13]
٢. روى البخاري: قال هزيل بن شرحبيل، قال: سئل أَبو موسى عن بنت وابنة ابن وأُخت، فقال: للبنت النّصف، وللأُخت النّصف، وأْت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أب موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «للابنة النّصف، ولابنة ابن السّدس تكملة الثُّلثين، وما بقي فللأُخت» فأَتينا أَبا موسى فأَخبرناه بقول ابن مسعود، فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ.[14]
٣. روى ابن أبي شيبة: عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى أَشْبَهِ النَّاسِ هَدْيًا وَدَلاًّ وَسَمْتًا وَأَبْطَنِهِمْ بِعَبْدِ اللهِ، فَلَمْ نَدْرِ مَنْ هُوَ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى عَلْقَمَةَ.[15]
٤. قال معاذ بن جبل حين حضره الموت وأوصى أصحابه: التمسوا العلم عند أربعة: عند ابن أم عبد. كان أحد الثمانية الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. وكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة. وهو أول من أفشى القرآن بمكة من في رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان يوقظ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا نام، ويستره إذا اغتسل، ويرحل له إذا سافر، ويماشيه في الأرض الوحشاء. أحد النفر الذين دار عليهم علم القضاء والأحكام من الصحابة.[16]

---

١٢. https://ar.wikipedia.org/wiki
١٣. جمال الدين أبو الفرج، المرجع السابق، ج ١، ص٤٠١.
١٤. البخاري، محمد بن إسماعيل، *الجامع الصحيح* (القاهرة: دار الشعب، ١٤٠٧ – ١٩٨٧م)، رقم الحديث: ٦٧٣٦.
١٥. ابن أبي شيبة، أبو بكر العبسي الكوفي (١٥٩ ـ ٢٣٥ هـ)، *مصنف ابن أبي شيبة*(د.ت)، رقم الحديث: ٣٦٠٤٥.
١٦. ابن عساكر، المرجع السابق، ج ١٤، ص٥٤.

٥. عن عليّ، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ، لَاسْتَخْلَفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ».[17]

تلاميذه

ومن تلاميذه ومن حدثه الأسود بْن يزيد، وعلقمة بْن قيس، وزيد بْن وهب، والحارث بْن قيس، وأبو وائل شقيق بْن سلمة، وزر بْن حبيش، وعبد الرَّحْمَن بْن يزيد، وأبو معمر عَبْد الله بْن سخبرة، وأبو عمرو الشيباني، وأبو الأحوص الجشمي، وغيرهم.[18]

وروى عنه القراءة: أبو عبد الرحمن السلمي وعبيد بن نضيلة وطائفة.[19]

فضل عبد الله بن مسعود

قد ورد نصوص كثيرة في فضائل ابن مسعود وذلك فيما يلي:

١. روى البخاري عن مسروق، ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبّه، سمعت النّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَة مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ»[20]

٢. عن القاسم بن عبد الرّحمن، قال: كان أَوّل منْ أفشى القرْآن بمكة من في رسول الله ﷺ ابن مسعود، وأوّل من بنى مسجدا صلّي فيه عمّار بن ياسر وأوّل من أذَّن بلال، وأَوّل من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن مالك، وأَوّل من قتل من المسلمين مهجع، وأوّل من عدا به فرسه في سبيل الله المقداد، وأَوّل حيّ أدّوا الصّدقة من قبل أنفسهم بنو عذرة، وأول حيّ أَلّفوا مع رسول الله ﷺ جهينة.[21]

بعض عاداته

وله عادات متميزة عن غيره وقد وردت بها نصوص وذلك فيما يلي:

١. روى عبد الرزاق: أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، «يَعُسُّ الْمَسْجِدَ فَلَا يَدَعُ سَوَادًا إِلَّا أَخْرَجَهُ إِلَّا رَجُلًا مُصَلِّيًا».[22]

٢. روى عبد الرزاق: عن عبد الرّحمن بن يزيد قال: كان عبد الله «يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ».[23]

---

١٧. ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: ٢٧٣هـ)، *سنن ابن ماجه* (بيروت: دار إحياء الكتب العربية، د.ت)، رقم الحديث: ١٣٧.

١٨. أبو بكر البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب (المتوفى: ٤٦٣هـ)، *تاريخ بغداد* (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م)، ج ١، ص٤٨٢.

١٩. شمس الدين الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز (المتوفى: ٧٤٨هـ)، *سير أعلام النبلاء* (القاهرة: دار الحديث١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م)، ج ٣، ص٢٨١.

٢٠. البخاري، المرجع السابق، رقم الحديث:٤٩٩٩.

٢١. ابن أبي شيبة، المرجع السابق، رقم الحديث: ٣٦٩٣٣.

٢٢. عبد الرزاق، المرجع السابق، رقم الحديث: ١٦٥٤.

٢٣. عبد الرزاق، المرجع السابق، رقم الحديث: ٢١٦٠.

٣. روى عبد الرزاق: عن علقمة قال: سَأَلْتُهُ وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَتَى كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُوتِرُ؟ قَالَ: «كَانَ يُوتِرُ حِينَ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ مِثْلُ مَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ حِينَ صَلَّى الْمَغْرِبَ» قَال: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ أَهْلُ الدَّارِ مِنَ اللَّيْلِ.[24]

٤. روى عبد الرزاق: عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا.[25]

٥. روى عبد الرزاق: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُقِلُّ الصِّيَامَ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ تُقِلُّ الصِّيَامَ قَالَ: «إِنِّي إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَنِ الصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ».[26]

٦. عن أبي المليحِ الهذليّ قال: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَسْتُرُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ وَيُوقِظُهُ إِذَا نَامَ وَيَمْشِي مَعَهُ فِي الأَرْضِ وَحْشًا.[27]

٧. عن القاسم قَال: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُلْبِسُ النَّبِيَّ ﷺ نَعْلَيْهِ وَيَمْشِي أَمَامَهُ.[28]

٨. عن علقمة قال: كان عَبْدُ اللهِ يُشَبَّهُ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي هَدْيِهِ وَدَلِّهِ وَسَمْتِهِ.[29]

٩. عن شقيق أَبي وائل، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّرُنَا كُلَّ يَوْمِ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نُحِبُّ حَدِيثَكَ وَنَشْتَهِيهِ، وَلَوَدِدْنَا أَنَّكَ حَدَّثْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ، كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا»[30]

١٠. عن إبراهيم قال: كان عَبْدُ اللهِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ في شيْءٍ مِن الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الِافْتِتَاحِ" وقد روي مثل ذَلِك أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.[31]

وفاته

مات عبد الله بن مسعود بالمدينة ودفن بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين.[32]

---

٢٤. عبد الرزاق، المرجع السابق، رقم الحديث: ٤٦٢٧.
٢٥. عبد الرزاق، المرجع السابق، رقم الحديث: ٥٥٢٥.
٢٦. عبد الرزاق، المرجع السابق، رقم الحديث: ٧٩٠٣.
٢٧. ابن أبي شيبة، المرجع السابق، رقم الحديث: ٣٢٨٩٠.
٢٨. ابن أبي شيبة، المرجع السابق، رقم الحديث: ٣٢٨٩٢.
٢٩. ابن أبي شيبة، المرجع السابق، رقم الحديث: ٣٢٩٠٦.
٣٠. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)، *المسند الصحيح* (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، رقم الحديث: ٢٨٢١.
٣١. الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري (المتوفى: ٣٢١هـ)، *شرح معاني الآثار* (مصر: عالم الكتب - ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م)، رقم الحديث: ١٣٦٣.
٣٢. ابن سعد، المرجع السابق، ج ٣، ص١١٨.

قَالَ مُحَمَّد بْن عُمَر: وسمعت من يقول: صلى عليه عمار بْن ياسر، وَقَال قائل: صلى عليه عثمان بْن عفان، وهو أثبت عندنا.[33]

مساهمته في الفقه

قال ابن عابدين الشامي: العلوم ثلاثة: علم نضج وما احترق، وهو علم النحو والأصول. وعلم لا نضج ولا احترق، وهو علم البيان والتفسير، وعلم نضج واحترق، وهو علم الحديث والفقه. وقد قالوا: الفقه زرعه عبد الله بن مسعودرضي الله عنه، وسقاه علقمة، وحصده إبراهيم النخعي، وداسه حماد.[34]

وقد نظمه بعضهم فقال:

الفقه زرع ابن مسعود، وعلقمةٌ ... حَصَّاده، ثم إبراهيم دَوَّاسُ
نعمان طاحنه، يعقوب عاجنه ... محمد خابز، والآكلُ الناسُ.[35]

وأكثر الصحابة كانوا من المحدثين لأنهم رأوا الحديث ولو واحدا لكن الحظ في الفقه ما كان لكل فمن ساهم في الفقه على رأسهم عبد الله بن مسعود وعن الشعبي قال ذكروا أن عمر بن الخطاب لقي ركبا في سفر له فيهم عبد الله بن مسعود فأمر عمر رجلا يناديهم من أين القوم فأجابه عبد الله أقبلنا من الفج العميق فقال عمر أين تريدون فقال عبد الله البيت العتيق فقال عمر إن فيهم عالما وأمر رجلا فنادهم أي القرآن أعظم فأجابه عبد الله "الله لا إله إلا هو الحي القيوم" حتى ختم الآية قال نادهم أي القرآن أحكم فقال ابن مسعود "إن الله يأمر بالعدل والإحسان" الآية فقال عمر نادهم أي القرآن أجمع فقال ابن مسعود "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" فقال عمر نادهم أي القرآن أخوف فقال ابن مسعود "ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به" الآية فقال عمر نادهم أي القرآن أرجى فقال ابن مسعود "يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله" فقال عمر نادهم أفيكم ابن مسعود قالوا اللهم. نعم.[36]

وعن مسروق قال شاممت أصحاب محمد ﷺ فوجدت علمهم انتهى إلى ستة نفر منهم عمر وعلي وعبد الله وأبي بن كعب وأبو الدرداء وزيد بن ثابت ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى رجلينعلي وعبد الله.[37]

وعن علي قال: أول من قرأ آية من كتاب الله عن ظهر قلبه عبد الله بن مسعود.[38]

---

٣٣. أبو بكر البغدادي، المرجع السابق، ج ١، ص٤٨٦.
٣٤. ابن عابدين الشامي، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ)، *رد المحتار على الدر المختار* (بيروت: دار الفكر، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م)، ج ١، ص٤٩.
٣٥. علاء الدين الحصكفي الحنفي، محمد بن علي بن محمد الحِصْني (المتوفى: ١٠٨٨هـ)، *الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار* (الناشر: دار الكتب العلمية، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م)، ص١٢.
٣٦. جمال الدين، المرجع السابق، ج ١، ص٤٠١.
٣٧. جمال الدين، المرجع السابق، ج ١، ص٤٠٣.

مؤسس مدرسة الكوفة في الفقه

وفي النّصف الثّاني من القرن الهجريّ الأوّل كانت تقوم بالعراق مدرسة أخرى مركزها الكوفة تناهض مدرسة المدينة وتحاول جاهدة في إفساح الطّريق أمام مبادئها، وقد كان لهذه المدرسة قيمة فقهيّة كبيرة وشهرة رائعة حصلت عليها بفضل جهود فقهائها الّذين عملوا مخلصين في إرساء قواعدها، وكافحوا في سبيل إعلاء منارتها، وإن كانت لم تصل إلى مركز مدرسة المدينة وشهرتها، بل ولم تتبوّأ مركزها الممتاز إلا في القرن الثّاني الهجريّ بفضل جهود تلامذتها، وعلى الأخصّ في عصر أبي حنيفة النّعمان وأصحابه وتلامذته. ومؤسّس هذه المدرسة من الصّحابة هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذليّ من السّابقين إلى الإسلام، وممّن شهدوا بدرا، وأحد المبشّرين بالجنّة، أقرب الناس سمتا ودلّا وهديا برسول الله صلّى الله عليه وسلم كما قال حذيفة، ابن مسعود معلّم أهل الكوفة وقاضيها، ومؤسّس طريقتها، كان ينحو منحى عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه وعلى منحاه كان يسير من الاعتداد بالرّأي حيث لا نصّ من كتاب أو سنّة وهو الّذي يقول: لو سلك النّاس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه، وكان لا يخالفه إلا في القليل النّادر، وكان ذلك القليل النّادر أقرب إلى القبول عند هذه المدرسة مما اجتمع عليه هو وعمر رضي الله عنه.

وعن الأعمش عن إبراهيم النّخعي أنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله إذا اجتمعا، فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعجب إليه، لأنه ألطف، وقرأ القرآن فأحلّ حلاله وحرم حرامه، فقيه في الدين عالم بالسّنة، ولي بيت المال بالكوفة لعمر وعثمان رضي الله عنه وقدم آخر عمره المدينة ومات بها في خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه سنة ٣٢هـ.[39]

تلاميذ هذه المدرسة

وأشهر تلاميذ هذه المدرسة من أصحاب عبد الله بن مسعود الّذين أخذوا أقواله وتثقّفوا بآرائه هم هؤلاء الفقهاء السّتة: علقمة بن قيس النّخعي، والأسود بن يزيد النّخعي، ومسروق ابن الأجدع الهمدانيّ، وعبيدة بن عمرو السّلماني، وشريح بن الحارث القاضي، والحارث الأعور.[40]

أصول مدرسة الكوفة

عند أهل الكوفة أن عبد الله بن مسعود وأصحابه أثبت النّاس في الفقه، ولهم تحقيق أعلى في الفقه، وكانت قلوبهم أميل شيء إلى أصحابهم كما قال علقمة لمسروق: هل أحد منهم أثبت

---

٣٨. ابن عساكر، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ)، *مختصر تاريخ دمشق* (سوريا: دار الفكر للطباعة والتوزيع، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٤م)، ج١٤، ص٤٧.

٣٩. ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد (المتوفى: ٨٥٢هـ)، *الإصابة في تمييز الصحابة* (بيروت: دار الكتب العلمية،١٤١٥هـ)، ج ١، ص٥٨.

٤٠. ابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج ١، ص٥٨.

من عبد الله؟ وقال أبو حنيفة: إبراهيم أفقه من سالم، ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من ابن عمر، وعبد الله هو عبد الله، وقد جمعوا من فتاوى ابن مسعود وقضايا علي وفتاواه وكل ما تيسّر لهم جمعه، وصنعوا في آثار أصحابهم كما صنع أهل المدينة، وخرجوا كما خرج هؤلاء ولم يكن عندهم من الأحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على الأصول التي اختارها أهل الحديث، ولم تنشرح صدورهم للنّظر في أقوال علماء البلدان وجمعها، وكان عندهم من الفطانة والحدس وسرعة انتقال الذّهن من شيء إلى شيء ممّا يقدرون به على تخريج جواب المسائل على أقوال أصحابهم وكلّ ميسّر، لما خلق له و«كلّ حزب بما لديهم فرحون، فمهدوا الفقه على قاعدة التخريج.[41]

قال أبو محمد الطيب: كان ابن مسعود كثير الولوج على النبي صلّى الله عليه وسلم والخدمة له، وكان من كبار الصحابة وساداتهم وفقهائهم ومقدمهم في القرآن والفقه والفتوى، ومن أصحاب الحلق، والأصحاب والأتباع في العلم، أقرب الناس سمتا وهديا برسول الله صلّى الله عليه وسلم.[42]

قال أبو يوسف: أصحاب عبد الله بن مسعود، فهم الذين يُفتون الناس ويعلمونهم ويفتونهم: علقمة بن قيس النخعي، والأسود بن يزيد النخعي، ومسروق بن الأجدع الهمداني، وعَبيدة السلماني، والحارث بن قيس الجعفي، وعَمرو بن شرحبيل الهمداني.[43]

قال أبو بكر الرازي: الذي لا يشك فيه أحد من أهل العلم: أن أبا هريرة ليس في رتبة عبد الله بن مسعود: في الفقه، والدراية، والإتقان، وقرب المحل من النبي عليه السلام.[44]

أقوال ابن مسعود في الفقه:

أظهر العلماء آراءهم حول فقه ابن مسعود كما تلي:

١. قال أبو بكر الرازي: كان عبد الله بن مسعود يقول: «الْمُتَّقُونَ سَادَةٌ وَالْفُقَهَاءُ قَادَةٌ وَمُجَالَسَتُهُمْ زِيَادَةٌ»[45]

٢. عن أبي وائل قال: سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام، قال: أنصت فإن في الصلاة شغلا ويكفيك الإمام.[46]

مساهمته في الحديث

---

٤١. ابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج ١، ص٥٩.

٤٢. أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي بامخرمة، الهجراني الحضرمي الشافعي (٨٧٠ - ٩٤٧ هـ)، *قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر* (جدة: دار المنهاج، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٨م)، ج ١، ص٢٩٤.

٤٣. أبو يوسف، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي (المتوفى: ٢٧٧هـ)، *المعرفة والتاريخ* (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠١هـ- ١٩٨١م)، ج ٢، ص٥٢٢.

٤٤. أبو بكر الرازي، أحمد بن علي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠هـ)، *الفصول في الأصول* (الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م)، ج ٣، ص١٣٣.

٤٥. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٤٦٣هـ)، *الفقيه والمتفقه* (السعودية: دار ابن الجوزي، ١٤٢١هـ)، ج ١، ص١٤٢.

٤٦. ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (المتوفى: ٨٦١هـ)، *فتح القدير* (الناشر: دار الفكر)، ج ١، ص٣٤٠.

وقد اتفقا له البخاري ومسلم في صحيحيهما على ٦٤ حديثا، وانفرد له البخاري بإخراج ٢١ حديثا، ومسلم بإخراج 35 حديثا، وأحصى له بقي بن مخلد في مسنده بالمكرر ٨٤٠ حديثا، وله ٨٤٨ حديثا بإحصاء النووي، وقد عدّ يحيى بن معين أصح الأسانيد عن ابن مسعود ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، كما روى له الجماعة، فكان محدثا كما كان فقيها فأسند عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نيفاً وثلاث مئة حديث.[47]

واتفقا له في "الصحيحين" على أربعة وستين وانفرد له البخاري بإخراج أحد وعشرين حديثا. ومسلم بإخراج خمسة وثلاثين حديثا وله مرويات بالمكرر ثماني مئة وأربعون حديثا.[48]

وقد قال عمرو بن ميمون: "جالست عبد الله بن مسعود فما سمعته يروي عن رسول الله ﷺ شيئا، إلا مرة واحدة، فإنه قال سمعت النبي ﷺ ثم اعتراه السهو والعرق ثم قال: أو نحو هذا، أو قريبا من هذا، أو كما قال رسول الله ﷺ فكان مثله في محله من العلم: يتهيب الرواية عن رسول الله ﷺ، فمن لا يدانيه ولا يقاربه في الضبط والإتقان أولى بذلك.

ولا يخفى على ذي معرفة: أن رواية أبي هريرة ليست مثل رواية ابن مسعود: في التثبت، والإتقان، وسكون النفس إليها.[49]

قال ابن البيع: وأصح أسانيد عبد الله بن مسعود: سفيان بن سعيد الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود.[50]

قال زيد بن وهب: كنت جالسا عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منه؛ فأكب عليه، وكلمه بشيء، ثم انصرف، فقال عمر: كنيف مليء علما. وقال عبد الله بن بريدة في قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا} قال: هو عبد الله بن مسعود.

وقال عقبة بن عمرو: ما أرى أحدا أعلم بما أنزل الله على محمد ﷺ من عبد الله؛ فقال أبو موسى: إن تقل ذلك، فإنه كان يسمع حين لا نسمع، ويدخل حين لا ندخل.[51]

---

٤٧. ابن عساكر، المرجع السابق، ج ١٤، ص٤٦.
٤٨. شمس الدين الذهبي المرجع السابق، ج ٣، ص٢٨١.
٤٩. أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، المرجع السابق، ج ٣، ص١٣٢.
٥٠. ابن البيع، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري (المتوفى: ٤٠٥هـ)، *معرفة علوم الحديث* (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م)، ص٥٥.
٥١. مناع بن خليل القطان (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، *تاريخ التشريع الإسلامي* (الناشر: مكتبة وهبة، الطبعة: الخامسة ١٤٤٢هـ-٢٠٠١م)، ص٢٥٠.

روى الطبراني عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذا الموت قال: التمسوا العلم عند أربعة رهط: عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنه عاشر عشرة»[52]

بعض مروياته

وقال الزركلي عدد أحاديثه ٨٤٨ حديثا وجمع أحاديثه في مصحف ابن مسعود.[53] وبعض ذلك فيما يلي:

١. روى ابن أبي شيبة: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ.[54]

٢. روى ابن أبي شيبة: عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ.[55]

٣. روى ابن أبي شيبة: عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ الْحَصَى.[56]

٤. عن أبي الأحوص، قال: كان عبد الله، يقول: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ، فَمَنْ دَخَلَ فِيهِ، فَهُوَ آمِنٌ»[57]

٥. عن رباح النّخعيّ، قال: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُنَا كُلَّ خَمِيسٍ فَيَقُولُ: «إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّكُمْ مَجْمُوعُونَ بِصَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنْفُذُكُمُ الْبَصَرُ وَيُسْمِعُكُمُ الدَّاعِي، أَلَا وَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ»[58]

٦. عن عبد الرّحمن بن الأسود، قال: «كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَإِذَا قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ»[59]

---

٥٢. الطبراني، المعجم الكبير، رقم الحديث: ٢٢٩.

٥٣. الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي (المتوفى: ١٣٩٦هـ)، *الأعلام* (الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر- أيار/ مايو ٢٠٠٢م)، ج ٤، ص١٣٧.

٥٤. ابن أبي شيبة، المرجع السابق، رقم الحديث: ٧٧٠٥.

٥٥. ابن أبي شيبة، المرجع السابق، رقم الحديث: ٧٩٥٣.

٥٦. ابن أبي شيبة، المرجع السابق، رقم الحديث: ٣٠٠٥٠.

٥٧. صحيح الدارمي، الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي السمرقندي (المتوفى: ٢٥٥هـ)، *سنن الدارمي* (دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ١٤١٢ هـ - ٢٠٠٠ م)، رقم الحديث: ٣٣٦٥.

٥٨. روى الطبراني، المعجم الكبير، المرجع السابق، رقم الحديث: ٨٥٣١.

٥٩. الطبراني، المعجم الكبير، المرجع السابق، رقم الحديث: ٩٤٣٠.

٧. عن أَبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أَنّه قال: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِمَامٌ مُضِلٌّ يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ رَجُلٌ مُصَوِّرٌ، يُصَوِّرُ هَذِهِ التَّمَاثِيلَ»[60]

٩. عن عبد الله بن مسعود، قال: مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاثًا غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ.[61]

١٠. البخاري: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْهَدُوا».[62]

قال عبد الله بن مسعود، سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أعطي أربعا لم يحرم أربعا، من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة؛ لأن الله عز وجل يقول {ادعوني أستجب لكم} [غافر: ٦٠]، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة لأن الله يقول: {لئن شكرتم لأزيدنكم} [إبراهيم: ٧]، ومن أعطي الاستغفار لا يحرم المغفرة، لأن الله عز وجل يقول: {استغفروا ربكم إنه كان غفارا} [نوح: ١٠] ومن أعطي التوبة لم يحرم التقبل لأن الله يقول: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده} [الشورى: ٢٥]".[63]

نقل ابن مسعود صفات النبي ﷺ بالأحاديث

صلاة الصيف: عن الأسود، أن عبد الله بن مسعود قال: «كانت قدر صلاة رسول الله ﷺ في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام»[64]

القنوت في الصلاة: عن عبد الله رضي الله عنه، قال: كنا نسلم على النبي ﷺ وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، وقال: «إن في الصلاة شغلا» حدثنا ابن نمير، حدثنا إسحاق بن منصور السلولي، حدثنا هريم بن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي ﷺ نحوه.[65]

نصائحه بالحديث الموقوف

قد نصح ابن مسعود كثيرا للأمة وبعض ذلك فيما يلي:

---

٦٠. معمر، معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن (المتوفى: ١٥٣هـ)، *الجامع* (بيروت: المجلس العلمي بباكستان، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ هـ)، رقم الحديث: ١٩٤٨٧.

٦١. ابن أبي شيبة، المرجع السابق، رقم الحديث: ٣٠٠٦٣.

٦٢. ابن أبي شيبة، المرجع السابق، رقم الحديث: ٣٦٣٦.

٦٣. البيهقي، شعب الإيمان، المرجع السابق، رقم الحديث: ٤٢١٠.

٦٤. أبو داؤد، المرجع السابق، رقم الحديث: ٤٠٠.

٦٥. البخاري، المرجع السابق، رقم الحديث: ١١٩٩.

١. قال أبو عمر القرطبي: قال عبد الله بن مسعود أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل.[66]
٢. قال عبد الله بن مسعود: «الصلوات كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر». [67]
٣. قال عبد الله بن مسعود: «تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة صباحة بدر، أو إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين».[68]
٤. قال عبد الله بن مسعود: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد أحببت أن يكون لي فيه زوجة»[69]
٥. قال عبد الله بن مسعود: إنما هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن، ولا تشغلوها بغيره.[70]
٦. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع، والتعمق، والبدع، وعليكم بالعتيق».[71]
٧. قال عبد الله بن مسعود: «من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها؛ فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع».[72]
٨. قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟ فصلى، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة.[73]
٩. قال عبد الله بن مسعود: «نعم المجلس المجلس الذي تنتشر فيه الحكمة» [74]

الختام

كان عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين شهد بدرا وهاجر الهجرتين وكان يوم اليرموك على النفل ومناقبه غزيرة روى علما كثيرا. أتم «عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه حفظ القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أفقه الصحابة وأجل المحدثين.

---

٦٦. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ)، *الاستذكار*(بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢١ – ٢٠٠٠م)، ج ٨، ص٥٦٩.
٦٧. عبد الرزاق، المرجع السابق، رقم الحديث: ١٤٧.
٦٨. عبد الرزاق، المرجع السابق، رقم الحديث: ٧٦٩٧.
٦٩. عبد الرزاق، المرجع السابق، رقم الحديث: ١٠٣٨٢.
٧٠. ابن أبي شيبة، المرجع السابق، رقم الحديث: ٣٥٦٧٣.
٧١. الدارمي، المرجع السابق، رقم الحديث: ١٤٤.
٧٢. ابن ماجة، المرجع السابق، رقم الحديث: ١٤٧٤.
٧٣. الترمذي، المرجع السابق، رقم الحديث: ٢٥٧.
٧٤. الطبراني، المعجم الكبير، رقم الحديث: ٨٩٢٥.

ইসলামিকফাউন্ডেশনজার্নাল
৬১ বর্ষ ১ম- ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.

Islamic Law and Its Application in Bangladesh: An Analysis

Dr. Mohammad Kamruzzaman*

Abstract

Islamic law is universal and it covers all branches of law, such as civil, criminal, constitutional and commercial, which are common for all people. Islamic law as regards supremacy of Allah and His prophet dominates. It is a divine law and as such, it is not amendable, specially, those which are framed by the holy Quran and the Hadith. Islamic law consists of moral, ethical and social code. It guides a man towards good, away from evil. So, it is a guidance both for spiritual and temporal. Islamic law, as enforced in Bangladesh, is the combination of divine as well as state legislation. It also analysis the rights and obligations of human beings, which are primarily derived from the Quran and Sunna. The aim of this paper is to know Islamic law and to ventilate distinctive character of Islamic law, which is altogether different form other man-made laws. It also aims at removal of misconceptions of the western people about Islamic law. Furthermore, it is to draw the attention of all concerned, specially, the legislatures who are responsible for framing the Islamic law in Bangladesh.

Keywords: Islamic Law, Manmade Modern Law, Application, Reformation, Case Law.

1. Introduction

The importance of the study of Islamic law can be estimatedfrom the fact that it is applicable to in Pakistan (in 2011 census) and 152 million in Bangladesh (according to a research in 2019) some 172 million (in 2011) Muslims in India and 195 million Muslims in some twenty countries of Asia, Africa and Europe are expected to follow Islamic law. In other words, one-sixth of the total word populations are expected to follow

*Dr. Mohammad Kamruzzaman
Additional Superintendent of Police (Training), Traffic and Driving School, Dhaka.

Islam.[1]Islam is regarded, as stated, as the complete code of life and, therefore, it has the comprehensive laws to govern the legal rights and obligations of the citizens. Solution to all problems which a man has to encounter from cradle to grave has been prescribed. All aspects of human life are covered in

Islam. It suggests ways and means for all political, social, economic and other problems which the people encounter in their day-to-day life. Islam also prescribes solutions to all problems, personal or international, private or public in nature. Islam received its perfection with the advent of the last prophet Muhammad (peace be upon him). In this respect, the Quran states, "Today I have perfected your religion for you and completed my favor toward you, and chosen Islam as your religion".[2] The Prophet applied Islamic law in the state founded by him as its head. He established rule of law against 'might is right' that made it the welfare state. In fact, he was sent to establish the supremacy of Islam over all other man-made laws. In this respect the Quranic declaration is as follow, "He it is who has sent His Messenger with the guidance and the Religion of Truth that may cause it to prevail over all religion".[3]In that Islamic state, where no discrimination was found among the citizens in the eye of law. In fact, the prophet was sent to this earth to establish Islamic way of life. Therefore, those who follow the prophet, virtually follow Allah. The aim of this article is to know about Islam, Islamic law, characteristic of Islamic law, which is altogether different from other man-made laws. It also aims at distinguishing between Islamic law and other laws. Finally, I will discuss implementation of Islamic law and their reformation in Bangladesh.

2. Origin of Islamic Law

For a proper study of Islamic law, it is necessary to have some knowledge of the origin of Islam. Arabia, where Islam was born, was a desert. The land was mostly barren and full of sands. The climate was very hot with burning Sun in the day and cold nights. Occasional wind storms raised clouds of dust from one end to another, where found, there used to

[1] Syed Khalid Rashid's Muslim Law, Six Edition (2016) at p.1.
[2] Al-Quran. Al Mayida 5:3 The first digit refers to no of sura and the second digit refers to no of Ayat.
[3] Al-Quran, At-Towbah 9:33 Al-Fatho 48: 28; As Shawf 61:9.

be no trace of water or vegetation. Only palm and date trees or some herbs of the desert could be seen at distant places. According to AtharHussain, "In a dark period of history when nothing but ruin, squalor and desolation remained of what were once great civilizations, when oppression, exploitation and the right of might prevailed, when human rights had ceased to be recognized, when superstitious and hedonic cults were followed at many places and man was still terrified of the forces of nature and gave a very low place to himself in the scheme of creation, was bornMohammad, the Prophet of Islam, on Monday the 12th RabiulAwal (corresponding to the 29thAugust 570A.D.)inthe desert country of Arabia.[4]In this situation Prophet Mohammad preached the religion of Islam.

3. Definition of Islamic Law

The law according to the Muslim faith and as interpreted from the Quran: (Related Terms: Sharia Law, Muslim Law, Fiqh, Theocracy, Muslim, Law and Sunnah.) The law according to the Muslim faith and as interpreted from the Quran, also known as Sharia law. Islamic law, a divine law sent by Allah to Prophet Mohammad (PHH). It consists of the expressed injunctions of the Quran, Sunnah and the opinions of jurist. Islamic law cannot be changed on personal whim or desire. As regards supremacy and sovereignty of this law is the Quran and Sunnah. According toAsaf A.A.Fyzee, "Islamic law is not a systematic code like the enactments, which are passed by the modern parliament, but a living and growing Organism.[5] Islamic law is universal and it covers all branches of law, such as, civil, criminal constitutional and commercial, which are common for all people. The law also includes the laws relating to marriage, dower, dissolution of marriage, paternity, guardianship, maintenance, gifts, will, waqf, inheritances etc. are applicable to the Muslim as their personal law. The sprit of this law is that Muslim must believe in Allah and His Messenger and strive hard with their wealth and lives for the cause of Allah.[6] Islamic law is a continuous process of

[4]AtharHussain, The Prophet of Islam (Hamdard National Foundation, Delhi) at, p.1.
[5]AsafA.A.Fyzee. Outlines of Muhammadem law, Oxford University Press, Delhi p.1(1993).
[6]Al-Quran, Sura Al-Huzrat 49 and Ayat 15.

development till now, in term of ijma and Qiyas or in other words by ijtihad.

The term 'Islamic law' is more appropriate than 'Muslim law', because Islam is basically founded on the divine book Al-Quran and Hadith, the sunnah of the prophet. All the prophets were entrusted with the duty to implement the commands of Allah. In this respect the following Quranic version is to be considered, "….. Legislation is not but for Allah……..[7]So,Quran is the continuation and completion of all previous holy Books.

Islamic law is both the direct and indirect expression of the divine will of Allah. It controls Muslim society and acts as the guidance of an Islamic state. Islamic law is based on Islamic teaching. Islam lays importance on morality, which helps to create a congenial atmosphereare in the society. Islamic law is that which is applicable in all fields of human life, namely personal, national, international life and so on. On the other hand, in Bangladesh and in some Muslim countries concern parliament or any dictator promulgated laws derived from the Quran and sunnah with some amendments. There laws were taken under the supremacy of parliament and is also, subject to the disapproval of the parliament or of the dictator. To understand the difference with the 'Islamic law' we mentioned this type of law as 'Muslim Law' on basis of their authorities.

4. Characteristics of Islamic Law

Islamic law is based on Quran and Hadith, Ijma (agreed opinion) and analogical deduction (Qiyas). According to Islamic points of view there are two different conceptions of law. One law is divine and other is that law which is man-made such as all the modern legislation. According to Aziz Ahmed, "Islamic law is a communication from Allah with reference to men's conscious actions expressive either of demand or indifference or a mere declaration of its nature on His part."[8]Characteristics and main features of Islamic law are as follows:

(i) Cover all aspects of human life: The most important feature of Islamic law is it covering all aspects of human life. Islamic law is that

[7]Al-Quran, Sura Yusuf, Ayat 40.
[8]Aziz Ahmad, Islamic Law in Theory and Practice, PLD Lahore, p.12. (1956).

which is applicable in all fields of human life, namely, personal, national, international life and so on. The holy Quran declares, "The Religion before Allah in Islam (submission to His will) only."[9]

(ii) Obedience to Allah and His Apostle: Islamic law is the obedience to Allah and His Apostle. The Quran states, "o you who believe! Obey Allah and obey His Apostle."[10]Unconditional obedience to the will of Allah and His Apostle is obligatory for all Muslims. So, in a Muslim country while framing law parliament should take vigilance so that no law contrary to the Quran and Sunnah is passed.

(iii) Consistent with human nature: Islamic law is consistent with human nature. It is in harmony loath human nature. Islamic law is the religion of human being (Din-al Fitraf) based on reason. The Quran states, "Then set your face upright for religion in the right state-the nature made by Allah in which He has made men. There is no alternative to Allah's creation, that is the right religion, but most people do not know."[11]

(iv) Allah is the Legislator: Allah is the legislator of the Islamic law. Islamic law revealed from Allah, who alone has the sovereign right and supreme power to legislate it for mankind. He has been revealing His wishes and commands on His prophets throughout the ages from the birth of mankind according to needs and conditions of different countries and stages of civilization. As a part of such continuity, Al-Quran is the latest revelation covering all basic laws, which are essential to mankind. Last prophet (s) implemented these laws during his lifetime. In Islamic law, sovereignty belongs to Allah who is not accountable to anybody.

(v) Iman or believe: Imanor believe is another distinguishing feature of the Islamic law. It is covered by all Iman orbelieve related issues. Without believe religion is blind. So, most of the basis of the Islamic law depend on believe orIman.

(vi) Sourcesof law Al-Quran and Sunnah: The main sources of Islamic law are Al-Quran and Sunnah. A well–known hadith supports the view that any problem can be solved with the help of Quran and Hadith.

[9]Al-Quran, Sura Al-Imran 3 and Ayat 19.
[10]Al-Quran, An-Nisa 4 and Ayat 59.
[11]Al-Quran, SuraAr-Rum 30 and Ayat 30.

The prophet(s) said, "I have left for you two things. You will never go astray so long as you with hold them fast. These are the Quran and the practice (sunnah) of the prophet, "Besides, there are secondary sources as well, such as, Ijtihad, Ijma and Qiyas.

(vii) Perfect and universal: Islamic law is perfect and universal. It is free from any defect. Since it is a complete code of life, no addition to or deduction from it can be made. It is universal and therefore, it is applicable now and for all ages to come and for any territory and therefore, the punishment for the same offence is fixed irrespective of any period.

(viii) Scope of application: Islamic law has scope of application. The foundation of Islamic law is based on the three main principles. Such as- (a) Oneness of Allah (b) Prophethood and (c) The life after death, Islamic law is applicable to this world as well as to the nextworld. And offender, for example, may escape punishment in this world by evading the law enforcing agency or managing judiciary, if any, but it is not possible to escape punishment in the next world. A man will be rewarded or punished according to the deeds he performed in this world.

(ix) Morality is the part and parcel of Islamic law: Islam lays importance on morality, which helps to create congenial atmosphere in the society. For instance, to show respect to parents, elders, teachers, to help the distressed etc. are indispensable parts of morality. Sometimes morality becomes more effective than the law. In most cases, the commission of crime takes place due to the absence of morality. Taking of bribe, for example, is both immoral and illegal. Morality, therefore, should be part and parcel of Islamic law.

(x) Supremacy of Allah and Prophet: The distinguishing feature of the Islamic law is the supremacy of Allah and his Prophet. Allah is the creators of all things and maintains the entire thing in the universe.

(xi) Complete Code of Life: Islam is the complete code of law. It covers all aspects of human life from cradle to grave. Islam prescribes solution to all problems, personal, international, private or public in nature.

5. Islamic Law and other Man-made Modern Laws

Obedience to law is one of the most important pre-conditionsto ensuring peaceful co-existence and prosperous society. In this regard, the Quran declares, "O you who believe! Obey Allah and obey the apostle and those who are in authority amongst you. If you differ in anything amongst yourselves, refer it to Allah and His apostle.[12]There are many differences between Islamic law and other man-made laws. Summarize the distinctions under the following:

(i) As regards source: The fundamental sources of the Islamic law are the Quran and sunnah or Hadith, the secondary sources of Muslim Law and Istihsen, Istihal, Istidlal. The Muslim jurists frame laws in accordance with these sources. The sources of other laws are statutes, conventions, customs, precedents etc. Parliament takes into consideration these sources at the time of adoption.

(ii) As regards aim and objective: Enactment of full-fledged laws according to Quran and Sunnah, in order to maintain peace in this world and salvation in the next world, is the prime objective of Islamic law. The only aim of Islamic law is to gain satisfaction of Almighty Allah. The aim of other laws is to ensure peace in this world. It is indifferent to the world here after.

(iii) As regards legislation: Allah is the Legislator of Islamic law that has been implemented by His prophet(s). He used to receive revelation from Allah, whereby he established an Islamic state in Madina and applied those revelations in the form of law. Onthe other hand, modern secular laws are legislated by human mind. This has been the practice followed by all modern states including Bangladesh.

(iv) As regards nature: Muslim jurists hold the view that Islamic law is in harmony with human nature. It has been implemented by the last prophet Muhammad (peace beupon him) with a view to bring welfare to human beings. Islamic law cannot ignore law like other man-made laws. All of the existing laws in Bangladesh and elsewhere which are enforced by the State machinery, are man-made in nature, other than Muslim personal law with some reservations.

[12]Al-Quran, Sura An-Nisa 4 and Ayat 59.

(v) As regards amendments: Islamic law is a divine law and, as such, it is not amendable, specially,those which are framed by the Quran and Hadith.Of course, Majlishesura (consultative Assembly) can amend other Islamic laws, which are made by Ijtihad (ijma and Qiyas) Manmade laws are always changeable and amendable. The parliament of a state can amend, repeal and frame any law. The Bangladesh parliament, for example, has amended the Constitution of Bangladesh several times.

(vi) As regards enforceability: The fear of punishment compels a man to become a law–abiding citizen. There are some formal Ibadat like fasting, zakat etc which are performed no for fear of punishment in this world but for the fear of the punishment to be implemented in the next world. Islamic law, therefore, can be effective for fear of Allah. Other man-made laws are enforced by the government by infliction of punishment in this world only, such as, imprisonment, monetary fine, exile, death sentence etc.

(vii) As regards territorial jurisdiction: Islamic law is not confined to a particular territory; rather its boundary is open for any part of the world. According to the Islamic law, an offender, for example, shall be punished whether the offence is committed in Bangladesh or France or in any state, provided that those states are the followers of Islamic law. Islam is not limited to any territory. Ownership of this world belongs to Allah and as such laws prescribed by Him shall be applicable in this world. But other laws are applied only in the territory of the concerned states.

(viii) As regards infliction of punishment: Islamic law prescribes definite punishment for definite offence according to Hudud or Qiyas or discretion of the court or tribunal as the case may be called Tajir, so in case of breach of law, the violator shall be punished. If the offender remains unpunished here due to any reason whatsoever, he will be punished in the world hereafter. In this respect, we can see the Quranic version, "Then shall anyone who has done and atom's weight of good, see it."[13] The implication of this verse is that everybody shall be rewarded or punished according to his deed. Modern law prescribes punishment in this world only, but there is no punishment after death.

[13]Al-Quran, Sura Al-Zilzal 99 and Ayat 7-8.

(ix) As regards morality: Islamic law has given much more importance on morality at the time of adoption of laws. There are some deeds, as stated above, which need to be performed not in accordance with law but according to morality. There are many deeds which are immoral in the eye of Islam but these are not immoral in modern law. Islamic law considers deeds homosexuality, for example, as punishable offence and immoral act, where as it is neither immoral nor illegal in the eye of other man-made law.

(x) As regards accountability:According to Islamic law, everybody shall be accountable for his own deeds to Allah who is all-knowing. The Quran says, "No bearer of burdens can bear the burden of another."[14]In case of man-made law, a person is accountable to the government only in case of breach of any law of the land and not to Allah.

(xi) As regards universality and uniformity: Islamic law is universal and uniform for all ages to come. There are some laws like Hudud and Qisas, as stated above, which are universally applicable. The last resort for punishment for theft, for example, is the amputation of hand prescribed by the Quran which says, "As to the thief, male or female, cut off his or her hand, a punishment by way of example from Allah for their crime, and Allah is exalted in power."[15]Man-made laws are not universally applicable. Different states follow different types of punishment for the commission of the same offence.

(xii) As regards sovereign power and supremacy: In case of Islamic law, sovereign power supremacy is only upon Allah and His prophet (s) dominates in case of explanations, but in the case of laws other than Islam, sovereign power is upon the people of the country and the supremacy of parliament is unquestionable there and in absence of parliament the commands of the dictator dominate the legal affairs.

6. Application of Muslim Law and their Reformation in Bangladesh

The legal foundation of Bangladesh has been established by the Constitution of Peoples Republic of Bangladesh and no law can violate the provisions of the Constitution. No law is enforceable in Bangladesh unless

[14]Al-Quran, Sura Al-Mayida 5 and Ayat 38.
[15]Al-Quran, Sura Al-Mayida 5 and Ayat 38.

it is permitted by the constitution. The Constitution authorizes the Parliament to enact laws in relevant field. Laws enacted during British and Pakistan Regime was made enforceable in Bangladesh under Article 149 of the Constitution. This Article allowed only those laws which are not inconsistent with the provisions of the Constitution. So, in this sense, we may make a mistake about the validity of above mentioned Muslim personal law in the eye of Islamic spirit where the law-making authority is absolutely with the Parliament.

The Muslim Personal Law (Shari'ah) Application Act 1937 was adopted during British Regime which validates the application of specific provisions of Muslim law within the Indo-Pak subcontinent. The Act continues to govern the application of Muslim family law in Bangladesh be Section 2 of the Act specifies the relevant sectors to which the provisions are going will apply. Section 2 states that, "Notwithstanding any custom or usage to the contrary, in all questions (save questions relating to the agricultural land) regarding intestate succession, special property of females, including personal property inherited or obtained under contract or gift or any other provisions of personal law, marriage, dissolution of marriage, including talaq, ila, ziher, lian, khula and mubaraat, maintenance, dower, guardianship, gifts, trusts and trust properties, and waqfs (other than charities and charitable institutions and charitable and religious endowments), the rule of decision in cases where the parties are Muslims shall be the Muslim Personal Law (Shariat)."Originally the sole basis of Muslim law is the Quran and Hadith and the matters as have been allowed by the provision of this Act are also evolved from Quran Hadith. Several reformations have been made to those laws by the Act of parliament during British, Pakistan and Bangladesh Regime. It is to be noted here that only the principles of Muslim Law as referred in section 2 of the Act is applicable in Bangladesh and no other provisions of Islamic law is applicable in Bangladesh.

The Court of Wards Act, 1879 and the Guardian and Wards Act, 1890 have been enacted to govern the administration of the estate of the minor or other incapable persons.The MussalmanWakf Validating Act, 1913 legitimates the Wakfand thus removes the doubts arising out of the Wakf created by a Muslim in favor of themselves, their families, children,

descendents, and ultimately for the benefit of the poor or for other religious, pious or charitable purposes.

The Child Marriage Restraint Act, 2017 has restrained the minimum age limit for being married as 21 years for male and 18 years for female.

The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 specifies certain grounds on which a wife can dissolve the marital tie.

The Muslim Family Laws Ordinance, 1961 laid down certain rules regarding the registration of marriage, polygamy, talak, maintenance and dower. It brings a major change into the Qur'anic rules of succession and also prohibits Hilla Marriage.

The Muslim Marriage and Divorce (Registration) Act, 1974 consolidates the laws relating to the registration of marriage and divorce.

The Family Court Ordinance, 1985 establishes Family Court for the purpose of disposing of matters relating to the dissolution of marriage, restitution of conjugal rights, dower, maintenance, guardianship and custody of children.

The Nari O ShishuNirjatonDomonAin, 2000 has contained provisions prohibiting tortures to women for dowry and has incorporated punishment for that purpose.

The above-mentioned laws were taken under the supremacy of parliament and protected by the sovereignty of the people. So, this philosophy of supremacy and sovereignty has been reflected in our judicial system also. In the following para, some of the examples of this reflection has been shown.

7. Precedent or Case Law

Besides the general principles of Islamic law under the preview of the above-mentioned Muslim laws, some judicial precedents as has been laid down by the Supreme Court of Bangladesh on different matter. Following are some examples of renowned cases that put down decisions on which the religious stake holders are holdings difference of opinion.

In *Hasina Ahmed v. Syed AbulFazal* (1980) 32 DLR 294, the Court ruled that a woman may be granted a khul by a judicial decision without the husband's consent.

In Nelly Zaman v. Giasuddin Khan (1982) 34 DLR 221, the court laid down that any unilateral plea of a husband for forcible restitution of conjugal rights as against a wife unwilling to live with her husband is violative of the accepted State and Public Principle and Policy.

In *Muhammad Abu Baker Siddique v. S.M.A. Bakar& others* (1986) 38 DLR (AD) the Court's ruling contradicted the classical dictates of Hanafi law according to which the mother's custody over a boy ends at 7. There stated that indeed, the principle of Islamic Law has to be regarded, but deviation therefrom would seem permissible as the paramount consideration should be the child's welfare.

In *Rustom Ali v. JamilaKhatun* (1991) 43 DLR 301, the Court ruled that a wife is not entitled to arrears of maintenance. Maintenance will only be allowed her from the date the suit is brought before the Family Court until three months from the decree of dissolution of marriage. The former wife or the child may not claim past maintenance unless the parties have a previously established agreement.

In *Muhammad HefzurRahman v. ShamsunNahar Begum*(1995) 15 BLD 34, the Court ruled that the responsibility of a Muslim husband to maintain his divorced wife does not cease with the expiry of the idda.

8. Conclusion

Islamic law is a code of law derived from the Quran, from the teachings and example of Mohammad(s). Islam is the largest religion of Bangladesh, the Muslim population in the country is approximately 152 million, which constitutes 90.4% of the total population. The majority of Muslims in Bangladesh are Sunni, who mainly follow the Hanafi school of thought. In Bangladesh, where operates a modified Anglo-Indian civil and criminal legal system there is no official sharia courts in Bangladesh. Most of the Muslim marriages, however, are presided over by the Qazi.During pre-British era Qazi was judgement was also sought on matters of personal law, such as inheritance, divorce, and the administration of religious endowments. But, now the Qazi in assigned only the duties of registering the marriages and divorces. People of Bangladesh are the followers of Islam, but Islamic law is not being followed here in all civil and criminal matters. Islamic law can be introduced and applied in Bangladesh in all walks of life as it is found in Islamic or Muslim states of the past. The

experience shows that application of Islamic law can reduce the commission of crime elsewhere including Bangladesh. Bangladesh parliament may legislate necessary laws in the light of the Quran and Sunnah and may repeal or amend existing law. Present Muslim laws as enforced in Bangladesh, are the combination of divine as well as state legislation. Islamic law deals with the rights and obligations of human beings, which are primarily derived from the Quran and Sunnah.

References

1. Syed Khalid Rahsid's, Mulim Law, Six edition (2016) at p.1.
2. Al –Quran. Al Mayida, 5:3 The first digit refers to no. of sura and the second digit refers to no. of. Ayat.
3. Al Quran, At-Towbah 9:33 Al-Fatho 48: 28; As Shawf 61:9.
4. AtharHussain, The Prophet of Islam (Hamdad National Foundation, Delhi) at, p.1.
5. AsafA.A.Fyzee. Outlines of Muhammadem law, Oxford University Press, Delhi p.1(1993).
6. Al-Quran, Sura Al-Huzrat 49 and Ayat 15.
7. Al-Quran, Sura Ash-Shura 42 and Ayat 13.
8. Aziz Ahmad, Islamic Law in Theory and Practice, PLD Lahore, p.12. (1956).
9. Al-Quran, Sura Al-Imran 3 and Ayat 19.
10. Al-Quran, An-Nisa 4 and Ayat 59.
11. Al-Quran, SuraAr-Rum 30 and Ayat 30.
12. Al-Quran, Sura An-Nisa 4 and Ayat 59.
13. Al-Quran, Sura Al-Zilzal 99 and Ayat 7-8.
14. Al-Quran, Sura Al-An'am 6 and Ayat 164; Sura An-Najam 53 and Ayat 38.
15. Al-Quran, Sura Al-Mayida 5 and Ayat 38.